কির্গিজিয়ার ছোটগল্প

নবসাহিত্য প্রকাশনী
১২৮/১ এ, রাজা রামমোহন সরণি
কলিকাতা-৯

সূচি

ভূমিকার বিকল্প

(ভারতীয় পাঠকবর্গের প্রতি নিবেদন)

সুপ্রাচীন কালে ইয়েনিসেই নদীর উপত্যকায় বসত বিস্তার করে কির্গিজদের শক্তিশালী যোদ্ধৃ গোষ্ঠীসমূহ। এনেসাই, অর্থাৎ নদীমাতার (কির্গিজ ভাষায় এনে অর্থ মা, সাই — নদীগর্ভ, নদী) রূপ আজও কির্গিজ জাতির পুরাকাহিনীতে ও প্রাচীন সঙ্গীতে রক্ষিত আছে। অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে তিয়েন-শানে বসতি স্থাপনের পর মুখ্যত পশুপালনকারী ও শিকারজীবী কির্গিজরা পামীরের উপত্যকায় ও জলবিভাজিকায় তাদের যাযাবর তাঁবু স্থাপন করে. শত্রুদের আক্রমণ থেকে নিজেদের ভূমি রক্ষা করে, গড়ে তোলে নিজেদের ইতিহাস ও জাতীয় সংস্কৃতি। পাহাড়পর্বতের গহনে বিস্মৃত এই প্রাচীন জাতি লিপি ছাড়াই সৃষ্টি করে তার সুসমৃদ্ধ লোককথা, মৌখিক রচনার মধ্যে ব্যক্ত করে তার ভাবনা ও অনুভূতি, কল্যাণের প্রতি আকর্ষণ, সৌন্দর্যবোধ। এই প্রাণবন্ত বাণী পুরুষ থেকে

পুরুষান্তরে প্রচার করতেন কথকেরা, যাঁদের অস্ত্র বলতে নিজস্ব জীবনচেতনা ও অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। সেই স্মৃতির ভাণ্ডারে তাঁরা রক্ষা করতেন সমগ্র জাতির মুখে মুখে প্রচলিত হাজার বছরের ছন্দোবদ্ধ ইতিহাস। এ হল এমন এক জাতি, যে বিশ্বমানের সমকক্ষ মহাকাব্যে অমর করে রেখেছে তার অতীতকে, কাব্যে কেন্দ্রীভূত করেছে তার নন্দনতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা, ব্যক্ত করেছে তার মানসসংস্কৃতি। পাঁচ লক্ষাধিক ছন্দোবদ্ধ পংক্তি সমন্বিত মহাকাব্য 'মানাস', মহাকাব্যকল্প নামে পরিচিত আরও বেশকিছু কাব্য, সমগ্র কির্গিজ লোককথা, যেখানে আছে মহাকাব্য, পুরাকাহিনী, রূপকথা, শোকগাথা থেকে শুরু করে প্রবাদ-প্রবচনের পরিচয় - এ-ই ছিল কিছুকাল আগেও আমার জাতির সাহিত্য, থিয়েটার, দর্শন, নীতিশিক্ষাস্থল। এমনই ছিল কির্গিজ জাতির ভাগ্য, আমাদের দেশের এ রকম আরও বহু জাতির ভাগ্য, যারা সদ্য লিপির অধিকারী হয়েছে, যারা নিজেদের লিপি সৃষ্টি করেছে মাত্র অক্টোবর বিপ্লবের পরে।

আমরা যখন বলি যে অক্টোবর বিপ্লব আমাদের নব জীবনে প্রবুদ্ধ করেছে, অক্টোবর বিপ্লব যুগযুগান্তরের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অন্তরণজনিত বাধার অপসারণ ঘটিয়ে সমাজতান্ত্রিক জাতিসমূহের সঙ্গে সমান অধিকার নিয়ে আধুনিক যুগে পদার্পণে আমাদের সাহায্য করেছে, তখন কথাটা যথাযথ বটে, এর মধ্যে এতটুকু অত্যুক্তি নেই। আন্তর্জাতিকতাবাদ — আমাদের সোভিয়েত সমষ্টি জীবনযাত্রার মূল বৈশিষ্ট্য। তাই মুখে মুখে প্রচলিত লৌকিক ঐতিহ্য আর রুশ ক্লাসিক ও সোভিয়েত সাহিত্যের সংযোগে উদ্ভূত নব নব শিল্পচর্চা বিকাশের মধ্যে যে সংস্কৃতিক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতাবাদের মূলনীতির উজ্জ্বলতম প্রকাশ ঘটেছে তা আকস্মিক নয়। বিপ্লব চলাকালে হয়ত অনেককিছুই আগে থেকে অনুমান করা সম্ভব ছিল, কিন্তু সদ্য লিপির অধিকারী যে-সমস্ত জাতীয় সাহিত্য বর্তমানে সোভিয়েত সমাজের নতুন নতুন বহু সাংস্কৃতিক

সম্পদের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে, তাদের বিকাশ যে এত দ্রুত, এমন প্রচণ্ড গতিতে ঘটবে তা আর কে ভাবতে পেরেছিল? এখানেই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্বের আরও একটি প্রমাণ। অর্ধেক শতাব্দী হয়েছে কি হয় নি (কির্গিজ ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় ১৯২৪ সনের ৭ নভেম্বর) কির্গিজ সাহিত্যে আজ দেখা যায় সব ধরনের, সমস্ত রীতির রচনা এবং তা পুরোপুরি পেশাদার, পরিণত সাহিত্যরূপে গণ্য।

গল্পরীতির প্রসঙ্গে বলতে হয় যে প্রথম পর্বের পুরোগামী কির্গিজ লেখকবৃন্দই কির্গিজ লেখ্য সাহিত্যের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে তাতে নিজেদের শক্তি পরীক্ষা করেন। কিন্তু ছোটগল্পের বিকাশ ঘটে অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে — কির্গিজ সাহিত্যের পরিণত পর্বে এবং তা এক দিক থেকে সেই সাহিত্যের পরিণতির পরিচায়ক ও নির্ধারক। কির্গিজ ছোটগল্প যে বড় ধরনের গদ্যরচনার প্রাথমিক অভিজ্ঞতা লাভের পর বিকশিত হতে থাকে, তা যে কির্গিজ গদ্য বিকাশের পরবর্তী স্তর হয়ে দেখা দেয়, এতে বহুল পরিমাণে নির্ধারিত হয় তার দক্ষতার মাত্রা। এই রচনারীতির বিকাশ যে কির্গিজ গদ্যসাহিত্যে নব নব শক্তি প্রবাহের, নতুন প্রজন্মের গদ্যসাহিত্যিকদের আবির্ভাবের সমকালে ঘটে, সে ঘটনাটিও কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়; পরন্তু তরুণ গদ্যলেখকেরা হন ঐ রচনারীতির ভাগ্যনিয়ন্তা। আর এঁরা ছিলেন আধুনিক চিন্তাশীল মানুষ, অন্য সাংস্কৃতিক মানের মানুষ, যাঁরা বিশ্বসাহিত্যের অভিজ্ঞতা সৃজনশীল উপায়ে রূপান্তরে সক্ষম, সেকেলে রীতিতে লেখার অভ্যাসমুক্ত, সাবেকী সাহিত্যিক সংস্কার ও ছাপ থেকে মুক্ত, মূলগতভাবে নতুন নন্দনতাত্ত্বিক ধ্যানধারণাসম্পন্ন লেখক। আধুনিক কির্গিজ ছোটগল্প প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয় ষাটের দশকের গোড়ার দিকে কির্গিজ গদ্যসাহিত্যে যে সব তরুণ লেখকের আবির্ভাব ঘটে তাঁদের কথা।

সাহিত্যের প্রতি সংকীর্ণ গণ্ডী মুক্ত উদার দৃষ্টিভঙ্গি, নিজেদের রচনায় এই বিরাট দাবি মেটানোর প্রয়াস — এ-ই ছিল উক্ত প্রজন্মের

কির্গিজ লেখকদের চরিত্রবৈশিষ্ট্য। তাঁরা ছিলেন তরুণ, তাই বলাই বাহুল্য তারুণ্যের স্বভাবসুলভ দোষত্রুটি থেকে তাঁরা মুক্ত ছিলেন না। কিন্তু সে দোষত্রুটি ছিল অচিরস্থায়ী, বাড়ন্ত বয়সের ব্যাধি, তা তাঁদের উত্তরোত্তর দৃঢ়তাপ্রাপ্ত, পুরুষত্বপ্রাপ্ত প্রতিভার প্রতিবন্ধক হয় নি। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে তুলে ধরতে হলে তার গুরুত্বকে সঠিক উপলব্ধি করতে হবে, যাতে উন্নত শিল্পপর্যায়ে তাকে উদ্‌ঘাটন করা যায় তার জন্য দরকার প্রতিভা ও কুশলতা। আমার মনে হয়, আমাদের তরুণ লেখকেরা মূলত এই দাবি পূরণ করেছেন।

লেখকদের এক সমগ্র প্রজন্ম যে এই উচ্চ গুণের অধিকারী হয়, বলাই বাহুল্য তা আপনা আপনি ফাঁকা জায়গার ওপর হতে পারে না।

পঞ্চাশের দশকে আমাদের মানসজীবনে, সামগ্রিকভাবে সোভিয়েত সমাজে যে নবায়ন ও গভীরতাপ্রাপ্তির প্রবণতা দেখা দিল তা তখনকার দিনের কিশোরবয়স্ক এঁদের ওপর বিরাট শিক্ষামূলক প্রভাব সৃষ্টি করে, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ও সংস্কৃতির মান নির্ধারণ করে, গুণগতভাবে নতুন স্তরে উন্নীত করে।

এই ব্যাপারটিতে কিন্তু কেবল প্রশ্নের একটা দিকই প্রকাশ পায়। এই তরুণ লেখকেরা যদি পূর্ববর্তী প্রজন্মের লেখকদের পদাঙ্কের ওপর পা ফেলে ফেলেই চলতেন তা হলে ঐ স্তর ছাড়িয়ে ওপরে তাঁরা উঠতে পারতেন না, সাহিত্যে নিজস্ব পন্থা খুঁজে বার করতে পারতেন না, তা হলে এত বড় মূল্য পাওয়া ত দূরের কথা, নিজেদের কালেও তাঁরা স্রেফ অলক্ষ্যেই থেকে যেতে পারতেন। ষাটের দশকের পাঠকমহল ৪০-৫০-এর দশকের পাঠকমহলের চেয়ে অন্য রকমের ছিল। জীবনের অভিজ্ঞতাই এই পাঠকদের শৈল্পিক ও নন্দনতাত্ত্বিক দাবি অনুযায়ী সাহিত্য সৃষ্টি করে। তৃতীয়ত, ষাটের দশক থেকেই যে কির্গিজ সাহিত্যের বিকাশ ঘটতে থাকে ঘটনাটা তা নয়। তরুণ সাহিত্যিকরাও আগের আগের প্রজন্মের সৃজনী অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করেন, তাঁদের সাফল্য ও ত্রুটিবিচ্যুতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন। এই ব্যাপারটি

মনে না রাখলে তরুণ লেখকদের সৃজনী রূপের পরিপূর্ণ ধারণা লাভ করা সম্ভব নয়।

সমগ্র প্রজন্মের সাধারণ চরিত্র থাকা সত্ত্বেও এখানে প্রত্যেকেরই প্রথম রচনায় স্পষ্ট শোনা যায় নিজস্ব কণ্ঠস্বর। কেউ কেউ মণিকারের মতো প্রতিটি পুঙ্খানুপুঙ্খ বস্তু অলঙ্কৃত করে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র রেখাচিত্র থেকে চরিত্র গড়ে তুলেছেন, কেউ বা তুলির টানে রং ফুটিয়ে তুলেছেন, লেখনী বহুদূর সঞ্চালন করেছেন; কেউ কেউ মনস্তত্ত্বের গহনে ডুব দিয়ে তার গভীর স্তর তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন, কেউ বা প্রয়াসী হয়েছেন অভিব্যক্তিপূর্ণ ভঙ্গিতে চরিত্র গঠনে। কিন্তু এই সব ব্যক্তিগত গুণ ও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য তরুণ লেখকদের অনৈক্য সৃষ্টি না করে বরং সামগ্রিকভাবে নতুন প্রজন্মের সাধারণ সৃজনী রূপকে আরও সমৃদ্ধ, আরও ভাবগর্ভ করে তুলেছে।

উক্ত প্রজন্মের রচনার আরও একটি বৈশিষ্ট্য হল ব্যাপকতা। অবশ্য এটা ঠিক যে তা তখন পর্যন্ত তাঁদের রচনায় পূর্ণ মাত্রায় ব্যাপকতার রূপ পরিগ্রহ করে নি, কিন্তু তা ছিল ভাবনার বিস্তার, নিজেদের জাতীয় সংস্কৃতির সম্পদের প্রতি, সমগ্র মানবসংস্কৃতির উচ্চ ভূমি থেকে তার সম্ভাবনার প্রতি মনোভাবের বিস্তার।

ভাবনার ব্যাপকতাসাধনের মধ্যে অবশ্য শক্ত মাটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শূন্যমার্গী হওয়ার আশঙ্কাও আছে। কিন্তু তরুণ লেখকেরা সে বিপদ এড়াতে পেরেছেন। তার কারণ, প্রথমত, এই যে তাঁরা ঘনিষ্ঠতমভাবে জড়িত ছিলেন নিজেদের জনগণের সঙ্গে, নিজেদের মাটির সঙ্গে, কালের অতি গুরুত্বপূর্ণ দাবির সঙ্গে; দ্বিতীয়ত, ছাত্রজীবন থেকে সরাসরি সাহিত্যজগতে এসে পড়লেও তাঁদের সম্বল ছিল উল্লেখযোগ্য পরিমাণে জীবনের অভিজ্ঞতা; যুদ্ধের কঠিন বছরগুলি তাঁদের চেতনায় ও হৃদয়ে গভীর ছাপ ফেলে; তাঁদের সচেতন জীবনের শুরুতে ছিল যুদ্ধপরবর্তী দুঃসময়। শৈশবের জীবন ও চাক্ষুষ দর্শনের ফলে লব্ধ অভিজ্ঞতা যে লেখকের অফুরান উৎস হয়ে থেকে যায়, একথাও ভুললে চলবে না। আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত যে

তরুণদের উন্নত সংস্কৃতিবোধ কোন কৃত্রিম, লেখা বুলি নয়, অস্থায়ী কিছু নয়, তা তাঁদের পক্ষে অবিচ্ছেদ্য, তাঁদের প্রতিভার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

এখন সংগ্রহগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত গল্পগুলি পাঠ করে প্রতিটি গল্পের বৈশিষ্ট্য, দোষ-গুণ বিচারের ভার পাঠকদের নিজেদের ওপরই ছেড়ে দিলাম। তবে দুটো বিষয় উল্লেখ করতে চাই। উপরে যে প্রজন্মের চরিত্র বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ আমি করেছি, সংগ্রহগ্রন্থটিতে এ ছাড়াও আছে ক. কাইমভ ও শ. বেইশেনালিয়েভের মতো অগ্রজ লেখকদের রচনা। শেষোক্ত দুই জন সবে তাঁদের সৃজনী পথযাত্রা শুরু করেছেন, অবশ্য সাফল্যের সঙ্গেই। সংগ্রহগ্রন্থের এই গঠনপ্রকৃতির ফলে পাঠকবর্গ অন্তত কিছু পরিমাণে বুঝতে পারবেন কির্গিজ ছোটগল্পকারদের পুরুষানুক্রমিক উত্তরাধিকার, অনুভব করতে পারবেন কির্গিজ গদ্যসাহিত্যে এই শ্রেণীর রচনা বিকাশের ধারা। দ্বিতীয় বিষয়। এই সংকলনে যা সংগৃহীত হয়েছে কির্গিজ ছোটগল্প যে তার মধ্যেই শেষ হয়ে যাচ্ছে তা মোটেই নয়। সীমাবদ্ধ পরিসরে তা কির্গিজ গল্পের না প্রকৃতিগত ও বিষয়বস্তুগত বৈচিত্র্য, না পৃথক পৃথক রচয়িতার ব্যক্তিগত শিল্পসৃষ্টি -- কোনটিরই পূর্ণ পরিচয় প্রকাশ করতে পারে না। সংগ্রহগ্রন্থের বাইরে রয়ে গেছেন বেশ কিছু প্রতিভাবান কির্গিজ ছোটগল্পকার। পাঠক বরং এই গ্রন্থটিকে গ্রহণ করুন দূর অথচ সৌহার্দপূর্ণ এক জাতির ছোটগল্পগুলির সঙ্গে প্রথম পরিচিতিরূপে। এ গ্রন্থ ঘনিষ্ঠতর সংযোগের, ব্যাপক সাংস্কৃতিক রত্নভাণ্ডার বিনিময়ের সূচনাস্বরূপ হোক।

চিঙ্গিজ আইতমাতভ

চিঙ্গিজ আইতমাতভ

সৈনিক শিশু

বাপকে সে প্রথম দেখে সিনেমায়। তখন সে বছর পাঁচেকের বাচ্চা।

ঘটনাটা ঘটে সেই মস্ত সাদা খোঁয়াড়ে, যেখানে প্রতি বছর ভেড়ার গায়ের পশম ছাঁটা হয়। স্লেট পাথরের টালিতে ছাওয়া এই খোঁয়াড়টি এখন আছে রাষ্ট্রখামারের বসতির পেছনে পাহাড়তলিতে, রাস্তার ধারে।

এখানে সে ছুটে আসত মা'র সঙ্গে। মা জেয়েনগুল রাষ্ট্রখামারের ডাক-বিভাগের টেলিফোনিস্ট, প্রতি বছর পশম ছাঁটার মরসুম শুরু হতেই ছাঁটাই কেন্দ্রে সে সহায়ক কর্মীর কাজ নেয়। এই সময় সে বীজ বোনা ও ভেড়ার বাচ্চা বিয়ানোর মরসুমে সুইচ বোর্ডের সামনে দিন-রাত ওভার টাইম খেটে পাওনা অতিরিক্ত ছুটি আর নিয়মিত ছুটি কাজে লাগাত। খাটত পশম ছাঁটার শেষ দিন অবধি। এখানে ঠিকা কাজ, রোজগার মন্দ হত না, আর তার, সৈনিকের বিধবা স্ত্রীর বাড়তি প্রতিটি কোপেকের কী দরকারই না হত! সংসার অবশ্যি তার বড়

নয়, সে নিজে আর ছেলে, তা যা-ই হোক না কেন — সংসার ত বটে। শীতের জন্য জ্বালানি জমিয়ে রাখা চাই, দর বাড়ার আগেই কিনে রাখতে হবে ময়দা. পরনের জামাটা জুতোটাও দরকার। সত্যি, দরকারের কি আর অন্ত আছে?

বাড়িতে এমন কেউ ছিল না যার কাছে ছেলেকে রেখে আসা যায়, তাই তাকে সে সঙ্গে করে নিয়ে আসত কাজে। এখানে সে ধুলো বালি মেখে ভূত হয়ে মহানন্দে সারা দিন দাপাদাপি করে বেড়াত পশম-ছাঁটিয়ে, রাখাল আর রাখালদের লোমশ পাহারাদার কুকুরগুলোর মধ্যে।

খোঁয়াড়ের উঠোনে ভ্রাম্যমাণ সিনেমা আসতে সে-ই দেখে প্রথম, এই দারুণ আনন্দের খবরটা সবাইকে জানাতে ছোটে সে-ই প্রথম।

'সিনেমা এসেছে, সিনেমা!'

কাজের পর, অন্ধকার হয়ে এলে শুরু হল ছবি দেখানো। তার আগে পর্যন্ত অপেক্ষা করে করে সে হয়রান হয়ে পড়েছিল। তবে কষ্টের পুরস্কারও মিলল। ফিল্মটা ছিল যুদ্ধের। খোঁয়াড়ের শেষে দুটো খুঁটিতে টাঙানো সাদা পর্দায় শুরু হয়ে গেল লড়াই, দুমদাম চলল গোলাগুলি, শিস দিয়ে উড়ল রকেট, তাতে আলো হয়ে উঠল ছিন্নভিন্ন আঁধার আর মাটির সঙ্গে লেপ্‌টে পড়ে থাকা গুপ্ত সন্ধানীরা। রকেটের আলো নিভে যেতে ফের সামনে ছুটল গুপ্ত সন্ধানীরা। মেশিনগানে রাত এমন ফুঁড়ে যাচ্ছিল যে ছেলেটার বুক হিম হয়ে এলো। হ্যাঁ, একেই বলে যুদ্ধ!

মা'র সঙ্গে ও বসে ছিল আর সকলের পেছনে পশমের গাঁটের ওপর। এখান থেকে ভালো দেখা যায়। ওর অবিশ্যি ইচ্ছে ছিল একেবারে সামনের সারিটায় বসে, যেখানে রাষ্ট্রখামার থেকে ছুটে এসে ছেলেপিলেরা ঠাঁই নিয়েছে, পর্দার কাছে মাটির ওপরেই। সে-ও ছুটে যেতে চাইছিল. কিন্তু মা ধাতানি দিল:

'ঢের হয়েছে, সেই সকাল থেকে সন্ধে অবধি টোটো করে বেড়াচ্ছিস,

আমার সঙ্গে না হয় একটু থাকলিই,' এই বলে মা তাকে নিজের কোলের ওপর বসাল।

সিনেমার প্রজেক্টর গুনগুন আওয়াজ তোলে, যুদ্ধ চলছে। লোকে উত্তেজিত হয়ে যুদ্ধের গতিবিধি লক্ষ্য করছে। মা দীর্ঘশ্বাস ফেলছে, থেকে থেকে ভয়ে শিউরে উঠছে, ট্যাঙ্ক হুড়মুড় করে সরাসরি তাদের দিকে এগিয়ে এলে আরও শক্ত করে বুকে চেপে ধরছে ছেলেকে। পাশের গাঁটে বসা কে একজন মেয়ে থেকে থেকে আফসোসের সঙ্গে জিভ দিয়ে চুকচুক করছিল আর বিড়বিড় করে বলছিল:

'হা ভগবান, কী কান্ড! হা ভগবান!..'

ওর কিন্তু তেমন ভয় করছিল না, বরং ফাশিস্তরা যখন লুটিয়ে পড়ছিল, তখন মাঝে মাঝে ভারি ফুর্তিই লাগছিল তার। আর আমাদের লোক লুটিয়ে পড়লে ওর মনে হচ্ছিল, পরে তারা আবার উঠে দাঁড়াবে।

মোট কথা, যুদ্ধে কিন্তু লোকে লুটিয়ে পড়ে ভারি মজার ভঙ্গিতে। যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলার সময় ওরা যেমন করে পড়ে অবিকল তেমনি। সে-ও ছুটতে ছুটতে অমন পড়ে যেতে পারে, যেন কেউ ল্যাং মেরেছে। ব্যথা করে অবিশ্যি, চোট লাগে, কিন্তু বয়ে গেল, উঠে দাঁড়িয়ে আবার আক্রমণ. চোট খাওয়ার কথা মনেই থাকে না। এরা দেখি ছাই উঠে দাঁড়ায় না, কালো কালো নিশ্চল ঢিবির মতো মাটিতেই পড়ে থাকছে। অন্যভাবে পড়ে যাবার কায়দাও জানে সে, পেটে গুলি লাগলে যেমন হয়। লোকে তখন সঙ্গে সঙ্গেই পড়ে যায় না। পেট চেপে ধরে, তারপর কুঁজো হয়ে ধীরে ধীরে এলিয়ে পড়ে ঘাসের ওপর, হাত থেকে বন্দুক খসে পড়ে। এর পরই সে কিন্তু ঘোষণা করত যে মরে নি, ফের যুদ্ধ চালিয়ে যেত। অথচ এরা উঠে দাঁড়াচ্ছে না।

যুদ্ধ চলছে। গুনগুন করছে প্রজেক্টর। এবারে পর্দায় দেখা দিল গোলন্দাজরা। অবিরাম প্রবল গোলাবর্ষণ, বিস্ফোরণ আর ধোঁয়ার মধ্যে তারা ট্যাঙ্কবিধ্বংসী কামানকে ঠেনে নিয়ে চলেছে সরাসরি নিশানায়। খাতের ঢালু বেয়ে কামান ঠেলে তুলছে ওপরে। ঢালুটা

লম্বা ও চওড়া, প্রায় আধখানা আকাশ জোড়া। বিস্ফোরণের কালো ঝলকে দপদপে এই দীর্ঘ ও বিস্তীর্ণ ঢাল্ বেয়ে এগিয়ে যাচ্ছে গোলন্দাজদের দল। তাদের গতিবিধির মধ্যে, তাদের চেহারার মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যাতে বুকের ভেতরে হৃৎপিণ্ডটা গুমরে গুমরে ওঠে, ভরে যায় গর্বে, যন্ত্রণায় ও ভয়াল আর মহিমাময়ের প্রতীক্ষায়। ওরা ছিল জনা সাতেক, পোশাক ওদের জিরজিরে। একজনের চেহারাটা রুশীদের মতো নয়। মা কিছু না বললে ছেলে হয়ত তার দিকে নজরই দিত না। মা ফিসফিসিয়ে বলল:

'দ্যাখ, এটা তোর বাপজান...'

সেই মুহূর্ত থেকে লোকটা হয়ে উঠল তার বাবা। এর পর গোটা ফিল্মটাই চলল তাকে নিয়ে, তার বাবাকে নিয়ে। বাবার বয়স দেখা গেল একেবারেই কম, রাষ্ট্রখামারের অল্পবয়সী ছেলেছোকরাদের মতো। আকারে সে বড় নয়, মুখটা তার গোল ছাঁদের, চোখজোড়া চঞ্চল। নোংরা আর ধোঁয়ায় কালো হয়ে ওঠা মুখে রাগে ধকধক করে জ্বলছিল চোখ, লোকটা বেড়ালের মতো গুড়ি মেরে চলতে ওস্তাদ আর চটপটে। ঐ ত কামানের চাকায় কাঁধ লাগিয়ে কার উদ্দেশে সে যেন হাঁক দিল, 'গোলা, জলদি!' নতুন একটা বিস্ফোরণের গর্জনে চাপা পড়ে গেল তার কণ্ঠস্বর।

'মা, এ আমার বাপজান?' আভাল্বেক মা'কে জিজ্ঞেস করল।

'কী?' মা বুঝতে পারল না। 'চুপ করে বসে থাক। দ্যাখ।'

'তুমি যে বললে আমার বাপ।'

'হ্যাঁ, তোর বাপই ত। কথা বলিস নে বাপু, অন্যদের বিরক্ত করিস না।'

মা কেন এমন কথা বলল? কিসের জন্য? হয়ত স্রেফ অমনি, আচমকা, ঠিক সেই মুহূর্তে কিছু না ভেবেই। হয়ত বা দারুণ বিচলিত হয়ে পড়ে, মনে পড়ে যায় স্বামীর কথা। অবোধ এই শিশুটা কিন্তু বিশ্বাস করে বসল। সে ভারি খুশি হয়ে উঠল। অপ্রত্যাশিত অজানা এই আনন্দে সে বিহ্বল হয়ে গেল, শিশুর স্বভাববশত তার

বুক ভরে উঠল সৈনিক বাপের জন্য গর্বে। একেই বলে আসল বাপ! এই ত ওর বাপ, আর ছেলেরা কিনা ওর পেছনে লাগে, বলে ওর বাপ নেই। এখন ওরা দেখুক ওর বাপকে, দেখুক এই রাখালগুলো! পাহাড়ের ভবঘুরে এই রাখালগুলো ছোটদের ভালোমতো জানে না। পশম ছাঁটার কেন্দ্রের উঠোনে ভেড়ার পালকে তাড়িয়ে ঢোকাতে সে ওদের সাহায্য করে, ওদের কুকুরগুলো যখন নিজেদের মধ্যে কামড়াকামড়ি করে তখন তাদের ছাড়িয়ে দেয়, অথচ ওরা তাকে প্রশ্নের পর প্রশ্নে জ্বালিয়ে মারে। প্রতিটি রাখাল আর দুনিয়ায় কত রাখালই না আছে নির্ঘাত প্রশ্ন করে বসবে:

'কী রে বাহাদুর, তোর নাম কী

'আভাল্‌বেক।'

'কার বেটা তুই?'

'তোক্তসুনের ছেলে।'

রাখালরা চট্ করে বুঝতে পারে না কার কথা হচ্ছে।

তোক্তসুন?' জিন থেকে ঝুঁকে পড়ে ফের জিজ্ঞেস করে তারা। 'কোন তোক্তসুন রে?'

'আমি তোক্তসুনের ছেলে,' সে আবার বলে।

মা এই রকম উত্তর দিতে বলেছে আর অন্ধ দাদী হুকুম দিয়ে রেখেছে বাপের নাম যেন না ভোলে। এর জন্য তার কাছ থেকে কানমলা খেতে হয়েছে ওকে। বদরাগী বুড়ি...

'আরে, দাঁড়া, দাঁড়া, পোস্ট আফিসের সেই যে টেলিফোনের মেয়েটা, তুই তারই ছেলে বুঝি? তাই ত? অ্যাঁ?'

'না আমি তোক্তসুনের ছেলে!' ওর সেই এক গোঁ।

তখন রাখালরা আন্দাজ করতে থাকে ব্যাপারটা কী।

'ঠিকই ত, তোক্তসুনের বেটাই বটে! সাবাস! আমরা শুধু তোকে একটু বাজিয়ে দেখছিলাম। রাগ করিস না রে, সারা বছর আমরা থাকি পাহাড়ে, আর তোরা এখানে ঘাসের মতো তরতর করে বেড়েই উঠছিস, বাচ্চাকাচ্চাদের চেনাই দায়।'

তার পর ওরা নিজেরা নিজেরা অনেকক্ষণ ধরে মনে করতে থাকে তার বাপের কথা, ফিসফিসিয়ে বলে যে সে ফ্রণ্টে গিয়েছিল একেবারে কাঁচা বয়সে, অনেকে তার কথা ভুলেই গেছে। বলে, তা-ও ভালো যে অন্তত ছেলেটা আছে, কত লোক ত গিয়েছিল বিয়ে করার আগেই, তাদের আর বংশে বাতি দিতে কেউ রইল না!

আর এখন, মা যখন তাকে ফিসফিসিয়ে বলল, 'দ্যাখ, এটা তোর বাপজান,' সেই মুহূর্ত থেকে পর্দার সৈনিকটি হয়ে উঠল তার বাপ। নিজের বাপ মনে করেই সে তার কথা ভাবতে লাগল। সামরিক ফোটোগ্রাফটায় বাঁকা টুপি পরা যে তরুণ সৈনিকটিকে সে বাপ বলে জানে তার সঙ্গে সত্যি সত্যিই এর কেমন যেন মিল আছে। সেই ফোটোগ্রাফ, যেটা তারা পরে বড় করে ফ্রেমে আঁটা কাচে বাঁধিয়ে দেয়ালে টাঙিয়ে রেখেছে।

এই সময় আভাল্বেক বাপকে দেখল ছেলের চোখ দিয়ে, তার ছেলেমানুষী প্রাণে বাপের জন্য ছেলের এক অজানা ভালোবাসা আর মমতার প্রবল দোলন উঠল। পর্দার বাপও যেন জেনেছে যে তাকে চেয়ে দেখছে ছেলে, যেন চাইছিল যে সিনেমার তার ক্ষণিক জীবনটা এমন হোক যাতে ছেলে চিরকাল তাকে মনে রাখে, চিরকাল গর্ব করে তাকে নিয়ে, বিগত যুদ্ধের সৈনিককে নিয়ে। আর সেই মুহূর্ত থেকে যুদ্ধটা আর মজাদার মনে হল না। ছেলেটার কাছে, লোকে যেভাবে লুটিয়ে পড়ছিল তাতে হাসির কিছু রইল না। যুদ্ধ হয়ে উঠল গুরুতর, উদ্বেগজনক, ভয়ংকর ব্যাপার। আপনজনের জন্য, যে লোকটার অভাব সে সব সময় অনুভব করত, তার জন্য ছেলেটার ভয় হল এই প্রথম।

সিনেমার প্রজেক্টর গুনগুন আওয়াজ তোলে, যুদ্ধ চলছে। সামনে দেখা গেল আক্রমণমুখী ট্যাংক। ক্যাটারপিলারে মাটি ছিঁড়ে খুঁড়ে ভয়ংকর মূর্তিতে এগিয়ে আসছে তারা, যেতে যেতেই চুড়ো ঘুরিয়ে গোলা দাগছে নল থেকে। ওদিকে আমাদের গোলন্দাজরা প্রাণপণে ওপর দিকে কামান ঠেলছে। 'জলদি বাপজান, জলদি! ট্যাংক আসছে,

ট্যাংক!' ছেলে বাপকে তাড়া দিল। অবশেষে কামান হেঁচড়ে উঠানো হল, বাদাম ঝাড়ের ভেতরে গড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ট্যাংক লক্ষ্য করে। শুরু হল গোলাবর্ষণ। ট্যাংকও পাল্টা গুলি চালাল। ট্যাংক ছিল অনেক। ব্যাপারটা ভয়াবহ হয়ে দাঁড়াল।

ছেলের মনে হল সে নিজেও রয়েছে ওখানে, যুদ্ধের আগুন আর নির্ঘোষের মধ্যে, বাপের পাশেই। কালো ধোঁয়ায় যখন জ্বলে উঠছিল ট্যাংক, যখন চাকা থেকে খসে পড়ছিল তাদের ক্যাটারপিলার, যখন তারা অন্ধের মতো আক্রোশে একই জায়গায় পাক খাচ্ছিল, তখন ছেলেটা ওর মায়ের কোলে বসে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছিল। আমাদের সৈন্যেরা যখন লুটিয়ে পড়ছিল কামানের কাছে তখন সে চুপ করে গিয়ে গুটিসুটি মেরে যাচ্ছিল। আমাদের লোকের সংখ্যা ক্রমেই কমতে লাগল... মা কাঁদছিল, তার মুখ জলে ভেসে গেল, টকটকে হয়ে উঠল।

সিনেমার প্রজেক্টর গুনগুন আওয়াজ তোলে, যুদ্ধ চলছে! নতুন তেজে ফুঁসে উঠল লড়াই। ট্যাংক ক্রমেই কাছে, আরও কাছে এগিয়ে আসছে। কামানের গাড়িটার কাছে ঝুঁকে পড়ে বাপ ক্ষিপ্ত হয়ে জোরে জোরে চেঁচিয়ে কী যেন বলছে পোর্টেবল টেলিফোনে, কিন্তু গোলাগুলির গর্জনে কিছুই বোঝার উপায় নেই। আরও একজন সৈন্য ধরাশায়ী হল কামানের কাছে। সে ওঠার চেষ্টা করল কিন্তু পারল না, মুখ থুবড়ে পড়ে গেল মাটিতে। মাটি কালো হয়ে উঠল তার রক্তে। এবারে বাকি রইল ওরা মাত্র দুজন - বাপ আর আরও একজন সৈনিক। আরও একবার গোলা দাগল তারা, তারপর একাদিক্রমে দুবার। কিন্তু ট্যাংকগুলো ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল। দুম্ করে আরও একটা গোলা পড়ল--কামানের পাশে। বিস্ফোরণ। আগুন আর অন্ধকার। এবার মাটি থেকে উঠে দাঁড়াল কেবল একজন - তার বাপ। সে আবার ছুটে গেল কামানের দিকে। নিজেই গোলা ভরল, নিজেই তাক করল। শেষ গোলাবর্ষণ। আবার একটা বিস্ফোরণে ঢেকে গেল পর্দা। বাপের কামানটা উল্টে পাল্টে দুমড়ে মুচড়ে এক পাশে গিয়ে ছিটকে পড়ল। কিন্তু সে নিজে তখনও বেঁচে। ধীরে ধীরে

উঠে দাঁড়িয়ে দগ্ধ দেহে ধূমায়মান ছিন্নভিন্ন পোশাকে সে এগিয়ে গেল ট্যাঙ্কের মুখোমুখি। হাতে তার হাতবোমা। সে আর এখন কিছুই দেখছে না, কিছুই শুনছে না। সে শেষ শক্তিটুকু সঞ্চয় করল।

'দাঁড়া, আর এগুতে হচ্ছে না!' সে হাতবোমাটা উঁচিয়ে ধরে। এই ভঙ্গিতেই, আক্রোশে আর যন্ত্রণায় বিকৃত মুখে মুহূর্তের জন্য নিশ্চল হয়ে থাকে।

মা এত জোরে ছেলের হাত চেপে ধরল যে তার দম প্রায় বন্ধ হয়ে আসছিল। তার ইচ্ছে হচ্ছিল ঝটকা মেরে হাত ছাড়িয়ে ছুটে যায় বাপের কাছে, কিন্তু ট্যাঙ্কের নল থেকে বেরিয়ে এলো এক ঝাঁক গুলি, কাটা গাছের মতো লুটিয়ে পড়ল বাপ। মাটিতে গড়িয়ে পড়ল সে, উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল, কিন্তু ফের পড়ে গেল, দুহাত ছড়িয়ে চিৎপাত হয়ে...

প্রজেক্টর চুপ করে গেল, বন্ধ হয়ে গেল যুদ্ধ। এখানেই রীলটার শেষ। ফের ফিল্ম লোড করার জন্য আলো জ্বালাল অপারেটর।

খোঁয়াড়ে আলো জ্বলতেই সবাই ভুরু কুঁচকে চোখ মিটমিট করে সিনেমার জগৎ থেকে, যুদ্ধ থেকে ফিরে এলো নিজেদের বাস্তব জীবনে। আর সেই মুহূর্তে পশমের গাঁট থেকে লাফিয়ে নেমে ছেলেটা চিৎকার করে উঠল উল্লাসে:

'দেখলি, এ আমার বাপজান! তোরা দেখলি ত? আমার বাপকে ওরা খুন করল...'

এমনটা কেউ প্রত্যাশা করে নি, কেউ ভেবেও পেল না কী ঘটেছে! ছেলেটা কিন্তু বিজয়ীর ভঙ্গিতে চিৎকার করতে করতে ছুটে গেল পর্দার দিকে, যেখানে প্রথম সারিতে বসে ছিল তার বন্ধু ছেলের দল, যাদের মতামত তার কাছে সবচেয়ে দামী। অল্পক্ষণের জন্য একটা অস্বাভাবিক, অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এলো খোঁয়াড়ে। এই যে ছোট্ট মানুষটি আগে নিজের বাপকে কখনও দেখে নি, তার খাপছাড়া আনন্দের অর্থ প্রথমটায় কারও মাথায় ঢুকল না। কেউই কিছু বুঝতে পারল না, সকলে হতভম্ব হয়ে চুপ করে রইল, না বোঝার ভঙ্গিতে

কাঁধ ঝাঁকাল। অপারেটরের হাত থেকে ফিল্মের কৌটোটা খসে পড়ল, ঠনঠন আওয়াজ তুলে তা গড়াতে লাগল দূভাগে খুলে গিয়ে। কিন্তু কেউই সেদিকে দৃকপাত করল না, অপারেটর নিজেও তা তোলার জন্য গা করল না। আর সৈনিক শিশু, মৃত সৈনিকের ছেলে বলেই চলল তার নিজের কথাটা:

'তোরা দেখলি ত, এ আমার বাপজান!.. মেরে ফেলল ওকে।' বলে যাচ্ছিল সে, লোকে যত চুপ করে থাকছিল, ততই সে উত্তেজিত হয়ে পড়ছিল, বুঝতে পারছিল না কেন ওর বাবার জন্য তারই মতো আনন্দ ও গর্ব হচ্ছে না ওদের।

বড়দের মধ্যে কে একজন বিরক্তিতে ফিসফিস করে বলল:

'স্-স্-স, থাম বাপু, এমন কথা বলতে নেই।'

কিন্তু আরেকজন তাকে বাধা দিল:

'তাতে কী হয়েছে? ওর বাপ ফ্রণ্টে মারা গেছে। তা কি সত্যি নয়?'

তখন পড়শীর ছেলেটা, যে ইস্কুলে পড়ছে, সে-ই প্রথম ঠিক করল তাকে সত্যি কথাটা বলবে।

'আরে, এ তো বাপ নয়। চেঁচাচ্ছিস কেন? মোটেই তোর বাপ নয়, একজন অভিনেতা। ঐ ত অপারেটর-খুড়ো, ওকে জিজ্ঞেস কর না।'

বড়রা ছেলেটার তিক্ত ও সুন্দর মোহটা ভাঙতে চাইছিল না, তাই তারা আশা করছিল অপারেটর ত বাইরের লোক, সে-ই না হয় সোজাসুজি সত্যি কথাটা বলে দিক। সবাই তার দিকে ফিরে তাকাল। কিন্তু সে-ও চুপচাপ। প্রজেক্টরে মুখ গুঁজে রইল, যেন বড় ব্যস্ত।

'না, আমার বাপজান, আমার!' সৈনিকের ছেলে শান্ত হল না।

'কিসের আবার তোর বাপ? কে?' ফের জিজ্ঞেস করল পড়শীর ছেলেটা।

'সেই যে বোমা হাতে ট্যাঙ্কের দিকে এগিয়ে গেল। দেখ নি নাকি, এইভাবে পড়ে গেল।'

বলেই সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে গড়াতে লাগল, দেখাল কেমন করে পড়ে গিয়েছিল তার বাপ। আর দেখালও সে হুবহু যেমনটি ঘটেছিল। সে পর্দার সামনে দুহাত ছড়িয়ে চিৎ হয়ে পড়ে রইল।

দর্শকেরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও হেসে উঠল। ও কিন্তু পড়েই রইল নিহতের মতো, হাসল না। আবার নেমে এলো অস্বস্তিকর নীরবতা।

'কী হচ্ছে এ সব, চোখের মাথা খেয়েছিস নাকি জেয়েনগুল?' ভর্ৎসনা করে বলল এক বুড়ি রাখাল। সবাই দেখল মা এগিয়ে যাচ্ছে ছেলের কাছে, শোকার্ত, কঠোর মুখ, চোখে জল।

ছেলেকে সে মাটি থেকে তুলল।

'চল বাছা, চল। তোরই বাপজান,' আস্তে করে বলল সে ছেলেকে, তাকে বার করে নিয়ে এলো খোঁয়াড় থেকে।

চাঁদ ইতিমধ্যে উঁচুতে উঠে এসেছে। কালচে-নীলাভ রাতের বিস্তারে ধবধব করছে পাহাড়ের চুড়োগুলো, এদিকে নীচে পড়ে আছে বিশাল স্তেপভূমি, সূচিভেদ্য, একাকার...

আর কেবল এখন, জীবনে এই প্রথম সে অনুভব করল হারানোর বেদনা। যুদ্ধে নিহত বাপের জন্য হঠাৎ অসম্ভব ক্ষোভ, কষ্ট, জ্বালা বোধ করল সে। হঠাৎ তার ইচ্ছে হল মা'কে জড়িয়ে ধরে কাঁদে, আর মাও যেন কাঁদে তার সঙ্গে। কিন্তু মা চুপ করে রইল। সে-ও চুপ করে হাত মুঠো পাকিয়ে ঢোক গিলে কান্না চাপতে লাগল।

সে জানতে পারল না যে সেই সময় থেকে তার অন্তরে বেঁচে উঠতে শুরু করেছে বহুকাল আগে যুদ্ধে নিহত তার বাপজান।
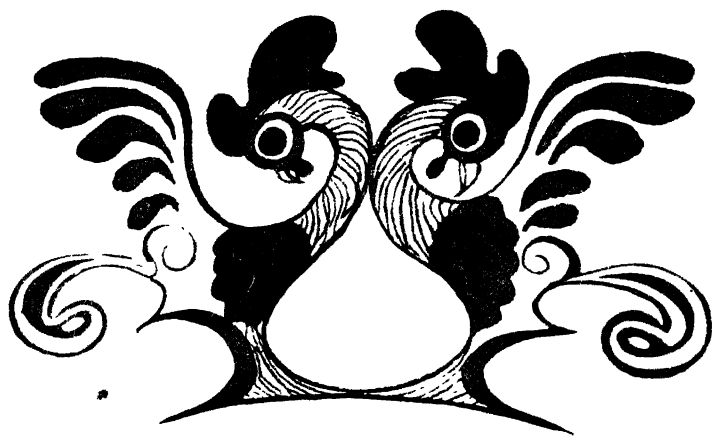
শাব্‌দানবাই আব্‌দিরামানভ

মাতী

মাতী তার দুই ঘোড়ার মালটানা গাড়িটাকে এক দিনের জন্যও ছেড়ে থাকে না। সে গাড়ির ওপর দুপা অনেকখানি ফাঁক করে দাঁড়িয়ে মাথার ওপর ধীরে ধীরে চাবুক ঘোরাতে থাকে, কিংবা কোলকুঁজো হয়ে এক প্রান্তে বসে মৃদু শিস দেয় আর লাগাম ধরে আস্তে আস্তে টান মারে। তার কালো কেশরওয়ালা ঘোড়া দুটোর মধ্যে বেশ বোঝাপড়া আছে -- তারা নিজেরাই পথ দেখে দেখে দুলকি চালে ছুটে চলে।

এত বছরের মধ্যে মাতী একবারও অনুযোগ করে নি, অন্য কোন কাজের দাবি করে নি। কী বৃষ্টি-বাদলার দিনে, কী ঠাণ্ডায়, কর্মিবাহিনীর প্রধান তাকে যেখানে পাঠাত, সে বিনা বাক্যব্যয়ে সেখানেই যেত, চালাঘর থেকে বিচালি বার করত, বাদামী ঘোড়া দুটোকে গাড়িতে জুতত। এই সময় তার পুরু ভুরুজোড়া কুঁচকে উঠত, সে কী যেন বিড়বিড় করত, কিন্তু এতে কেউ অবাক হত না: সকলেরই জানা ছিল যে এটা তার স্বভাবমাত্র।

মাতীর বাপ, বুড়ো কাসিমের বয়স ষাট পার হয়ে গেছে। বুড়োর বিবি সাইরা বয়সে তার চেয়ে সামান্য ছোট। তাদের চার ছেলে, পাঁচ মেয়ে। সবাই মিলেমিশে থাকে। পাড়াপড়শীরা তাদের বাড়িতে কখনও গালাগাল ও ঝগড়াঝাঁটি শোনে নি, পাড়ার পুরুষরা বুড়ো কাসিমকে সম্মান করত আর পাড়ার মহিলারা সাইরার সম্পর্কে বলতে গিয়ে গোপন ঈর্ষা প্রকাশ করত। সে দেখতে বাচ্চাদের মতো ছোটখাটো, কোলকুঁজো হলে কী হবে, মেয়েদের সকলের ওপর আর বাড়ির বৌদের ওপর তার অসাধারণ কর্তৃত্ব ছিল।

তার তুলনায় বুড়ো কাসিম ছিল ভাবুক ধরনের নিরীহ প্রকৃতির মানুষ। কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে সে তাড়াহুড়ো করত না, কোন কাজ শুরু করার আগে অনেকক্ষণ ধরে মনে মনে তার ভালোমন্দ বিচার করে দেখত — ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে বসে ধীরে ধীরে জমকাল পাকা দাড়িতে বিলি কাটত, তারপর বৌয়ের কাছে পরামর্শ চাইত।

ছেলেদের মধ্যে একমাত্র মাতীই এখনও বিয়ে করে নি। কাসিম তাতে তেমন উদ্বিগ্ন নয়। আজকালকার মরদেরা তাদের খেয়ালখুশি মতো কাজ করে — তার মানে মাতী নিজেই পছন্দ করে একটা মেয়ে নিয়ে আসবে -- হয়ত আমাদের গাঁয়ের, আবার ওপরের গাঁয়েরও হতে পারে।

কিন্তু সময় কেটে যায়, এদিকে মাতী কাউকেই নিয়ে আসে না। বুড়ো কাসিম উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল।

"লোকে কী বলছে কে জানে?" সে ভাবল! "তারা হয়ত বলাবলি করছে যে আমাদের পরিবারের পক্ষে এটা পাপ। ঠিকই, মাতী শিগ্গিরই চব্বিশ বছরে পড়বে... হায় আল্লা।"

মাতী কবে নিজে বৌ খুঁজে আনবে সেই আশায় বুড়ো যে এতদিন বসে ছিল তার জন্য সে নিজেকে কোনমতেই ক্ষমা করতে পারল না। "বুড়ো বুদ্ধির ঢেঁকি!" সে মনে মনে নিজেকে গালাগাল দিল। "ভেবেছিলাম এই অপদার্থ মাতীটা শেষকালে মানুষ হবে!"

সারা দিন বাড়ির সামনে, একমাত্র বিরাট বাদাম গাছটার ছায়ায় কম্বলের আসনে বসে ভাবতে ভাবতে বুড়োর মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে গেল। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল বুড়ি ভাগ্নীকে। সে থাকে দূরের গাঁয়ে। কয়েক বছর আগে তার বাড়িতে সে গিয়েছিল, তখন নজরে পড়েছিল তার দুই মেয়েকে। সারাটা সন্ধ্যা বুড়ো সে কথাই ভাবতে লাগল।

পরদিন সকালে সে নাদুসনুদুস কালো কুচকুচে মাদী ঘোড়াটার পিঠে জিন চাপাল, বৌকেও কোন কথা না বলে দূর গাঁয়ের দিকে যাত্রা করল।

একমাত্র মামাটি যে তাকে ভুলে যায় নি এই ভেবে বুড়ি ভাগ্নী মহা খুশি, কাসিমও তার আন্তরিক কুশল কামনা করল।

চা পানের পর কাসিম গলা ঝাড়ল, দাড়িতে মৃদু হাত বুলাল, তারপর শুরু করল:

'শোন ভাগ্নী, আমার মনে হয়, আমাদের ছেলেমেয়েরা ভুলেই যেতে বসেছে যে তাদের মধ্যে আত্মীয়তা আছে। এটা এদের মনে করিয়ে দেওয়া দরকার।' এই বলে সে খানিকক্ষণ ভেবে বলল, 'আমাদের আবার রক্তের সম্পর্ক পাতানো দরকার।'

বুড়ি না বুঝতে পেরে কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর প্রায় কেঁদেই ফেলল, মাথা ঝাঁকাতে লাগল।

'ওঃ, মামা গো, আল্লা তোমাকে দীর্ঘায়ু করুন!' তারপর চোখের জল মুছতে মুছতে বলল, 'আমার ত তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে। এই বাগান, এই আঙ্গিনা — এটাও ত নেহাৎ মন্দ নয়, আর এই বাড়ি — এ সব কার জন্যে রেখে যাব? কোন আত্মীয়কে যখন দেওয়া যায় তখন আর উটকো লোককে দিতে ত খারাপ লাগারই কথা... তা ছাড়া তোমার নাতী কি আর খারাপ ছেলে?' বুড়ি কাসিমের দিকে তাকাতে কাসিম মাথা নাড়ল। 'আমার আইগুলিয়ার সঙ্গে সম্বন্ধ পাতিয়ে ফেল, ওরা দুটিতে এখানে থাকবে, বাড়ি ত দেখতে পাচ্ছ বড়, ওদের জন্যে ঘর আলাদা করে দেব। ছোট মেয়ে আপাতত আমার সঙ্গেই

থাকবে। পরে সে-ও...' বুড়ি এই রকম পরিকল্পনা খাড়া করল, আর তার মামা কাসিম আগাগোড়া সায় দিয়ে মাথা নেড়ে চলল।

শিগ্‌গিরই বিয়ে হয়ে গেল, মাতীও বাস উঠিয়ে চলে এলো আইগুলিয়ার বাড়িতে। বিয়ের আগে তাদের মোটে কয়েকবার দেখাসাক্ষাৎ হলেও তারা তাড়াতাড়ি একে অন্যের সঙ্গে মানিয়ে নিল। তাদের মধ্যে সঞ্চারিত হল এমন এক গোপন শক্তি যা দিনে দিনে তাদের বাঁধন শক্ত করে তুলল। মাতী দরদ দিয়ে আইগুলিয়ার কথা ভাবত আর সোহাগভরে তার গোলাপী ছোপধরা সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত। জোড়া ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে সে যৌথখামারে কাজ করত, কিন্তু নিজের উঠোনে কাজ করতেও তার ভালো লাগত।

বাড়ি ফিরে এসে সে হাত গুটিয়ে বসে থাকত না -- কখনও জলসেচের নালা কোপাত, কখনও বাগানে জল দিত, কখনও বা দেয়ালে আস্তর লাগাত।

এটা লক্ষ্য করে আইগুলিয়া ও তার মা ওর সঙ্গে এমন ব্যবহার করতে লাগল যে ও যেন বাড়ির কর্তা, তারা ওর মন যোগানোর চেষ্টা করত, সব ব্যাপারে ওর পরামর্শ নিত। মাতী ছিল আত্মতৃপ্ত লোক, সে-ও মনে মনে নিজেকে বাড়ির কর্তা বলে, বয়স্ক ও ক্ষমতাবান পুরুষ বলে ভাবতে শুরু করল। একদিন মাতী বেড়ার ওপাশে, পথের ঠিক ধারে একটা গর্ত খুঁড়ল, নালা কেটে জল এনে মাটি গুলতে লাগল। শাশুড়ি বেশ খানিকটা সামনে এগিয়ে এলো, কিন্তু বুঝতে পারল না সে কী করছে। চোখ কুঁচকে, হাতের তালু দিয়ে রোদ থেকে চোখ আড়াল করে সে স্নেহমাখা সুরে জিজ্ঞেস করল:

'আল্লা তোমার ভালো করুন বাছা, এটা কী করছ?'

'একটা চালাঘর তুলতে চাই মা,' মাতী সোৎসাহে বলল। 'কখনও কখনও অতিথ-বিতিথ ঘোড়ায় চেপে আসে, ঘোড়া রাখার জায়গা হবে, আর শীতকালে আমাদের গোরুর গোয়ালঘর হবে।' বুড়ো কাসিম মাতীকে যে গোরুটা দিয়েছিল তার প্রসঙ্গেই সে কথাটা বলল।

বুড়ি মাতীকে আশীর্বাদ জানিয়ে সেখান থেকে সরে গেল,

আল্লাকে মনে মনে কৃতজ্ঞতা জানাল এই জন্য যে তিনি তাকে এমন একটি জামাই জুটিয়ে দিয়েছেন।

এদিকে মাতী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে চালাঘরের চার দেয়াল তুলে ফেলল।

একবার যৌথখামারের মাড়াইয়ে কাজ শেষ করার পর মাতী ঘোড়া দুটোকে ছেড়ে তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে পা চালাল। সে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় বাড়ির বেড়ার সামনে দেখতে পেল আইগুলিয়াকে, সে বকির নামে এক ঢ্যাঙা শুঁটকো ছোকরার সঙ্গে কথা বলছে।

মাতীর বুকের ভেতরটা কেমন যেন তোলপাড় করে উঠল। সে অতি কষ্টে নিজেকে সংযত রাখল, নীচের ঠোঁট দাঁতে কামড়াল; না তাকিয়ে, সম্ভাষণ না করে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। বকিরও সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ ও কুঁজোটে নাকটা আড়াল করে সরে পড়ল।

ঘবে প্রবেশ করে মাতী শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করল:

'বকির এখানে এসেছিল কেন বিবি?'

'ওর দিকে তাকিয়ে দেখ তোমরা!' আইগুলিয়া হাসতে লাগল। 'রেগে গেছে, ভুরু কুঁচকে আছে... এসেছিল কেন - পরে জানবে'খন, ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই,' মাতীকে ভেংচি কেটে ও বলল।

পরের দিন সকালে মাতী যখন মাড়াইয়ের দিকে এগোচ্ছিল তখন একসঙ্গে বেশ কয়েকজনের জোর হাসি সে শুনতে পেল। হাসছিল ছেলেছোকরার দল, তাদের মধ্যে বকিরও ছিল। তাদের হাসি আর কিছুতেই থামে না, হিহি হাসি যেন বসন্তকালের বাচ্চা ঘোড়াদের চিঁহিচিঁহি ডাক: ওরা মাতীর দিকে মোটেই তাকাচ্ছিল না, কিন্তু মাতী ধরে নিল যে ওরা ওকে নিয়েই হাসছে, ঠাট্টা করছে। তার বুকে যেন ধারাল ছুরির ফলা এসে বিঁধল।

মাতী তাদের দিকে এগিয়ে এসে কান পেতে শুনল: তারা ওর সম্পর্কে বলছিল না, কিন্তু ওর মনে হল যে ওরা ইচ্ছে করেই ভান করছে— ওকে দেখতে পেয়েছে কিনা। ধূর্ত কোথাকার।

কয়েক দিন বাদে ছেলেছোকরার দল ঘোড়ার গাড়ি করে স্টেশনে শস্য দিয়ে আসার পর রাতের দিকে গাঁয়ে ফিরে আসছিল। পথে তারা গাঁয়ের সদ্য বিয়ে হওয়া মেয়ে আর সোমত্ত মেয়েদের কথা মনে করে হাসিঠাট্টা করতে লাগল।

ওদের একজন নিজের গাড়ির ঘোড়া দুটোকে জোর হাঁকিয়ে দিয়ে চওড়া রাস্তার ওপর মাতীর গাড়ির নাগাল ধরে ফেলল, সকলে যাতে শুনতে পায় এইভাবে জোরে চেঁচিয়ে বলল:

'আইগুলিয়ার জন্যে কত পণ দিয়েছিস রে তুই, মাতী?'

'কিছুই দিই নি,' বিব্রত হাসি হেসে মাতী বলল।

'আরে পণ আবার কিসের!' পেছনের গাড়ি থেকে কে যেন চেঁচিয়ে বলল: 'ও ত আর অমনি জামাই নয়! ও হল ঘরজামাই!'

এই বলে সে ঝঙ্কার তুলে হো হো করে হাসতে লাগল। তারা আশা করছিল যে মাতী তাদের হাসিতে যোগ দেবে। কিন্তু মাতী হাসল না, আর তার রাগ ও অসন্তোষের ভাব দেখে ওরাও অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল।

মাতী কিন্তু শান্ত হতে পারল না। 'ঘরজামাই'—এই অপমানজনক কথা তার গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিল, তার গোটা বংশের গায়ে যেন কালি লেপে দিল।

সাধে কী আর বলে, 'নরম ঘাড় পেলে লোকে আরও পেয়ে বসে!' মাতীরও হল সেই অবস্থা: এটাই সব নয়—বাড়ির কাছে সে আবার দেখতে পেল আইগুলিয়া ও বকিরকে। ছোকরাদের দেখতে পেয়ে বকির তাদের সম্ভাষণ জানাল, নিজের গাড়িটায় চেপে বসে মাড়াইয়ের জায়গার উদ্দেশে রওনা দিল। এদিকে মাতী আবার শুনতে পেল দলের সকলে তার বাড়ির পাশ দিয়ে চলে যেতে যেতে জোর হাসছে।

"আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করছে," রাগে জ্বলতে জ্বলতে সে ভাবল।

বাড়িতে আইগুলিয়ার সঙ্গে সে কথা বলল না।

'কী হল তোমার?' আইগুলিয়া ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করল।

'তোমাকে কেমন ফেকাসে দেখাচ্ছে। অসুখ-বিসুখ করে নি ত?'

মাতী চুপ করে রইল।

সন্ধ্যায় আইগুলিয়া টাটকা মাংস, গাজর আর পেঁয়াজের কলি দিয়ে পোলাও বানাল। পোলাও থেকে এমন খুশবু বেরোচ্ছিল যে আইগুলিয়া টেবিলের ওপর তা রাখতে মাতী যেন ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো হুমড়ি খেয়ে পড়ল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার চোখের সামনে এসে দাঁড়াল বকিরের হাড়-উঁচু চোয়াড়ে মুখটা। রাগে মাতীর সর্বাঙ্গ রিরি করে উঠল। সে ভুরু কুঁচকে থালার পোলাও ঘাঁটতে লাগল।

'পোলাওটা আলুনী হয়েছে,' মাথা না তুলে সে অর্ধস্ফুট স্বরে বিড়বিড় করে বলল।

'আমার ত মনে হয় ঠিকই আছে,' আইগুলিয়া বলল।

এক মিনিট বাদে মাতী বিড়বিড় করে বলল:

'হুঃ, পোলাও বটে! গাজর কাঁচা কাঁচা রয়ে গেছে...'

'বল কী গো!' আইগুলিয়া অবাক হয়ে গেল। 'আর ভাজলে একেবারেই পুড়ে যেত।'

'আর চাল বোধহয় অনেকক্ষণ টগবগে জলে ফুটেছে,' সে যোগ করল। 'দেখ, হয়েছে জাউয়ের মতো, নরম কাই।'

আইগুলিয়াও দারুণ খেপে গেল, তার কথার আর কোন জবাব দিল না। মাতী খানিকটা অপেক্ষা করল।

'চালটা তুমি কোন সময়ই আন্দাজ করতে পার না,' সে বলল। 'আমার মা যা পোলাও বানায় না...'

আইগুলিয়া একদৃষ্টে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, বোঝার চেষ্টা করতে লাগল কেন ও বাচ্চা ছেলের মতো খেয়ালিপনা করছে। মাতী ভয়ংকর খেপে গেল। ওর ইচ্ছে ছিল খোঁচাটা যেন আরও বেশি করে আইগুলিয়াকে বেঁধে।

'তোমার হাতে ভালো পোলাও আর কবেই বা হয়েছে?' সে ফোঁস করে উঠল। 'তুমি রান্না একেবারেই করতে পার না। আমার মা...'

আইগুলিয়া আর সহ্য করতে পারল না।

সে রূক্ষ স্বরে বলল, 'যদি তা-ই হয়, তোমার মা-ই তোমার মনের মতো পোলাও করুন গে।'

মাতী এ রকম জবাব প্রত্যাশা করে নি। মাতী চোখ বড় বড় করে আইগুলিয়ার দিকে তাকাল, তড়াক্ করে টেবিলের ধার থেকে উঠে পড়ল। তা দেখে আইগুলিয়া আবার বলল:

'হ্যাঁ, আমার পোলাও যদি তোমার ভালো না লাগে ত যেখানে তোমার পোলাও ভালো মনে হয় সেখানে চলে যাও।'

'বটে!' মাতী চিৎকার করে উঠল।

'এ ছাড়া আর কী বলব?'

মাতী ছুটে উঠোনে বেরিয়ে গেল। সেখানে সে বিয়ে উপলক্ষে বাবার দেওয়া গোরুটার দিকে দৌড়ে গিয়ে খুঁটি থেকে সেটার বাঁধন খুলে হিড়হিড় করে উঠোন থেকে বার করে আনল। পথে বেরিয়ে এসে সে পেছন ফিরে তাকাল এত বড় ক্ষতিতে আইগুলিয়ার প্রতিক্রিয়াটা কী হয় তা দেখার উদ্দেশ্যে। তার চোখ গিয়ে পড়ল সেই চালাঘরটার ওপর, যেটা সে বানাতে শুরু করেছিল। মাতী সেই দিকে ধেয়ে গেল, কোদাল হাতে তুলে নিয়ে একেবারে ভিত অবধি চার দেয়ালের সবগুলো ভেঙে ফেলল!

এবারে ও তাকাল আইগুলিয়ার দিকে। সে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল তার কীর্তিকাণ্ড। আইগুলিয়া একটি কথাও বলল না, কেবল তার দুচোখ রাগে জ্বলছে। মাতী যখন চালাঘর ভাঙা সেরে বিজয়গর্বে গোরুটাকে টানতে টানতে উঠোন দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তখন সে পেছন থেকে হিহি করে তার উদ্দেশে বিদ্রূপের হাসি হেসে ঘরের ভেতরে চলে গেল।

মাতী যখন বাপ-মা'র কাছে এসে পেঁছুল তখন তারা সন্ধ্যার খাবারের আয়োজন করছিল। মা ও বাবা উঠোনে কাজে ব্যস্ত ছিল. মাতীকে দেখতে পেয়ে তারা এগিয়ে গেল। তারা ভয়ার্ত চোখে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল ও কী বলে।

মাতী বলল যে সে আইগ্নলিয়ার সঙ্গে ঝগড়া করে চলে এসেছে। ব্নড়ো কাসিম চুপচাপ বসে রইল, আর সাইরা ছেলের উদ্দেশে অজস্র গালাগাল বর্ষণ করতে লাগল। তার ঝাঁজাল ও জাঁদরেল গলা শোনার মতো অভ্যাস এখন আর মাতীর নেই।

তারপর মাতী সন্ধ্যার খাবার খেল, কিন্তু কেউই তাকে বাড়ির কর্তার খাতির-যত্ন দেখিয়ে ভালো টুকরো তার পাতে তুলে দিল না, কেউই তার দিকে মনোযোগ দিল না। তারপর ঘ্নমানোর সময় হল, মাতীকে দোরের বাইরে মেজের ওপর বিছানা পেতে দেওয়া হল। সে উ'চু পালঙ্কের ওপর পরিচ্ছন্ন নরম বিছানায় আরাম উপভোগ করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, এখন কিছ্নতেই তার ঘ্নম আসে না, সারা রাত এপাশ ওপাশ করতে থাকে, শক্ত মাটি আর বেকায়দার বালিশকে শাপ শাপান্ত করতে লাগল। ভোরের আলো ফোটার আগেই তার মাথায় এমন ভাবনা পর্যন্ত হল যে পারিবারিক জীবন ভাঙার ব্যাপারে বড় বেশি তাড়াহ্নড়োই করে ফেলেছে...

সপ্তাহ দ্নয়েক কেটে গেল।

মাতী শ্ননতে পেল যে বকির আইগ্নলিয়ার ছোট বোনকে বিয়ে করতে চলেছে। এই সংবাদে মাতী চমকে উঠল। সে কাউকে কোন কথা না বলে মাথা নীচু করে অনেকক্ষণ বসে রইল। সে ব্নঝতে পারল বকিরের সঙ্গে আইগ্নলিয়া কেন দেখা করত, তাদের মধ্যে গোপনে কী কথাবার্তাই বা হত। কির্গিজদের মধ্যে নিয়ম আছে: কোন মেয়ে যদি পণ ছাড়া বিয়ে করে তা হলে বাগ্‌দান এমনভাবে হত যাতে কেউ সে কথা না জানতে পারে, জানতে পারলে আত্মীয়স্বজনরা বিয়ের আচার-অন্নষ্ঠান পালনের দাবি জানাবে।

রাতে মাতী চোখের পাতা বন্ধ করতে পারল না। কখনও বালিশে মাথা গোঁজে, কখনও বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে ওঠে, কখনও বা ছ্নটে উঠোনে বেরিয়ে এসে দেখে ভোরের আলো ফুটেছে কিনা।

দ্বিতীয় দফায় মোরগ যখন ডেকে উঠল তখন ওর মনে পড়ে গেল প্রথম থেকে শেষ দিন পর্যন্ত আইগ্নলিয়ার সঙ্গে তার আগাগোড়া

জীবনের কথা, আর শেষ হয়ে হয়ত জীবন গেছে এই ভেবে তার ভয় হতে লাগল।

খুব ভোরে মাতী আইগুলিয়ার উদ্দেশে রওনা হল। সে যখন এসে পেঁছুল, আইগুলিয়া তখনও ঘুমাচ্ছিল। তার কাছে যাওয়ার মতো সাহস মাতীর হল না, কেন না তার চোখে এখন সে বনপরীর চেয়েও সুন্দরী, রানীর চেয়েও ভয়ংকর।

মাতী ভেবে কূল পেল না কী করবে। সে গোটা উঠোনটা ঘুরে এলো, দেখতে পেল সেই জায়গাটা যেখানে সে চালাঘর বানাতে শুরু করেছিল। দেয়ালের ভাঙা টুকরোগুলো সরিয়ে ফেলা হয়েছে। মাতী কোদাল তুলে নিয়ে মাটি খুঁড়তে লেগে গেল।

এই সময় বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো আইগুলিয়া।

'তুমি আবার কে?' সে কটু স্বরে জিজ্ঞেস করল। 'সেই কামলাটা নাকি যে আমাদের চালাঘর তৈরীর কাজে হাত দিয়েছিল?'

মাতী কপাল থেকে ঘাম মুছে ফেলে আইগুলিয়ার দিকে তাকিয়ে শান্ত স্বরে বলল:

'দেয়ালগুলো তখন বাঁকা হয়েছিল তাই ভেঙে ফেলেছি।'

শাইমবেক আপিলভ

প্রতীক্ষা

ঈষদুষ্ণ দিন। সূর্যের উজ্জ্বল কিরণ ঝরে পড়ছে। টিলার মাথার ওপরে উঁচু আকাশে ঘুরপাক খাচ্ছে চাতক পাখি, তীক্ষ্ম সুর বিস্তার করতে করতে ক্রমাগত ওপরে উঠছে। হঠাৎ যেন তারই সুরের ধুয়া ধরে বেজে উঠল তেমির কোমুজের সুরলহরী, তবে তার আওয়াজ খানিকটা বিষণ্ণ ও কোমল। মনে হল সে সুরও যেন ভেসে চলেছে পাহাড়পর্বতের চুড়ো আর বিস্তীর্ণ প্রান্তরের ওপর দিয়ে। চাতক উড়তে উড়তে অনেক উঁচুতে উঠে গেল, মাটি থেকে ওপরে, আকাশের গায়ে স্থির, অনড় হয়ে রইল।

নীচে শোনা গেল হ্রেষাধ্বনি আর সইসদের উঁচু গলায় চিৎকার-চেঁচামেচি: পাহাড়ের দিকে এগিয়ে আসছে একপাল ঘোড়া। জন্তুগুলো একে অন্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটতে ছুটতে, খেলার ছলে, স্বচ্ছন্দে ও দ্রুত ছুটে চলছে।

টিলার ওপর বসে এক বুড়ি তেমির কোমুজ বাজাচ্ছিল। শান্তির ব্যাঘাত ঘটায় সে বিরক্ত হয়ে বাজনা বন্ধ করে দিল। ঘোড়ার পাল দূরে চলে যাচ্ছিল, বুড়ি ভুরু কুঁচকে তাদের যাত্রাপথের দিকে তাকিয়ে রইল।

আবার নিস্তব্ধতার রাজত্ব, কিন্তু অল্পক্ষণের জন্য। পাহাড়তলির গাঁ থেকে, যেখানে খরস্রোতা পাহাড়ী নদী চোখে পড়ে, সেখান থেকে ভেসে এলো চাকার ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ আর নানা কণ্ঠের সোরগোল। বুড়ি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল, তাড়াতাড়ি তেমির কোমুজ ওড়নায় জড়িয়ে ফেলল, যেখান থেকে আওয়াজ ভেসে আসছিল সেদিকে মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করতে লাগল। সেখানে মেয়ে-বৌ ও বাচ্চাকাচ্চারা ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে আসছিল, কোথায় যেন টেনে নিয়ে যাচ্ছিল ঘরের আসবাবপত্র, খেদিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল গোরুর পাল; নানা রকমের মালপত্রে বোঝাই হয়ে গাঁ থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল মালটানা ঘোড়ার গাড়ি। গাড়িগুলো চলেছে উপত্যকার বড় গাঁয়ের মুখে।

একটা খালি সওয়ারি গাড়ি ঘর্ঘর করে এসে থামল ছোট গাঁয়ের শেষ বাড়িটার কাছে। দুটি অল্পবয়সী ছোকরা গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে বাড়ির ভেতরে উঁকি মারল:

'উপাই আপা!'

'উপাই আপা, কোথায় গেলে?'

বুড়ি ভুরু কোঁচকাল, ডাকে সাড়া দিল না, এমন কি জায়গা থেকেও নড়ল না।

'উপাই আপা... এ-ই, উপাই আপা-আ-আ!..'

এবারে সারা তল্লাট জুড়ে ওরা চেঁচিয়ে ওর নাম ধরে ডাকল:

'উপাই আপা!'

বুড়ি তখন দুহাতে ভর দিয়ে অতি কষ্টে উঠে দাঁড়াল, ধীরে ধীরে টিলা থেকে নীচে নামতে লাগল, নামার সময় বিচালির আঁটিটা তুলে নিতে ভুলেই গেল। এক মনে নিজের ভাবনা ভাবতে ভাবতে সে গাঁয়ের দিকে এগোতে লাগল। বলিরেখায় ফুটিফাটা মুখ, নিষ্প্রভ

চোখজোড়া, পাকা চুল আর জরাগ্রস্ত কুব্জদেহ—এ সবই এই মহিলার দুর্ভাগ্যের পরিচয় বহন করছে।

বাড়ি পর্যন্ত না গিয়ে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। উঠোনে একটা মালটানা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। দুই ছোকরা খোশ মেজাজে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলতে বলতে চালাঘর থেকে গাদা গাদা বিচালি এনে সেখানে তুলছিল। বিচালির আঁটিটা যে ভুলে ফেলে এসেছে তা মনে পড়ে যেতে বুড়ি আবার উল্‌টো পথে হাঁটা দিল।

সে যখন ফিরে এলো ততক্ষণে রক্তিমবর্ণের বিশাল সূর্য বসন্তের জলভরা কালো মেঘের আড়ালে অস্ত যেতে বসেছে। বুড়ির বাড়ির সামনে অপেক্ষা করছিল প্রতিবেশিনী—ছটফটে স্বভাবের মহিলা, বয়স তার বছর চল্লিশ। সে দুহাত বাড়িয়ে তার কাছ থেকে আঁটিটা নিল।

'আপা, তোমাকে নিতে এসেছিল।'

উপাই আপা তার কথায় মনোযোগ না দিয়ে বাড়ির আঙ্গিনায় চোখ বুলাল।

...এই ত মাটির পুরোনো বাড়ি। চালাঘর। সে ঘরে প্রবেশ করে মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ল। পড়শী মহিলাটি প্রদীপ জ্বালাল, বুড়ির নীরবতায় খানিকটা অবাক হয়ে আবার বলল:

'শুনছ আপা? তোমাকে নিতে এসেছিল...'

উপাই আপা এবারেও কোন জবাব দিল না।

'আর বিচালি দিয়ে কী হবে শুনি?' এবারে বিরক্ত হয়ে প্রতিবেশিনী বলল। 'বরং এসো, জিনিসপত্র গোছগাছ করা যাক। সকালে সময় না-ও হতে পারে। বুড়ো হলেই লোকের ছেলেমানুষী পেয়ে বসে,' নীচু গলায় সে যোগ করল।

উপাই আপা বিছানো কম্বলটার ওপর ধপ করে বসে পড়ল, দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল:

'শরীরটা কাহিল লাগছে গুলাইম। তা তুই গেলি না কেন?'

গুলাইম অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল:

'তোমাকে একা রেখে যাব?'

'তাতে কী হয়েছে? এখানেই আমার ভালো...

'কী যে বল আপা? স্রেফ একা একা কোন মানুষের কি কখনও ভালো লাগতে পারে?'

'এ বাড়ি আমি ছাড়ব কী করে?' বুড়ি মাথা নাড়াল। 'এ বাড়ি আমার সব... আমার সবকিছু এখানে... সব...'

প্রতিবেশিনী চলে গেল। জানলার বাইরে রাত নেমে এসেছে। মেঘের হাঁকডাক শুরু হয়ে গেল। নিস্তব্ধ গ্রামের ওপর মুষলধারে ঝরতে লাগল বসন্তের বর্ষণ। ঘরে চুল্লির পাশে একটা নীচু টুলের ওপর বাতি জ্বলছিল। তারই পাশে উপাই আপা অনেকক্ষণ গভীর ভাবনায় ডুবে বসে রইল। তারপর সে উঠে দাঁড়াল, সিন্দুক খুলল, কতকগুলো জিনিস সেখানে ভাঁজ করে রাখতে গেল, কিন্তু আবার কী যেন ভেবে সেগুলোকে আগের মতোই পেরেকে ঝুলিয়ে রাখল। টেবিলের কাছে এগিয়ে এলো, বাসনপত্র গোছাবে বলে ঠিক করল, কিন্তু কেবল দাঁড়িয়ে রইল, সব যেমনকার তেমন রেখে দিল। ঘরে খানিকক্ষণ পায়চারি করার পর সে কী করবে বুঝে উঠতে না পেরে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

দরজায় ঘা পড়ল। উপাই আপা কান পেতে শুনল। ধাক্কাটা আবার শোনা গেল। বুড়ি ছোট পুঁটলিটা হাতে নিয়ে দরজার দিকে ঘুরে দাঁড়াল:

'গুলাইম, তুই নাকি?'

দোরগোড়ায় এক অল্পবয়স্ক সৈনিকের মূর্তির আবির্ভাব ঘটল। তার কাঁধে জিনিসপত্রে বোঝাই থলি। তার আপাদমস্তক ভিজে সপসপ করছে। সৈনিক মাথার টুপি খুলল, টুপি থেকে বৃষ্টির ফোঁটা ঝেড়ে ফেলল।

'আদাব, আপা।'

উপাই আপা অবাক হয়ে নীরবে আগন্তুকের দিকে তাকাল। সৈনিক হাসল, ঘরের ভেতরে এগিয়ে এসে বলল:

'আদাব!'

উপাই আপা মাথা সামান্য নোয়াল, চোখ কুঁচকে একদৃষ্টিতে সৈনিকের মুখের দিকে তাকাল। সৈনিক তার কাঁধের থলি নামিয়ে রেখে দাঁড়িয়ে রইল, তার মুখে ফুটে উঠল অমায়িক প্রশস্ত হাসি।

'আমার দিকে অমন করে তাকাচ্ছেন কেন?'

'তুমি কে?'

'আস্‌কার!'

'আস্‌কার?.. তা যাচ্ছ কোথায়?'

'ঘরে! এদিকে যা বৃষ্টি নামল... আচ্ছা, এটা কী রকম গাঁ? আগুন চোখে পড়ে না, কুকুর ডাকে না...'

'আমরা দুই পাহাড়ের মাঝখানের জমিতে উঠে যাচ্ছি।'

গৃহকর্ত্রীর হাতে যে পুঁটলি ধরা ছিল মাত্র এখনই সেটা সৈনিকের নজরে পড়ল। প্রায় ফাঁকা ঘরের ওপর সে নজর বুলাল, মেঝেতে দেখতে পেল পোঁটলা-পুঁটলি।

উপাই আপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাতের পুঁটলিটা মেঝেতে নামিয়ে রাখল।

সৈনিক আসার সঙ্গে সঙ্গে ঘরটা অনেক আরামের মনে হল, এখন যেন আর তেমন খালি-খালি নয়। উনুনে আগুন জ্বলল। সৈনিকের ভিজে হাইবুট শুকোতে দেওয়া হয়েছে, সেখান থেকে তাপ উঠছে। উপাই আপা সামোভার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ছেলেটা ভিজে পোশাক দড়িতে টাঙাচ্ছিল। উপাই আপা থেকে থেকে খুশি মনে তার খালি পা আর কোমর অবধি আদুল গা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল।

'তোমার বাড়ি কোথায়?'

'জার তাশ জানেন?'

বুড়ি মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল:

'বাড়িতে অপেক্ষা করছে বুঝি?'

'হুঁ... মা-বাপ, দাদী...' কী যেন মনে হতে সৈনিক হেসে ফেলল। 'এমন বিড়বিড় করে!'

'দাদীর কথা বলছিস?'

'হ্যাঁ... কোথায় যেন আপনার সঙ্গে মিল আছে।'

সৈনিকের হাত থেকে ফৌজী শার্টটা পড়ে গেল, সেটা ওঠাতে ওঠাতে সে অর্ধস্ফুট স্বরে বলল:

'বৃষ্টি না হলে এতক্ষণ বাড়ি পেঁৗছে যেতাম...'

উপাই আপা তার কথাটা অনুমোদন করল না, মাথা নেড়ে বলল:

'রাতে?'

'হ্যাঁ। বুড়ি আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। আমাদেরও এ রকম বাড়ি। কোণে এ রকমই একটা সিন্দুক। দাদী ওটা খোলে আর পাশে বসে বসে কী যেন ভাবে। কী ভাবে, জানেন?'

সে দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে দরজা খানিকটা ফাঁক করে বাইরে উঁকি মারল। অন্ধকারে তেমনই বৃষ্টির শব্দ। শীত-শীত লাগাতে সৈনিক কাঁধ ঝাঁকাল, হাই তুলল।

'আপা, সকাল নাগাদ কি তা হলে বাড়ি পেঁৗছুতে পারব না?'

জবাব মিলল না। সৈনিক পেছন ফিরে তাকাল। বুড়ি ঘরের কোনায় খোলা সিন্দুকের সামনে বসে আছে।

'তা তোর দাদী কী ভাবে?'

সৈনিক মাথা ঝাঁকাল।

'এই আর কি... একথা ওকথা মনে পড়ে যায়... দরজায় ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ হলেই তার মনে হয় যেন ছেলেরা ঘরে ফিরে এলো। যুদ্ধের সময় তারা নিখোঁজ হয়ে যায়।'

সে দরজাটা বন্ধ করে দিল, উনুনের কাছে এগিয়ে গেল, সামোভারে কিছু কয়লা ফেলে দিল, নীচু টুলটা টেনে নিয়ে তাতে বসে পড়ল।

'আমাদের ঠিক এমনই সামোভার, টুলগুলোও এই রকমই...

আমার চাচা সেগুলো বানিয়েছিলেন। সকলেই যুদ্ধে চলে যান, ফিরে আসেন কেবল আমার আব্বা...'

ওর শেষ কথাগুলো উপাই আপার কানে গেল না। তার হাতের স্থির মুঠিতে চেপে ধরা ছিল একটা ফোটো। ফোটোতে হাসছে এক অল্পবয়সী সৈনিক। ওপরে রুশ ভাষায় লেখা ছিল: 'ফ্রণ্ট থেকে শুভেচ্ছা! ১৯৪৪ সন।'

'আপা!.. আপা!..'

স্মৃতিচারণ থেকে বুড়ির চমক ভাঙল, সে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। সৈনিক দড়িতে ঝোলানো পোশাক স্পর্শ করল।

'আপা, আমি বরং যাই...'

উপাই আপা শরীরটা সোজা করে নিল, শান্ত দৃষ্টিতে সৈনিকের দিকে তাকাল, তারপর তার দিকে এগিয়ে গিয়ে হাত থেকে ফৌজী শার্টটা নিয়ে নিল।

'এই অন্ধকারে যাবি কোথায়?'

শার্টটা আগের জায়গায় ঝুলিয়ে রেখে সে সিন্দুক থেকে একটা সাদা শার্ট বার করল, হতভম্ব সৈনিকের হাতে সেটা গুঁজে দিল। সে কিছুই না বুঝতে পেরে কাঁধ ঝাঁকাল, শার্ট গায়ে দিল, সবগুলো বোতাম আঁটল।

'আপা, আমার কিন্তু যাওয়া দরকার...'

উপাই আপা অসন্তুষ্ট হয়ে তার দিকে তাকাল।

'সকাল নাগাদ তোর শার্ট শুকিয়ে যাবে...'

সৈনিক সিগারেট ধরাল, উনুনের সামনে বসে পড়ল। বুড়ি পোঁটলার বাঁধন খুলতে লাগল।

'আপনাকে এখানে একা ফেলে রেখে গেছে কেন?..' সৈনিক জিজ্ঞেস করল। 'বাড়ি ভাঙাচোরা, ধসে পড়ে যেতে পারে...'

বুড়ি অবসন্নভাবে সিন্দুকের পাশে ধপ করে বসে পড়ল। দড়িতে টাঙানো পোশাক থেকে বিন্দু বিন্দু জল ঝরছে; মনে হচ্ছিল যেন প্রতিটি বিন্দু মাটিতে লেপা মেঝের ওপর পড়ে আঘাত করতে করতে

সময়ের হিসাব করে চলছিল। বুড়ি উঠে দাঁড়াল, হাত দিয়ে ফৌজী শার্ট স্পর্শ করল।

'বাছা, আমার মতোই কোন এক মা তোর জন্ম দিয়েছে,' সে মৃদু স্বরে বলল। 'আমিও তোর মা। চা খা, শরীর গরম কর...' এই বলে বুড়ি টেবিলের ধারে কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সে চা ভেজানোর আয়োজন করছিল, কিন্তু চা খুঁজে পেল না। চীনেমাটির টি-পট হাতে নিয়ে সে এবয়াম ওবয়াম, একৌটো সেকৌটো হাতড়াতে লাগল। 'চা গেল কোথায়?'

সৈনিক চটপট তার নিজের থলের বাঁধন খুলে ফেলল, সেখান থেকে প্রথমে বার করল এক প্যাকেট চা, তারপর একটা রুমাল। বুড়ির দিকে তাকাল। কিন্তু কী যেন ভেবে রুমালটা আবার থলেতে পুরে ফেলল।

'আপা,' চা তার দিকে এগিয়ে দিয়ে সে চেঁচিয়ে বলল, 'এই যে নিন...' বুড়ির মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সৈনিক চীনেমাটির টি-পট নিয়ে সুগন্ধী কড়া চা ভেজাল।

উনুনের আগুন নিভে গেছে। প্রদীপটা এক কোণে থেকে ঘরে স্নিগ্ধ আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে। উপাই আপা খোলা সিন্দুকের সামনে মেঝের ওপর বসে ছিল; উল্টো দিকে, দেয়ালের ধারে ক্লান্ত সৈনিক ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মধুর স্বপ্ন দেখছে।

উপাই আপা নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল, দড়ি থেকে ফৌজী শার্টটা তুলে নিয়ে নিরীক্ষণ করে দেখল। একটা বোতাম কোন রকমে ঝুলে আছে। বোতামটা সেলাই করার আগে বুড়ি আদর করে শার্টটার গায়ে হাত বুলাল, কেবল তারপরই ছুঁচ ধরল। সেলাই শেষ হতে ফোটোটা নিয়ে ছুঁচ বিঁধিয়ে দেয়ালে আঁটল, অনেকক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল তারুণ্যদীপ্ত কচি মুখটা।

ঘরে বাজছে তেমির কোমুজের সুর। শোনা যাচ্ছে কিশোর কণ্ঠের হাসি, কচি কণ্ঠের খুশির রেশ। বুড়ি মা'র মনে হচ্ছে দরজা খুলে

গেল, ওপারে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে তার ছেলে। সে শুনতে পেল তার খুশিভরা সুরেলা কণ্ঠস্বর, কিন্তু কাছে নয়, মনে হল যেন দূর পাহাড়ের প্রতিধ্বনি।

'মা, তুমি সেই আগের মতোই, কেবল সেলাই আর সেলাই। মাঝরাত গড়িয়ে গেছে, বিশ্রাম করলে ত পার...'

'শার্ট সেলাই করছি বাছা,' কণ্ঠস্বর তার শান্ত। 'তোর জন্যে সেলাই করছি।'

'...মনে আছে?' ছেলের কণ্ঠস্বর এখন উনুনের ধারে, সেখানে সে টুলের ওপর বসে খসখস করে বইয়ের পাতা উল্‌টে যাচ্ছে। 'মনে আছে মা, আমি তোমাকে ইনস্টিটিউটের গল্প বলতাম?..'

'মনে আছে...'

পাহাড়ের পেছন থেকে চাঁদ উঁকি মারল, বৃষ্টি-বাদলা থেমে গেছে। নিশ্চিন্ত নিদ্রায় মগ্ন স্তেপের ওপর, দূর পাহাড়পর্বতের মাথার ওপর, গাঁয়ের ওপর, বেগবতী স্রোতস্বিনীর ওপর শোনা যাচ্ছে মা আর ছেলের কণ্ঠস্বর।

'আর মনে আছে, আমি কত অপেক্ষাই না করে থাকতাম কখন বসন্ত আসবে, কখন পাহাড় থেকে বরফ নেমে যাবে, অপেক্ষা করতাম কখন মাঠে সবুজ রং ধরবে, ফুল ফুটবে?'

'তারপর?'

'তারপর যুদ্ধ শুরু হল...'

'তারপর থেকে বহু জল গড়াল। আমি তোরই কথা ভাবি, পথ চেয়ে বসে থাকি...'

'হ্যাঁ, বহু বছর কেটে গেল। আচ্ছা, হঠাৎ যদি আমি মাঝরাতে এসে হাজির হই, এই আস্‌কারের মতো, তুমি কি আমাকে চিনতে পারবে?'

'হয়ত চিনতে পারব, আবার নাও পারতে পারি। সবই আগের মতো শান্ত, ধীরস্থির। পাহাড়... নদী... স্তেপ... এই গাঁ... এ সবই তোর।'

বাতি নিভে গেল। ঘর অন্ধকার।

বুড়ি সিন্দুকের গায়ে হেলান দিয়ে ঘুমুচ্ছিল।

পাহাড়ের ওপাশ থেকে সূর্য উঠল। দূরের চূড়াগুলোতে লাল আভা ছড়িয়ে পড়ল। শিশিরবিন্দু ঝলমল করতে লাগল।

ঠক করে একটা আওয়াজ হল। কাঠের আগলটা মাটিতে পড়ে গেল।

সৈনিক জেগে উঠল, চোখ রগড়ে অবাক হয়ে ঘরের চারদিকে দৃষ্টি বুলাল। ঘরে বুড়ি নেই। সৈনিক বেরিয়ে উঠোনে এলো, দরদভরা সূর্যকিরণের দিকে মুখটা বাড়িয়ে দিল, হাসিতে ভরে উঠল তার মুখ। পথের ওপর দিয়ে ঘর্ঘর আওয়াজ তুলে ঘোড়ার গাড়ি চলেছে পাহাড়ের দিকে। সৈনিকের মনে পড়ে গেল, বাড়িতে তার জন্য অপেক্ষা করছে, সঙ্গে সঙ্গে ক্ষ্যাপার মতো সে ঘরের ভেতরে ছুটে গেল, মালপত্রের থলে আর গায়ের ওভারকোটটা তুলে নিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে এলো উঠোনে:

'আপা, আপা কোথায় গেলেন?'

জবাব মিলল না। সৈনিক চালাঘরে ছুটে গেল, তারপর রাস্তায়, কিন্তু কোথাও বুড়ির দেখা নেই...

এই সময় সে বসে ছিল নদীর ধারে, আবার ডুবে গিয়েছিল তার নিরানন্দ ভাবনায়। শেষকালে সে উঠল, বালতিতে জল ভরে নিয়ে গাঁয়ের উদ্দেশে পা চালাল। দেখা হতেই গুলাইম ঝঙ্কার দিয়ে উঠল:

'উপাই আপা! এখনও গোছগাছ করেন নি কেন? শিগ্‌গিরই আপনাকে নিতে আসবে!' বুড়ির দিকে কোন মনোযোগ না দিয়ে সে তড়বড় করে জিনিসপত্র গোছাতে লেগে গেল।

উপাই আপা হঠাৎ গুলাইমের দিকে ছুটে গেল, তার হাত থেকে কেটলি কেড়ে নিয়ে চিৎকার করে বলল:

'ধরবি না বলছি! তোরা চলে যা, আমি যাব না! একা মানুষ এই বুড়িকে নিয়ে কার কী কাজ শুনি?'

পড়শী মহিলা হকচকিয়ে গিয়ে কেবল বলল:

'তোমার হল কী আপা?..'

উপাই আপা উঠোনে বেরিয়ে এসে ধীরে ধীরে টিলার মুখে পা বাড়াল...

টিলার ওপর বসে থাকতে থাকতে উপাই আপা যখন মাথা তুলল ততক্ষণে সূর্য পাহাড়ের মাথার অনেক ওপরে উঠে গেছে। নিস্তব্ধতা। চারদিকে যেন থমথমে ভাব: না আছে কোন জনপ্রাণী, না কোন সাড়াশব্দ।

সে যখন বাড়িতে ফিরল তখন বাড়িটা তার কাছে পোড়ো আর আঁধার-আঁধার মনে হতে লাগল। বুড়ি ঘরের ভেতরে উঁকি মারল, তারপর চালাঘরে। একটা নিঃসঙ্গতা ও খালি-খালি ভাব তাকে আরও বেশি করে পেয়ে বসল। সে তাড়াতাড়ি দেউড়ির বাইরে বেরিয়ে এলো, আশেপাশের উঠোনগুলো তাকিয়ে দেখল। সেগুলো পরিত্যক্ত, তাদের দরজা-জানলা আঁটা।

কোথাও জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই...

* * *

টিলার ওপার থেকে ঘোড়ার গাড়ি দেখা গেল। গাড়িটা ধীরগতিতে উপত্যকামুখী পথ বেয়ে চলেছে। চাকার ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজের তালে তালে মাপা পা ফেলে চলেছে ঘোড়া দুটি। বুড়ো গাড়োয়ান ঢুলছিল, তার পেছনে বসে বসে সৈনিক ধূমপান করছিল আর আপনমনে কী যেন ভাবছিল।

'তার মানে তুমি জার তাশ থেকে?' ঘোড়াগুলোকে 'হট্ হট্' করে তাড়া দিতে দিতে ইতিমধ্যে বেশ কয়েকবার গাড়োয়ান জিজ্ঞেস করল। সৈনিক কোন উত্তর দিল না, সে থলে খুলে ফুলের ছাপমারা রুমাল বার করল।

'তা আস্কার,' গাড়োয়ান আবার কথা শুরু করল, 'ছুটি শেষ হয়ে যেতে মনও বুঝি খারাপ হয়ে গেল?'

এবারেও কোন উত্তর নেই। গাড়োয়ানের বিড়ি নিভে গেছে।

'আগুনটা একটু দাও দেখি,' সে সৈনিককে বলল।

উত্তর না পেয়ে পিছু ফিরে তাকাতে দেখতে পেল, গাড়ি ফাঁকা। খানিকটা দূরে ফাঁকা ফাঁকা গাছপালার মাঝখানে একটা ছোট গাঁ দেখা যাচ্ছিল। রাস্তার ধার দিয়ে সৈনিককে সেই দিকে যেতে দেখা গেল...

সে সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ, নির্জন রাস্তা ধরে, পরিত্যক্ত ঘরবাড়ির পাশ কাটিয়ে চলল। এই ত উপাই আপার বাড়ি। সৈনিক এদিক ওদিক তাকাল। কেউ নেই। সে ঘরে প্রবেশ করল, ঘর খালি। সৈনিক জানলার দিকে এগিয়ে গেল, জানলার ধারে ফুলের ছাপমারা রুমালটা রাখল, খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বেরিয়ে গেল। রুমাল জানলার ধারেই রয়ে গেল...
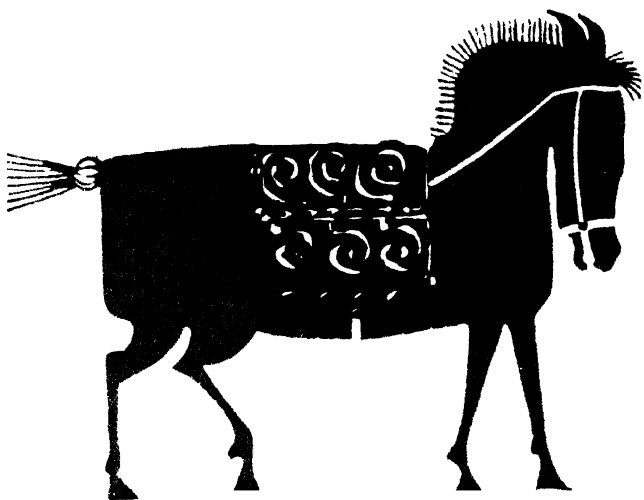
কাসিম কাইমভ

বিশ বছর পরে...

মাইমাক রেল স্টেশন কি আপনারা জানেন? জানেন না? স্টেশনটার নামের অর্থ ভাষান্তরে দাঁড়ায় ভাল্লুকের বাঁকা পায়ের চলন। মনে পড়ল? পড়ল না? অথচ আপনাদের জানা উচিত ছিল, তুর্কিস্তান-সাইবেরীয় রেলপথের ওপর দিয়ে এখানে আসার সময় সে জায়গাটা নিশ্চয়ই পেরিয়ে এসেছেন। অবশ্য ভুলে যাওয়াটা বিচিত্র নয়।

মাইমাক হল মধ্য এশিয়ার একরত্তি রেল স্টেশন, কির্গিজিয়ার কারা-তোও আর কাজাখস্তানের কারা-তাও পাহাড়ের মাঝখানে এর অবস্থান—এর পাশ দিয়ে কুর্কুরেউ নামে যে উত্তাল ছোট নদীটা বয়ে গেছে তার কথা না ধরলে এর লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য কিছু নেই।

হালে আমাদের জন্মভূমির যে কোন একটা জায়গা দর্শনকে অনেকেই ঘটা করে আখ্যা দিয়ে থাকেন জীবনের গভীর অধ্যয়ন, আমাদের বাস্তব জীবনের মর্মোদ্ধার, তার সঙ্গে সংযোগসাধন। এ নিয়ে তর্ক করব না। আমাদের নতুন জীবনযাত্রা যাঁরা জানতে চান তাঁদের

প্রত্যেকের কাছেই এ ধরনের অনুসন্ধানের অবশ্যই প্রয়োজন আছে। তাঁরা ঠিকই করেন, নয়ত আগেকার দিনে আমাদের কেউ কেউ কামরার জানলার পাশ দিয়ে যে সব ছোট ছোট স্টেশন চলে যাচ্ছে সেগুলো ত খেয়াল করতেনই না, এমন কি সে সব গাঁয়েরও জীবনযাত্রা অনুসন্ধানের চেষ্টা করতেন না, যেখানে বিশেষ করে সে কাজেই সরকার থেকে তাঁদের পাঠানো হত। এ ধরনের কাজের অভিজ্ঞতা পর্যন্ত অনেকের ছিল না, কীভাবে কাজটা শুরু করতে হয় তা-ও জানা ছিল না।

ফ্রুঞ্জে—মস্কো ট্রেন যখন মাইমাক স্টেশনে আধ মিনিটের জন্য থামল তখন প্রথম শ্রেণীর কামরা থেকে ধীরেসুস্থে বেরিয়ে এলো ভারিক্কি চেহারার এক যুবক, তার মুখে হালকা গোলাপী আভার চেকনাই। আগন্তুকের হাতের বিশাল পোর্টফোলিও, পোর্টফোলিওর সঙ্গে বাঁধা চওড়া বেল্টের চোখ ধাঁধানো সাদা বকলস চোখে পড়ার মতো। ওঃ, কি শাঁসাল, মর্যাদাব্যঞ্জক জমকাল পোর্টফোলিও! যা-ই বল না কেন যে কোন বড় দোকানে আপনি ইচ্ছে করলেই এমন ফাঁপা ঢাউস চীজ পারেন না।

সর্বাঙ্গে স্বাস্থ্য ফেটে পড়া এই যুবকটি—আপাতত তাকে এই নামেই উল্লেখ করা যাক--যেভাবে ধীরে ধীরে চলছে ও ভারিক্কি চালে তাকাচ্ছে—না, ঠিক তাকাচ্ছে না—সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে—তা থেকে সহজেই আন্দাজ করা যায় যে বয়স অল্প হলেও এই ভদ্রলোকটি বেশ অভিজ্ঞ, দায়িত্বশীল, গেজেটেড অফিসার। লক্ষ্য করে দেখুন—চালচলনে বিন্দুমাত্র বাহুল্য নেই। আত্মমর্যাদা ও বিনয়ে পরিপূর্ণ ভাবভঙ্গি এমনই এক মানুষের, যে সমাজে কীভাবে চলতে হয় তা জানে। ছোট স্টেশনের ঘরে সে ঢুকল না, তার দিকে তাকাল না পর্যন্ত, প্ল্যাটফর্মের মাঝামাঝি জায়গায় এগিয়ে গিয়ে সেখানে দাঁড়াল, দাঁড়িয়ে রইল নিজের ভবিষ্যৎ স্মৃতিমূর্তির ভঙ্গিতে নিশ্চল হয়ে, মাথাটা এক পাশে হেলিয়ে, যেমন করে থাকে টেলিগ্রাফের খুঁটির ওপর সমাসীন পরিতৃপ্ত বাজপাখি।

দেখে মনে হতে পারে যে এই জমকাল পুরুষটি নেহাৎই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিশ্রাম করছে, মুহূর্তের শান্তি ও তাজা বাতাস উপভোগ করছে। আসলে কিন্তু তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে প্রতিনিধিদলের আসার কথা ছিল, তাদের এবং কৌতূহলী জনতার ভিড় দেখতে না পেয়ে সে বুঝে উঠতে পারছিল না কী করা যায়।

কেউই নেই। অঙ্গভঙ্গিতে, মুখভঙ্গিতেও আক্ষেপের কোন ভাব প্রকাশ না করে সে ধৈর্য ধরে প্রতীক্ষা করতে লাগল। কিন্তু সহ্যের এবং আশারও একটা সীমা আছে। যুবকেরও ভরাট গাল উত্তেজনায় একটু একটু কাঁপতে শুরু করল, মাথাটাও ছটফট করে ঘুরতে লাগল, মাংসপেশীর খিঁচুনির ফলে হাতের আঙুলগুলো শক্ত ও আলগা হতে হতে আধপোড়া ধামসানো সিগারেটটা খসে পড়ে গেল। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল যে এই মিনিট খানেক আগেও যে ভদ্রলোকটি এমন শান্ত ও আত্মবিশ্বাসী ছিলেন, তিনি রাগে ফেটে পড়লেন বলে।

কিন্তু সুশিক্ষা আর আত্মসংযমের কী অপার মহিমা! এই ত আবার দিব্যি নির্বিকার ভাব। উদ্বেগ-উত্তেজনা জয় করে নিয়ে, পকেটে হাত পুরে, কাঁধ দুটো সামান্য উঠিয়ে সে ধৈর্য ধরে প্ল্যাটফর্মের ওপর পা ফেলে এগিয়ে গেল।

যে কেউ এই মূর্তিটার দিকে তাকালে লজ্জা পাবে সেই সব লোকের কথা ভেবে, যারা এমন মানুষকে দাঁড় করিয়ে রেখে তার মহা মূল্যবান সময় নষ্ট করে।

আপনারা হয়ত এতক্ষণে অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছেন, জানতে চান কে এই লোকটি। ইনি হলেন সহকারী মন্ত্রী... রাকিম অতরোভিচ্ ওরমকোয়েভ্।

হতে পারে, আপনারা কেবল তাঁকে দেখেনই নি, তাঁর বক্তৃতাও শুনেছেন, যে বক্তৃতা সব সময়ই তার আঙ্গিকে ধারাল, পরিমিত, আশ্চর্য রকম প্রত্যয়জনক, সারগর্ভ।

রাকিম অতরোভিচ্ বাহ্যত যেমন ভারিক্কি ও গম্ভীর, তার স্বভাবটাও তেমনি চেহারার সম্পূর্ণ উপযোগী। তবে চট করে

সিদ্ধান্ত করে বসবেন না। এখন যে সে উত্তেজিত হয়ে পড়ছে তার মানে মোটেই এমন নয় যে সে বদরাগী, রগচটা ধরনের মানুষ। না তা নয়। তার মতো অবস্থায় পড়লে আপনি নিজেও সম্ভবত শান্ত থাকতে পারতেন না।

অমুক সময়, অমুক গাড়িতে, অমুক কামরায় থাকবে এই মর্মে সে গ্রাম সোভিয়েতে এবং তার বন্ধু কাদিরকেও টেলিগ্রাফে সংবাদ জানিয়ে দিয়েছে।

অদ্ভুত ব্যাপার, তার নিজের গাঁয়ের লোকেরা তাকে কেন নিতে এলো না কে জানে? নিতে এলো না দেশের সেই লোকটিকে যে তাদের চোখের সামনে মানুষ হয়ে উঠেছে অনাথ ভবনে—বোঝ কাণ্ড!—হয়ে উঠেছে কিনা সহকারী মন্ত্রী! তার সমবয়সীরা তাকে আজ বিশ বছর হল দেখে নি। তারাও কিনা এলো না। এমন ঔদাসীন্যের কারণ বোঝা ভার...

আচ্ছা, তা-ই না হয় হল। কিন্তু তার ছেলেবেলার বন্ধু কাদিরেরও কিনা সাধ্যে কুলাল না যৌথখামার থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরের স্টেশনে আসার: ওঃ, এই গেঁইয়ারা কি আর কোন অভ্যর্থনার আয়োজন করতে পারে? খোলাখুলি সে কথা স্বীকার করলেই ত হয়, আগে থেকে জানিয়ে দাও। লোককে বেকায়দায় ফেলা কেন বাপু?

রাকিম অতরোভিচ্ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল: নিজের জন্ম-গাঁয়ের যৌথখামারে পেঁছুবে কী করে? পথে কোন গাড়ি ধরে? যেতে হবে কিনা স্টেশনে পশম বওয়ার লরিতে, কিংবা গোটা তল্লাট জুড়ে দুধের বড় বড় শূন্য কেঁড়ের ঠনঠন আওয়াজ তুলে যে ছ্যাকড়া গাড়িগুলো চলে তারই একটাতে চেপে ঐ কেঁড়েগুলো ধরে ঝাঁকুনি খেতে খেতে? পথে যারা দেখবে তারা চিনতে পেয়ে হাসবে, এমন চোখা চোখা বাক্যবাণ ছাড়তে পারে যা চিরকালের জন্য লেগে থাকবে।

স্টেশনে কয়েক ঘণ্টা বসে থেকে আবার ফিরে যাওয়া? নিজের যে গ্রামটির জন্য এক সময় তার মন কেমন করত, যাকে দেখা তার

বহুকালের স্বপ্ন ছিল তাকে না দেখে, নিজের বাড়ির চৌকাট থেকে ফিরে যাওয়া? না, তা হয় না।

এইভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী করা যায় স্থির করতে গিয়ে যখন তার অসহ্য ঠেকছিল, ঠিক এমন সময় পাহাড়ে একটা ক্রুদ্ধ গর্জন শোনা গেল। কারা-তোওর বজ্রকণ্ঠ প্রতিধ্বনি সেই আওয়াজ লুফে নিল, দশগুণ গর্জন তুলে গমগম শব্দে গিরিখাতের এক খাড়া পাড় থেকে অন্য পাড়ে গড়িয়ে পড়তে পড়তে দূরে মিলিয়ে গেল। রাকিম অতরোভিচ্ ভেবাচেকা খেয়ে পেছন দিকে তাকাল: পাহাড়ের ঢালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এক গাধা পরমানন্দে চেঁচাচ্ছে। গাধা যেন তুরী ভেরী বাজিয়ে গাঁকগাঁক আওয়াজ তুলে বিশ্বসুদ্ধ সকলকে জানাচ্ছে তার কোন এক আনন্দের বারতা।

আশ্চর্য! হাঁকডাকরত এই গাধাটি আমাদের পর্যটকের পরিচিত ও মধুর বলে মনে হল, যেন সে চেঁচিয়ে তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। হ্যাঁ, আজ থেকে বিশ বছর আগে, যখন সে পড়াশুনা করার জন্য ঠিক এই স্টেশন থেকেই বাইরে যাত্রা করে, তখন এই পাহাড়ে যে অসংখ্য গাধার পাল চরে বেড়াত তারা তাকে বিদায় জানায়, ভয়ঙ্কর হাঁকডাক তুলে বিদায় জানায় স্কুলে পড়া এক ছেলেকে; বসন্তের নেশায় উন্মত্ত তাদের সেই গর্জন আর সহজে থামে না আর তারই সঙ্গে সঙ্গে অবিশ্রান্তভাবে তার পুনরাবৃত্তি করে চলে প্রতিধ্বনি—যেন গোটা তল্লাট জুড়ে এই খবরটাই চাওড় করে যে ছোট্ট রাকিম তার জন্মভূমি ছেড়ে চলেছে এক বিশাল ও আকর্ষণীয় জগতে। ঐ একই জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এখন গর্জন করছে যদিও মাত্র একটি গাধা, তবু তার গর্জনে এই প্রভাবব্যঞ্জক পুরুষটির মনে পড়ে গেল সেই দিনটির কথা যখন একেবারে ছোটবেলায় সে জন্মভূমির কাছ থেকে বিদায় নেয়... অতীতের এই ছবিটি রাকিম অতরোভিচের কল্পনায় কী উজ্জ্বল হয়েই না দেখা দিল... বুকের মধ্যে কী উষ্ণ আমেজই না অনুভব করা গেল!.. এমন কি এই নিঃসঙ্গ গাধাটা তার কাছে আদরের বলে মনে হল...

এই রকম ভাবপ্রবণতায় নিজেকে আচ্ছন্ন হতে দেখে রাকিম অতরোভিচ্ অবাক হয়ে গেল:

"তা হলে কি গাধা ছাড়া আমার পরিচিত আর কারও দেখা এখানে মিলবে না?" বেদনাদায়ক প্রশ্নটি তাকে ভাবিত করে তুলল। জন্ম-গ্রামের সঙ্গে সম্পর্ক কি এমনই নৈরাশ্যজনকভাবে ছিন্ন হয়ে গেল? আজ থেকে বিশ বছর আগে এখানে ছিল তার বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, চেনাপরিচিত লোকজন। এটা ঠিক যে সে দিনের ছেলেরা আজ হয়েছে তারই মতো নওজোয়ান; নওজোয়ানরা এখন হয়েছে ভারিক্কি মরদ, আর আগে যারা ছিল মরদ তারা হয়েছে সাদা দাড়িওয়ালা মোড়ল। প্রথম দৃষ্টিতে ওদের সে চিনতে পারবে কী করে? অথচ গাধা একটুও বদলায় নি। তবে আগে তারা ছিল সংখ্যায় অনেক, আর এখন এখানে রয়ে গেছে কেবল একটি। বহুকাল হল গাধার পালের জায়গা নিয়েছে গাড়ি। সবই বহমান স্রোতের মতো, সব বদলায়।

অপমানিত হওয়ার জ্বালায় প্রথম প্রথম রাকিম অতরোভিচ্ তার চারপাশের নতুনকিছুই লক্ষ্য করতে পারে নি, কিন্তু এখন তার এত বছরের অনুপস্থিতিতে স্টেশনে যে সব পরিবর্তন ঘটেছে তা হঠাৎই সে লক্ষ্য করতে লাগল।

স্টেশন ঘরের চারপাশে মাটিতে লেপা কুঁড়ে ঘরের জায়গায় দেখা দিয়েছে রেলকর্মীদের জন্য ইঁটের তৈরী ছোট ছোট দালান কোঠা। সর্বত্র লাগানো হয়েছে গাছপালা...

নিঃসঙ্গ যাত্রীটি যখন কৌতূহলী হয়ে এই নতুন বাড়িগুলো দেখছিল তখন তার পাশ দিয়ে চলে গেল এক দশাসই চেহারার ছোকরা। ছোকরার দাড়ি নিখুঁত কামানো, মুখের ওপর ছোট একজোড়া গোঁফ, তার গায়ে আকারের সঙ্গে চমৎকার মাননসই কাজের নীলরঙা পোশাক। জোয়ান লোকটা তার কাঁধে অবলীলাক্রমে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল ভারী শাবল, যার আগাটা বাঁকা।

রাকিম অতরোভিচের অজানতেই তার মন অধিকার করে বসল

এক ভাবগভীর প্রশ্ন: "কে হাত দিয়ে এইভাবে শাবল বাঁকাতে পারে? এই যুবকটি? তারই মতো মহাকায় আরও কেউ? কী অপরিসীম শক্তিই না তা হলে থাকতে পারে এই ছোকরাটির?" কৌতূহলী বালকের মতো ওরমকোয়েভ্ নিজের অজানতেই মহাকায়ের পিছু পিছু চলল, কিন্তু সে লোকটা গাঁয়ের দিকে বাঁক নিয়ে কাঁচ সবুজ গাছপালার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। রাকিম অতরোভিচ্ কেবল তখনই লক্ষ্য করল যে স্টেশনের কাছে, ছোট নদীটার ধারে গড়ে উঠেছে এক নতুন পল্লী। বাঃ, কী সুন্দর, পরিচ্ছন্ন, প্রাণোচ্ছল পল্লী! বিস্ময়ে, সামান্য হলেও রাকিম অতরোভিচের মুখ হাঁ হয়ে গেল। এ গাঁটা কবে গড়ে উঠল? এখানে স্কুলই বা কবে বানানো হল? কবে গড়ে উঠল বাগবাগিচা? সব নতুন! হয়ত বা কারা-তোও পাহাড়ও বদলে গেছে?

সে পেছন ফিরে তাকাল, গলা বাড়িয়ে আশেপাশের অঞ্চল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল: আগের মতোই খাড়া ঢাল, ঘাসে ভর্তি, পাহাড়ের চুড়োগুলোও সেই একই। না, কারা-তোও বদলায় নি, তবে তার ঢালে এখন গাধার বদলে চরে বেড়াচ্ছে গোরু, ভেড়া, ঘোড়া আর উটের পাল। ওর দুঃখ হতে লাগল নিঃসঙ্গ গাধাটার জন্য—যেন যাদুঘরের প্রদর্শনীর কোন উপকরণ দৈবাৎ কেউ ভুলক্রমে ফেলে গেছে, এ যেন তার অতীতের এক হাস্যকর প্রাচীন নিদর্শন।

হ্যাঁ, জন্মভূমির পরিবর্তন ঘটেছে, গাঁয়ের লোকজনও হয়ত পালটে গেছে। জন্মভূমির জীবনযাত্রায় যে বিকাশ ও রূপান্তর ঘটে গেছে, এর আগে পর্যন্ত সে সম্পর্কে রাকিম অতরোভিচের তেমন স্পষ্ট কোন ধারণা ছিল না। আগে কি এ সব তার চোখে পড়েছে? অবশ্যই পড়েছে। কিন্তু সে যখন সরকারী কাজ নিয়ে অজানা অঞ্চলে ও যৌথখামারে গেছে তখন তার জানা ছিল না আগে সেগুলো কেমন ছিল, তাই তাদের অতীত ও বর্তমানের তুলনা করা তার পক্ষে সম্ভব হয় নি। মনে হত ঐ সব জায়গা বোধহয় চিরকাল ও রকমই ছিল। অতীত সম্পর্কে অজ্ঞতা--আশঙ্কা হয়, এ শুধু ওরমকোয়েভের

একার ত্রুটি নয়, আরও কিছু অল্পবয়সী দায়িত্বপূর্ণ কর্মীরও।

এখন সে তার নিজের গ্রামবাসীদের সঙ্গে নতুন করে সম্পর্ক পাতানোর উদ্দেশ্যে, এবং তাদের নতুন জীবনযাত্রা সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে চলেছে নিজের জন্ম-গাঁয়ে।

সে এসে পেঁছুল। একটা চিন্তাই তাকে রীতিমতো অবাক করে দিচ্ছে। অনুসন্ধানকারীটি স্টেশনে থাকতে থাকতেই টের পেল যে তার জন্মভূমির রূপান্তর ঘটেছে, তাকে এখন আর চেনার জো নেই। এ সবই ভালো, বোধগম্যও বটে, কিন্তু কেন কে জানে সঙ্গে সঙ্গে যে ভাবনা তাকে পীড়িত করতে লাগল তা এই যে জনসাধারণের কল্যাণের জন্য আজ বেশ কয়েক বছর হল যে শ্রম সে ব্যয় করে আসছে, এখানে সে তার চিহ্নমাত্র খুঁজে পাবে না।

যে কর্মী মনে মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে যে সে জনগণের কাজে মনেপ্রাণে নিজেকে সমর্পণ করেছে এবং সমাজের জীবনে বিরাট, মহামূল্য অবদান রাখছে, তার পক্ষে এমন প্রশ্ন সম্পূর্ণ নিয়মসঙ্গত। ছোট স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে একা পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকতে থাকতে এই লোকটি ছিদ্রান্বেষীর দৃষ্টিতে মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করল: আচ্ছা, বলতে গেলে সে, এই ওরমকোয়েভ্ তার পারিপার্শ্বিক জীবনের জন্য, তার জন্ম-গাঁয়ের জন্য কী কাজটা করেছে?

জন্মভূমির কল্যাণের জন্য রাকিম অতরোভিচ্ নিজের কাজের যে সময় ব্যয় করেছেন তার ফলাফল নির্ণয়ের ব্যাপারে আমরা, মানে আমি এবং আমার প্রিয় পাঠক—তুমি, কেউই তাকে ঘাঁটাতে যাব না। আমরা যদি ভুল না করে থাকি তা হলে একটা জিনিস অবশ্যই আন্দাজ করা যায়: ফলাফল নির্ণয় করতে গিয়ে সে আবিষ্কার করল যে আজ অবধি জীবনযাত্রার তত্ত্বানুসন্ধান বিষয়ে কাজ করার পর সামান্য ভ্রমণ, স্বাস্থ্যোদ্ধার কেন্দ্রে বিশ্রাম এবং পরিশেষে কর্মক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যে ডাক্তারের পরামর্শমতো যথাসময়ে পরিমিত আহার— এ সবকেই সে নিজের প্রাপ্য বলে গণ্য করে এসেছিল।

না, আমি, তুমি— আমরা এই রাশভারী যুবক কর্মকর্তাটির সমস্ত

রকম ভাবনাচিন্তা ঠিক ঠিক প্রকাশ করতে পারব না। সেগুলো বড়ই জটিল। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে সে সম্পূর্ণ আন্তরিকভাবেই নিজেকে জনসাধারণের পুরোপুরি আজ্ঞাধীন বলে বিবেচনা করত -- তার চেয়েও বড় কথা এই যে নিজেকে সে জনগণের সম্পত্তি বলে গণ্য করত। কিন্তু আমরা জানি যে নিজের ভাবনাচিন্তার শেষে এক লিরিকধর্মী বিষণ্ণ মনোভাব তাকে পেয়ে বসে। কেন তার শ্রম জনগণের জীবনে নিজস্ব কোন চিহ্ন রাখতে পারল না, অন্তত লোকপ্রবচনে যাকে বলে বালির ওপর পাখির পায়ের ছাপ -- তা-ও রাখতে পারল না, একথা ভেবে সে বিষণ্ণ বোধ করছিল। মনটা বেজায় খারাপ হয়ে যাওয়ায় সে এই বলে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে লাগল যে অন্যান্য অঞ্চলের লোকেরা তার কাজের সঙ্গে পরিচিত। রাকিম অতরোভিচ্ এই ভেবে আত্মতৃপ্তি বোধ করল যে বহু অঞ্চলে সে মরসুমী কাজের ধারা যাচাই করেছে এবং একাধিকবার যৌথখামারের সভাপতিদের কাছে নিমন্ত্রিত হয়ে ঐতিহ্যগত সম্মানের নিদর্শনস্বরূপ ভেড়ার মাথায় আপ্যায়িত হয়েছে।

আমরা বুঝতে পারি না, কেন ঠিক এখনই, জন্মস্থানের স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে এই স্মৃতিচারণে রাকিম অতরোভিচ্ দুঃখ অনুভব করছে, বিষণ্ণ হয়ে মাথা নীচু করছে।

রাকিম অতরোভিচের সাফাই আমরা গাইতে পারি -- কাজের জায়গায় যে যে সভায় থাকা কর্তব্য তার একটিও সে বাদ দেয় নি, নিজের বিভাগে সে নিখুঁতভাবে নিজের সমস্ত দায়িত্ব পালন করত আর জরুরী কাজ সংক্রান্ত কাগজপত্র সে চিরকালই যথাসময়ে সই করে জায়গামতো পাঠিয়ে দিত।

এমন সময় কে যেন তার কাঁধে চাপড় মেরে সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল:

'এই যে! এসে গেছিস তা হলে!'

রাকিম অতরোভিচ্ রাগে জ্বলে উঠল, চট করে লোকটার দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

'এ কি বেহায়াপনা! আপনি লোক ভুল করেছেন! কী চাই আপনার?'

'মাফ করবেন!' মাঝারি আকারের গাঁট্টাগোঁট্টা যে যুবকটি এগিয়ে এসেছিল তার চোখ দুটো কুতকুতে, গাল দুটো লাল টকটকে। সে এবারে বিভ্রান্ত হয়ে পিছু হটে গেল। 'মাফ করবেন,' সে আবার বলল, 'আমি ভেবেছিলাম আপনি বুঝি রাকিম... রাকিম ওরমকোয়েভ্।'

'হ্যাঁ, তা ওরমকোয়েভ্ই ত.' 'বেহায়া' লোকটার কুতকুতে চোখজোড়া তার পরিচিত বলে মনে হল। 'তুই কাদির না?'

'হ্যাঁ!..' হাসতে হাসতে চেঁচিয়ে বলল 'বেহায়া'।

সাক্ষাৎকারে দুজনেই উত্তেজিত। তারা কোলাকুলি করল, গালে গাল ঠেকাল, তারপরই মুহূর্তের জন্য নিশ্চল। পরে ছেলেবেলার দুই বন্ধুতে একে অন্যকে প্রশ্নে প্রশ্নে জর্জরিত করে ফেলে:

'কেমন চলছে?'

'কেমন আছিস?'

'বাড়ির সকলে কেমন?'

'ছেলেমেয়েরা কেমন?'

'কাজকর্ম কেমন হচ্ছে?'

'পথে কেমন কাটল?'

'কেমন ছিলি?'

এই একশ গন্ডা 'কেমন'-এর উত্তর সঙ্গে সঙ্গে দেয় সাধ্য কার! এক নিশ্বাসে বিশ বছরের ছাড়াছাড়ির বিবরণ দাও এখন।

প্রশ্ন করার সময় তারা উত্তরের কোন তোয়াক্কা পর্যন্ত করছিল না এবং বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করে একে অন্যের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল আর তারা যে কত বদলে গেছে এই ভেবে অবাক হয়ে যাচ্ছিল। কোন এক সময় তারা দুজনেই ছিল রোগাটে, রোদে পোড়া বাচ্চা ছেলে, আর আজ? ওঃ সময়, সময় যে কোথা দিয়ে চলে যায়!.. রাকিম — ভারিক্কি চেহারার, হৃষ্টপুষ্ট, তার কোমল গাল দুটিতে

গোলাপী আভা, সে রাশভারী, গম্ভীর প্রকৃতির, যদিও যুবক। তার চাউনি মনোযোগী ও গভীর—কচি মুখের ওপর পক্কশ্মশ্রুধারী জ্ঞানবৃদ্ধের চাউনি। তীক্ষ্ন দৃষ্টি যেন অন্তর্ভেদী।

আর কাদির? গেঁয়ো মানুষ, লম্বায় চওড়ায় আগন্তুকটির চেয়ে কম যায় না, তবে তার আকৃতি থেকে বোঝা যায় তার মাংসপেশীর প্রবল শক্তি; মুখটা রয়ে গেছে সেই আগের মতোই--রোদে পোড়া, গাল দুটি লাল টকটকে, চোখজোড়া খুদে, আগের মতোই দুষ্টুমিতে ও ধূর্ততায় চকচক করছে।

এত বড় পদাধিকারী বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাতে কাদির উল্লাস ও গর্ব অনুভব করল। আর রাকিম যে-ছেলেবেলা আর কোন দিন ফিরবে না তার কথা মনে করে কাদিরের দেখা পেয়ে উল্লসিত হল।

'মাফ করিস ভাই, আমি দেরি করে ফেলেছি, দোকানে আটকে পড়েছিলাম,' সসম্ভ্রমে বলল বিব্রত কাদির।

"তা আর কী করা যাবে? হবেও বা, হয়ত সত্যি সত্যি ও দোকানে আটকে পড়েছিল," বন্ধু মনে মনে ওকে ক্ষমাঘেন্না করে দিল। "সময়নিষ্ঠার অভাব--সংস্কৃতির অভাব... সময় দ্রুত চলে যাচ্ছে, সবই বদলাচ্ছে, অথচ আমার সোনার চাঁদ কাদির দেখছি আগের মতোই সাদাসিধে রয়ে গেল।"

বিশ বছর বাদে জন্মভূমিতে আগত মানুষটিকে অনাড়ম্বর অভ্যর্থনা জানাতে আসে একমাত্র তার ছেলেবেলার বন্ধু। তা হোক গে! ওরমকোয়েভ চিরকালই সারল্যকে উঁচু পদের অধিকারী মানুষের পরম গুণ বলে মনে করত, তার কদর দিত, তাই বড় বেশি অনাড়ম্বর অভ্যর্থনায় সে ক্ষুণ্ন না হওয়ার চেষ্টা করল, তা সত্ত্বেও তার আশা ছিল যে তাকে নেওয়ার জন্য কোন মোটরগাড়ি পাঠানো হয়েছে আর কাদির হয়ত সেটাকে কাছে পিঠে কোথাও দাঁড় করিয়ে রেখেছে।

ওরা পল্লীর দিকে রওনা দিল... ওরমকোয়েভ্ জানতে পারল যে তার গাঁয়ের লোকেরা অধীর আগ্রহে সেখানে তার প্রতীক্ষা করছে। সে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কিন্তু কাদির একটা চত্বর থেকে টেনে আনল এক চকরাবকরা মরখুটে ঘোড়া। ঘোড়াটা কোন রকমে পা নাড়াচ্ছিল, অনিচ্ছা সত্ত্বেও লোম ওঠা লেজ নাচাচ্ছিল। রাকিম অতরোভিচ্ স্তম্ভিত হয়ে বন্ধুর দিকে তাকাল, বন্ধু কিন্তু নির্বিকারচিত্তে ঘোড়ার তলপেটে রংচটা জিনের বেল্ট কষে বাঁধতে লাগল।

"এই মরখুটেটার পিঠে আমাকে চেপে বসতে হবে নাকি?" সহকারী মন্ত্রীমশাই মনে মনে আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন।

তার যখন বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাওয়ার মতো অবস্থা ততক্ষণে তার বিপুল মন্ত্রীমার্কা পোর্টফোলিও আর পোঁটলা কাদিরের পুরোনো চটা ওঠা ঝুড়ির ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তা যাক গে, পোর্টফোলিওর পক্ষে জায়গাটা মন্দ নয়। কিন্তু যখন কাদির তাকে, রাকিম অতরোভিচ্কে এই গদিটার ওপর, এই মরখুটেটার পিঠে, রদ্দিমারা শেয়ালটার ওপর উঠে বসতে বলল, তখন সে এমনই ভেবাচেকা খেয়ে গেল যে কোন কথাই খুঁজে পেল না।

খুঁতখুঁতে শহুরে বাবুটির বিরক্তি লক্ষ্য না করে এবং তাকে প্রকৃতিস্থ হওয়ার কোন রকম অবসর না দিয়ে কাদির তাকে তুলে ধরে জিনের ওপর ছুঁড়ে দিল।

ওরমকোয়েভ্ পুরনো 'মস্কভিচ্' গাড়িতে চড়ে যাওয়া পর্যন্ত মর্যাদাহানিকর মনে করত, তাই তার ইচ্ছে হচ্ছিল এই ছোপধরা ঘোড়াটার পিঠ থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে, কিন্তু এমন সময় বুড়ো ঘোড়াটা সন্দেহজনকভাবে কান দুটো নাড়াল, আর অতর্কিতে তিড়িংবিড়িং করে সামনের দিকে ছুটল!

হঠাৎ সওয়ারের মনে হল কোন এক কালে এমন খোঁড়া ঘোড়ায় সে চেপেছে বটে। তবে কোথায় সেটা ঘটেছিল তা সে কিছুতেই মনে করতে পারল না।

কির্গিজীয় রীতিনীতি ওরমকোয়েভের ভালোমতোই জানা ছিল:

কোন লোককে যদি অপমান করতে না চাও, তা হলে তার ঘোড়াকে তাচ্ছিল্য করো না। নিজের মতামত প্রকাশে যার সংযমের বালাই নেই তাকে এখানকার লোকে বেআদব ও দেমাকি বলে ভাবে। অস্বস্তিকর অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া ছাড়া আর উপায় রইল না। সাক্ষাতের গোড়াতেই নিজের গাঁয়ের সাদাসিধে লোকটার মনে খারাপ ছাপ ফেলার এবং তার কাছ থেকে দেমাকি বদনাম কেনার ইচ্ছে তার আদৌ ছিল না।

"দুর্ভাগ্য আর কাকে বলে?" সে ভাবল। "মাইমাকে আমি এলাম কী করতে? জাম্বুলে থেকে গিয়ে এখানকার জেলা কমিটিকে কিংবা কার্যনির্বাহী কমিটিকে টেলিফোন করে গাড়ি পাঠানোর কথা বলা উচিত ছিল। আমাকে ওরা না করত না। এখন দেরি হয়ে গেছে-- ঝাঁকুনি খাও মরখুটের পিঠে বসে বসে," সে মনে মনে নিজেকে গালাগাল দিল।

দুপুর গড়িয়ে গেল। দুই যুবক অল্প অল্প ধুলো উড়িয়ে রাস্তা ধরে চলেছে। সওয়ারের মেজাজ খারাপ। সর্বাঙ্গে ফুটে উঠছে অসন্তোষ, যেভাবে সে চলেছে তাতে মনে হয় যেন জিনের ওপর ঝিমন্ত এক খিটখিটে বুড়ো। এদিকে যে-লোকটা ঘোড়ার পায়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজের দুপা ফেলে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে, সে কিন্তু খোশমেজাজে বক্‌বক্ করে চলছে। না গরমের জ্বলুনি, না ধুলো—কোনটাতেই সে দমার পাত্র নয়।

ওরা একটা বিস্তীর্ণ উপত্যকায় এসে পেঁছুল। দূর পাহাড়ের শ্রেণী থেকে বয়ে আসছে স্নিগ্ধ বাতাস। ওরমকোয়েভ্ চোখ খুলে দূরে তাকিয়ে দেখল: তুষার-শুভ্র পাহাড়পর্বতে ঘেরা শ্যামল উপত্যকাভূমিকে দেখাচ্ছিল সাদা সাদা মেঘখণ্ডের মাঝখানে আলোকিত এক টুকরো নীল আকাশের মতো।

ওরমকোয়েভ্ কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগল, টুকরো টুকরো বিচিত্র ভাবনা অনিচ্ছাকৃতভাবে জেগে উঠে তাকে উৎকণ্ঠিত করে তুলল, চক্রাকারে তার মাথার চারধারে পাক খেতে লাগল,

যেন এখ্নই তাকে দংশন করবে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তার মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করল না, তাকে সান্ত্বনা দিল না। সে চেষ্টা করছিল ওদিকে মনোযোগ না দেওয়ার, কিন্তু গোটা পারিপার্শ্বিক তাকে যন্ত্রণা দিতে লাগল, কী একটা মনে করার জন্য দাবি জানাল তার কাছে। সে তার স্বাভাবিক আত্মবিশ্বাস ও প্রশান্তি হারিয়ে ফেলল। রাস্তার লোকজন তাকে পাছে চিনে ফেলে এই ভয়ে মখমলি টুপিটা চোখের ওপর টেনে দিয়ে সে তাদের কাছ থেকে ম্খ ফিরিয়ে থাকল।

কাদির চলেছে খোশমেজাজে, গ্নগ্ন করে স্র ভাঁজতে ভাঁজতে, হাতে ধরা টুপিটা সে নাড়াচ্ছে, যেমন নাড়াত বিশ বছর আগে অসংখ্য তালি মারা তার ফৌজীমার্কা টুপি। মাঝে মাঝে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ছিল, নীচু হয়ে মাটিতে ঝ্ঁকে পড়ে রাস্তার ধার থেকে ফুল তুলছিল, সেই সময় মনে হচ্ছিল সে যেন সঙ্গীর কাছ থেকে হাসি চাপছে। বন্ধ্র আচরণে ওরমকোয়েভ্ বিরক্ত হল। সে বিরক্তি উত্তরোত্তর বেড়েই চলল।

"কাদির হাসে কেন? আমার ভেতরে হাস্যকর কী দেখল?" এই প্রশ্ন রাকিম অতরোভিচ্‌কে পীড়া দিল। "ধরা যাক, যৌথখামারে মোটরগাড়ি নেই, কিংবা তা মেরামত করতে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাই বলে আমার জন্য কি একটা ভদ্রগোছের ঘোড়াও ওরা খ্ঁজে পেল না? এটা হতেই পারে না, প্রাচীন প্রবচনই ত আছে, 'ঘোড়া ছাড়া কির্গিজ—ডানা ছাড়া পাখি।' না, এ ব্যাপারে দোষী কেবল কাদির নয়..." ভাবতে ভাবতে মখমলি-টুপি-মাথায় সওয়ার অস্থির হয়ে পড়ে, জিনের ওপর উসখ্স করতে থাকে। "ওরা হয়ত আমাকে নিয়ে একটু তামাসা করার উদ্দেশ্যেই এমন অভ্যর্থনার আয়োজন করেছে? এতে কেবল একজন সম্মানীয় লোক হিশেবে নয়, প্রতিনিধি হিশেবেও আমার মর্যাদা ক্ষ্ণ্ণ হবে..." সে অন্ভব করল, কিছ্ একটা ভুল তার হয়ে গেছে, ব্ঝতে পারছিল কী যেন একটা গোলমাল সে করে ফেলেছে এবং আরও পাকা ধরনের অন্য কোন লোকের ক্ষেত্রে এমন ঘটা সম্ভব হত না... আর তার গাঁয়ের সব লোকজন যদি কাদিরের

মতো এ রকমই হয়, তা হলে তাদের দিয়ে ওর কী কাজ? তাদের সঙ্গে রাকিমের সম্পর্ক কিসের? এক্ষুণি ফিরে যাওয়া দরকার। সওয়ার কালবিলম্ব না করে ফেরার জন্য প্রস্তুত।

এমন সময়, বন্ধুর মেজাজের দিকে লক্ষ্য না করে কাদির ঠাট্টাছলে তাকে ফুলের তোড়া উপহার দেয়—হ্যাঁ, উপহারই বলতে হয়।

এটাই বাকি ছিল!

রাকিম অতরোভিচ্ ভদ্রতাবশত সাদাসিধে মেঠো ফুলের তোড়া গ্রহণ করল বটে, কিন্তু ঘ্রাণ পর্যন্ত না নিয়ে অবজ্ঞাভরে সেটাকে ঝুড়ির ভেতরে গুঁজে রাখল। মানী বন্ধুটির মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে গেছে আন্দাজ করে কাদির একঘেয়ে গুনগুন সুর ভাঁজতে ভাঁজতে পাশে পাশে চলতে থাকে।

'বেহায়া আর কাকে বলে!' বিরক্ত সওয়ার প্রায় জোরে জোরেই বিড়বিড় করে বলল। আমরা হলফ করে বলতে পারি যে তার বন্ধু সবই শুনতে পেল, কিন্তু তাতে বিক্ষুব্ধ না হয়ে সে গানের সুর ভেঁজে চলল। গানটা রাকিম অতরোভিচের কেমন যেন চেনা-চেনা।

"কাদির আমাকে অবজ্ঞা করছে, আমার গালিগালাজকে পর্যন্ত আমল দিচ্ছে না..." অপমানে সে এখন কালো থমথমে মেঘের মতো ভ্রূকুটি করে চলতে লাগল। বজ্রপাত হল বলে।

এইভাবে তারা এসে পেঁছুল উত্তাল পাহাড়ী নদীর ধারে। কাদির তীরের দিকে দৌড়ে গেল, সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল:

'বাহবা! এখানেই ত আসতে চেয়েছিলাম!'

রাকিম হতভম্ব হয়ে গেল: বন্ধুর হলটা কী? এখানে আবার চাওয়ার মতো কী থাকতে পারে? নদীর তীর আহা মরি কিছু নয়। তীর যেমন হয়ে থাকে!

ওরমকোয়েভ ঘোড়া থেকে নামল, জলের দিকে এগিয়ে গেল, প্যাণ্টে যাতে সবুজ দাগ না লাগে সেই উদ্দেশ্যে ঘাসের ওপর পরিপাটি করে খবরের কাগজ পেতে সন্তর্পণে বসে পড়ল।

এদিকে কাদির ঘোড়ার পাগুলো আলগা করে বেঁধে দিয়ে ঝুড়িটা

সঙ্গে নিয়ে বিষণ্ণ বন্ধুর পাশে হাত পা ছড়িয়ে দিল। বন্ধুকে ঘাঁটাবে না ঠিক করে সে আনমনে একগাদা ঝুরঝুরে মাটি মুঠোয় নিয়ে আঙুলের ফাঁক দিয়ে ধীরে ধীরে চালতে লাগল। বিশাল পুরুষলী হাতের এই ভঙ্গিতে কেমন যেন এক অকপট স্নিগ্ধ, কোমল ভাব ছিল।

রাকিম অতরোভিচ্ এখন কিছুটা শান্ত হয়ে এসেছে। পারিপার্শ্বিক সৌন্দর্য থেকে সে আর দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারছিল না। এ সৌন্দর্যকে সে চিনতে পারল, তবু মনে হল যেন প্রথম দেখছে। তার সামনে বিস্তীর্ণ হয়ে আছে তার জন্ম-গাঁয়ের উপত্যকা, উত্তরে ও দক্ষিণে তার সীমা বেঁধে দিয়েছে রূপময় পর্বতশ্রেণী।

কী ঔদার্য! পর্বতমালা অনেকখানি সরে গিয়ে সৌভাগ্যবান ভূমির উর্বর উপত্যকার স্থান করে দিয়েছে আর সে সবই দান করেছে মানুষকে। তালাসের কিংবদন্তীমূলক অপূর্ব ভূমি! তালাসের খ্যাতি কেবল তার অপরূপ বিস্তারের জন্য নয়, যুগযুগান্তর ধরে এ উপত্যকায় কখনও এমন অবস্থা হয় নি যাতে শীতকালে তুষার ও জমাট বরফের নীচে চারণভূমির ঘাস অদৃশ্য হয়ে যাওয়ায় হাজারে হাজারে পশুপালের প্রাণহানি ঘটেছে। আশীর্বাদধন্য, অপরূপ তালাস উপত্যকায় এটা হয় নি।

"এমন মাটিতে অতিথি পরাঙ্মুখ লোকের বাস --এ-ও কি সম্ভব?" অপমানিত ওরমকোয়েভ্ ভাবে। "কী করে সম্ভব? কাদিরদের মতো অভদ্র, সঙ্কীর্ণ মনের লোকজন আমাদের এখানে হয় কী করে? আমাদের গাঁ কেন তার নামজাদা লোকদের দিকে সামান্যতম মনোযোগ দিয়েও সম্মান দেখাতে পারে না? এই ঐশ্বর্যপূর্ণ, অপূর্ব দেশ কিনা জন্ম দিয়েছে তার ছেলেবেলার বন্ধুর মতো সব আদিম মামুলি লোকের?--একথা মনে হলে মাটির দিকে তাকাতেও খারাপ লাগে। এককালে কী করে এর সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়েছিল? গাঁটা সম্ভবত এই রকম অজ্ঞ লোকজনে ভর্তি, কাদিরের মতো প্রকৃতির সরলমতি শিশুরা তাদেরই প্রভাবে পড়ে।"

কাদির কিন্তু তখনও ঐ একই কাজ করে চলছে—আদর করে

মাটির গাদা মুঠোয় তুলে নিয়ে আঙ্গুলের ফাঁকে চালছে। কাদিরের ঠোঁটজোড়া নড়ছিল, কিন্তু অমনিতে সে নিশ্চল হয়ে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল হাতের মুঠোর মাটির দিকে, যেন তার মধ্যে আছে কোন গোপন, সর্বগ্রাসী রহস্য। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন এক মুঠো মাটির মন্ত্রে মুগ্ধ এক সরল বালক।

"অদ্ভুত ব্যাপার," রাকিম অতরোভিচ্ ভাবল, "সেকালে লোকে বলত, শয়তান যদি পাপবুদ্ধিকে লোহার শিকলে বেঁধে সরল মানুষের হৃদয়ের মধ্যে বসিয়ে দেয় তা হলে সেখানে তা গলে যাবে, যেমন বরফ গলে যায় আগুনে। তবে কি আমারই ভুল? যাচাই করে দেখা দরকার।"

'কাদির!'

'অ্যাঁ? কী?' কাদির মাথা না তুলেই জিজ্ঞেস করে।

'আমাদের দেশের মাটি দারুণ পাল্‌টে গেছে। তাকে চেনাই যায় না। ঠিক বলছি কিনা, বল?'

কাদির মাথা তুলল, তার চালাক-চালাক চোখের ফাঁকে সামান্য কাঁপন দেখা দিল, যেন কোন এক গোপন রহস্য দপ করে জ্বলে উঠেই অদৃশ্য হয়ে গেল।

'না! মাটিব কিছুই পাল্‌টায় নি। অবিশ্যি এমন হতে পারে যে আমরা চিরকাল এখানে আছি বলে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি, কী পাল্‌টাল তা আমাদের নজরে পড়ে না।'

'তুই হচ্ছিস একটা অবাধ্য ঘোড়ার মতন, আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিস অন্য দিকে,' রাকিম অতরোভিচ্ মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল, মনে মনে ভাবল, তার অধীনস্থ কর্মচারীরা যদি এমন আচরণ করত তা হলে আর দেখতে হত না। 'তুই অবশ্য ঠাট্টা করতে পারিস, তবে তোর চোখ বলে কিছু নেই, তাই তোকে মনে করিয়ে দিই: আজ থেকে বিশ বছর আগে রোদে ফুটিফাটা স্তেপের ওপর কেবল ছিল স্টেশন আর বসতি, আমাদের যৌথখামারের পাড়া। সেখানকার মাটির ঘরগুলো ছিল বিশৃঙ্খলভাবে এখানে ওখানে ছড়ানো ছিটানো,

সেগুলো ছিল ভয়ঙ্কর দৈন্যদশাগ্রস্ত। যৌথখামারের খেত—এটাই ছিল অনাবাদী জমি থেকে উদ্ধার করা একটা ছোট ফালি। আর আজ? ওখানে ফলছে তোমাদের শস্য, এখানে ভুট্টা, ওখানে তামাক, এখানে তরমুজ। সবই বিশাল বিশাল জায়গা জুড়ে, আগেকার দিনের মতো নগণ্য একেক ফালি জমির ওপর নয়।'

'তা ত মানতেই হয়,' কাদির সায় দিয়ে বলল, 'এই সাঁকোটা নতুন, পশুখাদ্য রাখার এই উঁচু গোলাটাও নতুন, দালান কোঠা, চালাঘর, ভেড়ার খোঁয়াড়, শস্যের গোলা—সবই নতুন। শুধু কি তাই? আমাদের পশুপালন ফার্ম ও শস্য মাড়াইয়ের জায়গায় বিদ্যুতের ব্যবস্থাও অনেক দিনের...'

'তা হলে কেন এই বলে তর্ক করছিস যে কিছুই পাল্‌টায় নি? মজার বটে! এটা যদি ঠাট্টা হয় তবে বলি কি বন্ধু, ঠাট্টারও একটা সীমা থাকা উচিত,' ওরমকোয়েভের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার কণ্ঠস্বরে বেশ ঝাঁজ ফুটে উঠল।

'আমি ঠাট্টা করছি না, দেশের মাটি পাল্‌টায় নি। তার চেহারায় কচি ভাব দেখা দিয়েছে, সে তার উৎসবের নতুন সাজ পরেছে, কিন্তু সে সে-ই আছে।'

কাদির এক মুঠো মাটি তার দিকে বাড়িয়ে ধরল:

'এই ত দ্যাখ না। তুই যখন পড়াশুনা করার জন্যে গাঁ ছেড়ে গেলি, তার আগেও, এমন কি তোর জন্মেরও আগে—যুগ যুগ ধরে জমি এমনই ছিল।'

'তুই যেভাবে চিন্তা করছিস তাতে বেশ চটক আছে!' রাকিম অতরোভিচ্‌ এবারে তার ঝাঁজালো ভাবটা চাপার চেষ্টা করল, কিন্তু তা হয়ে উঠল না।

কাদির কিন্তু অতিথিকে খোঁটা দিয়ে কথাটা বলে নি।

'এই জমিকে আমি ভালোবাসি খুব ছোটবেলা থেকে,' বলে চলল সে। 'ছোটবেলায় সকলের বারণ সত্ত্বেও আমি মাটি মুখে পুরতাম, চিবোতাম, মাটি গিলতাম, আর এভাবেই যেন জানার চেষ্টা করতাম

তার রহস্য। বাচ্চাদের মধ্যে যে মাটি, খড়িমাটি, চুণ খাওয়ার একটা দুরন্ত ঝোঁক দেখা যায় ডাক্তাররা ভিটামিনের অভাবকে তার কারণ বলে ব্যাখ্যা করেন—জানি না, হবেও বা। আমার দিকে তাকিয়ে দ্যাখ,' কাদির তার টানটান গালে টোকা মেরে বলল, 'এখনও হয়ত আমার ভিটামিনের ঘাটতি আছে, তাই এখনও ইচ্ছে হয় মাটিকে চুমো খাই।'

এই বলে কাদির পরিতৃপ্তির হাসি হাসল, রাকিমও হেসে উঠল।

এক পশ্চাৎপদ যুবকের কাছ থেকে এমন আকস্মিক কাব্যিক, আবেগপ্রবণ কথা শুনতে পাওয়া অদ্ভুত ব্যাপার। কাদির এতক্ষণ যে কাজ করে যাচ্ছিল ওরমকোয়েভ্ এবারে নিজের অজানতে এক মুঠো মাটি নিয়ে তা-ই করতে লাগল।

হ্যাঁ, এ কেবল রাস্তার ধারের ধূলিকণা নয়। এক মুঠো মাটি নিয়ে সে গভীর চিন্তাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল, তার মধ্যে দেখতে পেল যুগযুগান্তরের ইতিহাস, অনুভব করল এই মাটিতে আমাদের অধিকার রক্ষার জন্য আমাদের পিতৃপিতামহ যে ঘাম ও রক্ত ঝরিয়েছেন তার ঘ্রাণ।

অদ্ভুত ব্যাপার! যে বন্ধু তার মধ্যে এমন গভীর ভাবনা জাগিয়ে তুলল তাকে কি পশ্চাৎপদ বলা যায়? ভালো বলতে হবে যে ওরমকোয়েভ্ শুনিয়ে শুনিয়ে তাকে এখনও মূর্খ ও বেহায়া বলে গাল দেয় নি।

ওরমকোয়েভ্ হঠাৎই উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল, ধরণীর স্নেহস্পর্শ অনুভব করতে করতে হঠাৎ সে বুঝতে পারল কেন ধরণীকে পরম করুণাময়ী জননী বলা হয়। সে গভীর নিশ্বাস নিল, দুনিয়ার সবকিছুই তার ভালো লাগছিল।

মানুষ কেবল তার বাসগৃহে নিজের শয্যায়ই এত স্বচ্ছন্দ, আরাম ও সুখ অনুভব করে... অদ্ভুত। কে বলতে পারে কেন এখন, এখানে তার এত ভালো ও সহজ লাগছে? কয়েক মিনিট আগে রাকিম অতরোভিচ্ যেখানে এই জমিতে নিজেকে পর-পর, আগন্তুক মনে

করছিল, সেখানে এখন সে তাকে আপন বলে গ্রহণ করল।

ছোট নদীটার তীরে শুয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল যে তার জীবনের ইতিহাস ঠিক এখান থেকেই শুরু... ছোটবেলায় রাকিম কতবারই না খালি পায়ে, খালি মাথায়, ছেঁড়া জামাকাপড় গায়ে যৌথখামার থেকে স্টেশনে হেঁটে গেছে... এই সব মাঠে সে অসংখ্যবার হালটানা ঘোড়ার পিঠে চেপেছে; এখানে ফসলের শিষ উঠিয়েছে, খড় জড় করেছে। আর এখানেই, কাছে-পিঠে কোথাও তার বাপকে কবর দেওয়া হয়েছিল... দাঁড়াও, দাঁড়াও, আরে এখানেই না... হ্যাঁ, ঠিক এখানেই কাদিরের সঙ্গে সে ছেলেবেলায় খেলেছে... স্মৃতিকথার উদয় হতে লাগল। তারা সংখ্যায় অনেক-- পাহাড়ী নদীর তলদেশে চকচকে বিচিত্র নুড়ি পাথরের মতো। হঠাৎ এই অসংখ্যের মাঝখান থেকেই বিশিষ্ট হয়ে দেখা দিল, ঝকমক করে উঠল এক বিশেষ উজ্জ্বল পাথর, তার জীবনের একটি ঘণ্টা, একটি ঘটনা।

বিধবা অভাগী মা রাকিমকে পড়াশুনা করার জন্য শহরে ছাড়তে নারাজ। একগুঁয়ে ছেলে এক বোতল দই আর রুটি সম্বল করে বাড়ি থেকে পালাল। স্টেশন অবধি পলাতকের সঙ্গে সঙ্গে যায় বন্ধু কাদির। মনে পড়ে, নদীর তীরের এই জায়গাটা পর্যন্ত যখন তারা পৌঁছুল তখন অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। দুর্ভোগ ও দুশ্চিন্তার মধ্য দিয়ে কাটানোর ফলে সকাল থেকে তারা কিছুই খেতে পারে নি। কেবল নদীটা পর্যন্ত পৌঁছুনোর পরই তারা অসহ্য খিদে টের পেল।

রাকিম অতরোভিচ্ নিজের স্মৃতিচারণের ভাগ কাদিরকেও দিতে লাগল। কাদির উৎসাহিত হয়ে তার খেই ধরে বলল:

'হ্যাঁ, তাই-ই বটে। মজা এই যে কেবল তোর পালানোর কথা নিয়ে ভাবার ফলে নিজের সম্পর্কে আমার তখন একেবারেই খেয়াল ছিল না, তাই পথের জন্যে এক টুকরো রুটিও সঙ্গে নিই নি। অথচ কী দারুণ খিদে! তুই তোর যা সম্বল ছিল তার অর্ধেক আমাকে দিতে চাইলি। আমি খেতে শুরু করলাম, এমন সময় খেয়াল, হল তাই ত

এর পরে তুই শহরে যাবি কী করে? আমি খিদে সইব বলে মনস্থির করলাম। আমি তোকে খেতে বললাম, তুই বললি আমাকে খেতে। আমরা যখন এইভাবে এখানে বসে বসে একে অন্যকে খাবার জন্যে অনুরোধ-উপরোধ করছিলাম, সে সময় আমাদের—পলাতকদের লোকজন এসে ঘিরে ধরল, পাকড়াও করল।'

'হা-হা-হা।' দুই ফুর্তিবাজ দুরন্ত ছোকরা অট্টহাসি হেসে উঠল।

'জানি না... খালি থলি হাতে, পকেটে একটি কাণাকড়িও না নিয়ে কী করে এক বোতল দই আর একটি রুটির ওপর আমি ভরসা করেছিলাম? শহরে আমার চেনা-জানা একটি প্রাণীও ছিল না,' রাকিম অতরোভিচ্ উৎসাহভরে স্মৃতিচারণ করে বলল।

হ্যাঁ, ছেলেটির পলায়নের প্রথম প্রয়াস ব্যর্থ হল। কিন্তু মা তাকে বুঝতে পারল, শেষে নিজেই তাকে সাধ্যমতো পাথেয় দিয়ে গোছগাছ করে পাঠিয়ে দিল।

বিশ বছর পরে, এখন আবার তারা সেই দুই বাচ্চা ছেলে, যারা কোন এক সময় এক বোতল দই আর একটা রুটি নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করেছে; তারা দুটিতে বসে আছে নদীর সেই একই পারে, তবে এখন তারা আর সে রকম ঘনিষ্ঠ বন্ধু নয়, যেমন ছিল কোন এক কালে। কিন্তু এখন সেই ছোটবেলার মতো হতেই বা দোষের কী? কোথায় যেন বাধো বাধো ঠেকে।

ঘনিষ্ঠতার প্রথম উদ্যোগ নিল কাদির। সে হঠাৎ একটা অপ্রত্যাশিত খাবার এনে হাজির করল। জাঁক করে ঝুড়ি থেকে একটা মোড়ক বার করে তা খুলল আর... বার করল এক বোতল দই আর একটা রুটি।

'হা-হা-হা!' এই একই জায়গায় ছোটবেলায় যে ঘটনাটি ঘটেছিল তার সামান্যতম খুঁটিনাটি অংশ স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিতে রাকিম অতরোভিচ্ প্রাণভরে হেসে উঠল। 'এটা বেড়ে হয়েছে! ঠিক আছে, তুই শুরু কর দেখি!' কাদিরের দিকে বোতলটা বাড়িয়ে ধরে রাকিম বলল।

'না,' কাদির প্রতিবাদ করল। 'বিশ বছর আগে শুরু করেছিলাম আমি, এবারে তোর পালা!'

দুবারে বোতলটা নিঃশেষ করে দিয়ে তারা রুটি খেতে শুরু করল। দইয়ের কী তার! কী চমৎকার রুটি!

কাদির কিন্তু এখানেই থামল না। সে এক বোতল 'মস্কোভ্স্কায়া' ভোদ্কা বার করে বলল :

'নেশা ধরানো দুধে ধেড়ে খোকাদের বাধা নেই!'

রাকিম হেসে উঠল :

'কাদির, তুই সেই রকমই খেয়ালি আছিস দেখছি!'

অভিভূত রাকিম অতরোভিচ্ ভুলে গেল যে তার মতো উঁচু পদমর্যাদাসম্পন্ন একজন লোক সরাসরি রাস্তার ধারে বসে ভোদ্কা পানের উদ্যোগ করছে! সে মৃদু হেসে বিড়বিড় করে বলল :

'দে! দে! খাওয়া যাক!'

কাদির একটা ছোট গেলাসে ভোদ্কা ঢালল। অতিথি যখন কাদিরের স্বাস্থ্য কামনায় গেলাস উপুড় করে গলায় ঢালতে যাবে তখন অল্পবয়সী মেয়েদের দল বোঝাই একটা ট্রাক তাদের পাশ দিয়ে চলে গেল। এরা সব তামাক বাগিচার কামিন। আমাদের বীরপুরুষদের দেখতে পেয়ে মেয়েরা পাশ থেকে সমস্বরে চেঁচিয়ে বলতে বলতে গেল :

'বাহবা, বাহাদুর! তোমাদের ভালো হোক! মাত্রাজ্ঞান রেখো! সুখে থাক!'

এঃ, কেমন যেন বেখাপ্পা হয়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যে রাকিমের ভাবান্তর ঘটল, এক হাতে যে ভর্তি গেলাস আছে তা ভুলে গিয়ে সে অভিনন্দনের উত্তরে অন্য হাত তুলে কোমল ভঙ্গিতে হাতের কব্জি নাড়াল।

রাকিমের পর কাদিরও পান করল বন্ধুর স্বাস্থ্য কামনায়। ধড়িবাজ কাদির কিন্তু এখানেই থামল না। তার দুষ্টুমিভরা খুদে চোখজোড়ায় চাপা হাসির ঝলক খেলে গেল।

'সাঁকো দিয়ে আমাদের কী দরকার রাকিম? এতে মনে ধরার মতো কী আছে? আয়, এককালে যেমন করতাম, তেমনি জুতো খুলে পায়ে হেঁটে নদী পার হই।'

রাকিম ছোটবেলায় স্নান করতে ভালোবাসত। বন্ধুর প্রস্তাব তার মনে ধরল। তারা জুতো খুলে ফেলল, প্যান্ট যতদূর পারা যায় গুটিয়ে তুলে নদী পার হতে লাগল। পাহাড়ী নদীর ঠাণ্ডা জলে পা কেটে যায়। এতে ফুর্তি আর উৎসাহ লাগল। রাকিম অতরোভিচ্ ছোটবেলার মতো অত চটপট নদীর পিছল পাথরের ওপর পা চালাতে পারছিল না। সে পিছলে গিয়ে ও দুহাত ঝটপট নাড়াতে নাড়াতে কোন রকমে ভারসাম্য রক্ষা করছিল, পায়ের নীচে নাল লাগানো ঘোড়ার মতো এগোচ্ছিল। কিন্তু এ অবস্থায়ও তারা মজা পেল, তারা আবার তাদের কৈশোর ফিরে পেয়ে নিশ্চিন্তে হাসতে লাগল। দু-দুবার জলে পড়পড় অতিথিকে কাদির কৌশলে খপ করে ধরে ফেলল।

ওরা যখন ওপারে গিয়ে পেঁছুল তখন মনে মনে বেশ ফুর্তি অনুভব করে ওরমকোয়েভ্ প্রস্তাব দিল:

'আয় চান করা যাক!'

কাদির সঙ্গে সঙ্গে রাজী। তারা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল, বিশ বছর আগের মতো একে অন্যের গায়ে জল ছিটোতে লাগল। খেলতে খেলতে মত্ত হয়ে রাকিম তাড়াতাড়ি এক পাশে সরে যেতে হোঁচট খেয়ে জলের ভেতরে একটা গর্তের মধ্যে পড়ে গেল। সে আর্তনাদ করে জলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। শহুরে হয়ে সে সাঁতার কাটা ভুলে গেছে, ভয় পেয়ে এলোপাতাড়ি হাত-পা ছুঁড়তে লাগল। শেষকালে কাদির তাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে এলো, হাসতে হাসতে তাকে অগভীর জলে টেনে তুলল। জলের মধ্যে সেখানেই তারা লুব্ধ হয়ে হুটোপাটি করে চলল — কাদিরের কথামতো — যেমন করে থাকে জলশূন্য বিশাল মরুপ্রান্তর ভেদ করে উড়ে আসার পর হাঁসেরা।

তীরে উঠে কাদির সূর্যের দিকে তাকাল:

'বৎস রাকিম, আর নয়, লোকে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে!'

স্নানের পর র‍্যাকিম যেন একেবারেই পাল্‌টে গেল। তার চেহারায় যে সজীবতা দেখা দিয়েছে তাতে মনে হয় সে যেন সেই আমুদে ছেলেটি, যেমন তাকে দেখা যেত বহুকাল আগে সেই ছোটবেলায় এই নদীতে, ঠিক এই জায়গায়ই স্নান করার সময়। কাদির ঘড়ি দেখল।

যৌথখামারের দিক থেকে ধুলো উড়িয়ে একটা মোটরগাড়ি সোজা তাদের দিকেই ছুটে এলো। সেটা ছিল 'পবিয়েদা' গাড়ি। গাড়ি একেবারে পারের কাছে এসে থামল। কাদির গাড়ির দরজা খুলতে অতিথি লক্ষ্য করল যে গাড়িটা আনকোরা নতুন। গাড়ির সীট গালিচায় মোড়া, রেডিওতে বাজছে প্রিয় সুর তক্তগুলের 'কেরবেজ', সীটে রাখা আছে গ্ল্যাডিওলাসের বিশাল স্তবক।

'আসুন! বসুন!' কাদির আমন্ত্রণ জানাল।

র‍্যাকিম অতরোভিচ্ চেহারায় তার সেই কর্মব্যস্ত ভাব আনতে গেল, গাড়ির দিকে এগোল, কিন্তু পরক্ষণেই থমকে দাঁড়াল। হ্যাঁ, মোটরগাড়ির অপেক্ষা সে করছিল বটে, মোটরগাড়ি না থাকায় বন্ধুকে সে মনে মনে ভর্ৎসনাও করেছে। কিন্তু গাড়ি যদি তাকে নেওয়ার জন্য স্টেশনে আসত তা হলে বিশ বছর আগে তার জীবনে যা ঘটেছিল তা আজ যেমন সে দেখতে পেয়েছে, অনুভব করেছে এবং স্মরণ করেছে, তা কি অত স্পষ্ট করে দেখা, অনুভব করা, স্মরণ করা সম্ভব হত?

এখন সে বুঝতে পারল কেন কাদির একা তাকে নিয়ে আসতে গিয়েছিল, কেন সে তাকে মরখুটে ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে নিয়ে আসে। র‍্যাকিম যখন তার জন্ম-গাঁ ছেড়ে যায় তখন মা বহু কষ্টে পড়শীর কাছ থেকে চেয়েচিন্তে ঠিক এমনই এক খাবলা খাবলা ছোপ ধরা মরখুটে ঘোড়া যোগাড় করে, সেই ঘোড়াটারও জিন আর তার সঙ্গে ঝুড়িটা এ রকমেই ঘসটানো ছিল। বাচ্চা ছেলেটার স্বপ্ন ছিল কবে তার নিজের এ রকম একটা ঘোড়া হবে, কেন না ঘোড়া ছাড়া কির্গিজ ডানা ছাড়া পাখিরই সামিল। কত ছোটই না ছিল তার সাধ!

রাকিম অতরোভিচ্ এ সবই মনে করতে পারল। তার হাতে আবারও সহকারী মন্ত্রীমশাইয়ের পোর্টফোলিও ঝকমক করলে কী হবে, গাঁয়ের স্কুলমাস্টার কাদিরের সামনে সে ইসকুলের এক অপরাধী বালকের মতো দাঁড়িয়ে রইল।

'ওরে কাদির, আমাকে মাফ কর।'

সে গাড়িতে উঠতে রাজী হল না। গাড়িটাকে গাঁয়ে চলে যেতে দিয়ে ওরা নিজেরা খাবলা খাবলা ছোপ ধরা ঘোড়াটাকে লাগাম ধরে টানতে টানতে পায়ে হেঁটে চলল।

রাকিম অতরোভিচ্ এবারে অনুভব করল যে যেমন ভেবেছিল তার জন্ম-গাঁ এখন আর তেমন নয়। তার দ্বারপ্রান্তেই সে পেয়ে গেল মনে রাখার মতো শিক্ষা। পরে আরও কী আছে কে জানে?

এখানে সে রাতটা কাটাবে, আর কাল তাকে কাজের জন্য যেতে হবে অন্যান্য অঞ্চলে। শিগ্‌গির কি আর সে এখানে ফিরতে পারবে? আবার কবে কাদিরের সঙ্গে দেখা হবে? বলা যায় না। তাই তার ইচ্ছে হল এখনই প্রাণ খুলে ওর সঙ্গে কথা বলে। কাদির বুদ্ধিমান, খুব সম্ভব, মাস্টারও সে মন্দ নয়, তা হলেও আজ অবধি সে পড়ে আছে অজ পাড়া গাঁয়ে, হয়ত এটা-ওটা অনেককিছু তার প্রয়োজন আছে। বন্ধুকে তার প্রয়োজনে সাহায্য করা দরকার, গ্রামের সামান্য স্কুলমাস্টারটি হয়ত উন্নতির স্বপ্ন দেখে... তার সাহায্যের অর্থ আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবকে পোষণ করা নয় — মোটেই না! সে নেহাৎই সাহায্য করতে চায় এমন এক লোককে যে বাস্তবিকই চেষ্টা করছে সামনে এগিয়ে যাওয়ার, উন্নতি লাভের। জাতীয় শিক্ষার এতে লাভ বৈ ক্ষতি হবে না। প্রথমত, সে কখনও তার একজন ঘনিষ্ঠ লোককেও এভাবে সাহায্য করে নি। একবার অন্তত সে বন্ধুকে সাহায্য করতে পারে ত!

এইভাবে নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে সে বলল:

'ধন্যবাদ তোকে কাদির, যা করলি সে সবের জন্যেই ধন্যবাদ! অতীত জগতে ঘোরার বড় আনন্দ তুই আমাকে দিয়েছিস। আয়,

একান্তে মনের কথা খুলে বলা যাক। আমার কাছে খোলাখুলি বল দেখি, তোর জীবনের গোপন উদ্দেশ্য, জীবনের স্বপ্ন কী? তোর কী দরকার আমাকে বল? আমি এখান থেকে যাওয়ার আগেই ভালো করে ভেবে আমাকে বলবি। আমি কাল যাচ্ছি। এমনও হতে পারে যে আবার বহুকাল আমাদের দেখাসাক্ষাৎ হবে না। আমি তোকে সাহায্য করতে চাই।'

'অ্যাঁ? কী?' কাদিরের কথাগুলো কর্কশ শোনাল। 'আমার কোন অভাব নেই। তোর সাহায্যে আমার কাম নেই! আমার স্বপ্ন সফল করতে আমাকে সাহায্য করবে আমার দেশের মানুষ, আমার পার্টি।' কাদিরের প্রসন্ন মুখ সঙ্গে সঙ্গে থমথমে ও গম্ভীর হয়ে উঠল।

রাকিম অতরোভিচ্ অনুভব করল যে সে এমন একটা কথা বলে ফেলেছে যা বলা উচিত হয় নি, যেমনভাবে বলা উচিত ছিল বলতে পারে নি, এমন একটা কাজ করে বসেছে যা করা উচিত হয় নি।

তার মনে হল বন্ধু তার কথার ঠিক অর্থ ধরতে পারে নি। কিন্তু কাদিরকে বুঝিয়ে তার মত ফিরানো এখন অসম্ভব। তারা চুপচাপ চলতে লাগল, দুজনেই গম্ভীর হয়ে ভাবতে লাগল নিজের নিজের ভাবনা, অনুভব করল তাদের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান।

বাইরের কেউ দেখলে প্রথম দৃষ্টিতে নির্ঘাত মনে করবে যে রাজধানী থেকে আগত কোন এক দায়িত্বশীল কর্মচারী চলেছেন দৈবাৎ পথে সাক্ষাৎ পাওয়া এক গ্রামবাসীর সঙ্গে।

নোমান কারিমভ

সাপ ও জল

আমি সাপুড়ের ছেলে। কিন্তু সাপুড়ের কাজটা যে কী দশ বছর বয়স পর্যন্ত আমি তা চোখে দেখি নি। এটা ঠিক যে বাবা আমাকে প্রায়ই সাপের গল্প বলতেন। বড় অবাক হয়ে যাই যখন জানতে পারি যে মানুষের মতো প্রতিটি সাপেরও নাম থাকে। প্রথম প্রথম এটা বিশ্বাস করি নি, কেন না বড়রা সব সময়ই ছোটদের জন্য কিছু না কিছু একটা বানিয়ে বলে। কী দরকার বাপু?

বাবা যে সব সাপ ধরেন সেগুলোকে লোহার বাক্সের ভেতরে নড়াচড়া করতে আর রাগে হিসহিস করতে দেখে আমার গা সিরসির করে উঠত, বুক হিম হয়ে যেত। তবে আমার মনে হয়েছিল যে ওরা অবশ্য ততটা ভয়ঙ্কর নয়!

দশ বছর পুরোতে বাবা আমাকে শিকারে নিয়ে চললেন। বাড়িতে থাকতেই এই বলে সাবধান করে দিলেন:

'আমি যখন সাপের মুখোমুখি হব, তখন খবরদার বলছি, আমার নামও মুখে আনবি না। তা হলে কিন্তু আমি মারা যাব!'

গুমোট সকাল। সূর্য ততক্ষণে ফাঁসদড়িতে উঠে ঝুলছে, আর হল্‌কা ছাড়ছে ত ছাড়ছেই... ঘোলাটে আকাশটা দেখে মনে হয় যেন এক প্রকাণ্ড পিতলের চোখ, যেখান থেকে চোখের জ্বলন্ত মণি— সূর্যটা কোন রকম দয়ামায়া না করে মরুভূমির জীবন্ত সব কিছুর ওপর ছোবল মারছে। মরুভূমির মেঠো ইঁদুর কিচকিচ আওয়াজ করছিল, নিঃসঙ্গ একটি ঈগল ঊর্ধ্ব আকাশে উড়ছিল খাদ্যের সন্ধানে।

এমন সময় হিসহিস আওয়াজ উঠল, তা পরিণত হল শিসে। বাবা আমাকে চেঁচিয়ে বললেন: 'নড়বি না!'—এই বলে তিনি পায়ে পায়ে সাপের মুখোমুখি এগিয়ে চললেন... তারপর থমকে দাঁড়ালেন। আমিও কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম: বাবার দশ পা দূরে, মুখোমুখি— লেজের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক গোখ্‌রো সাপ। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চকমকে ফিতের মতো সামান্য কিলবিল করে এপাশে ওপাশে দুলছে। সাপ আর বাবা এক দৃষ্টিতে চোখে চোখে তাকিয়ে।

আমি ভয়ে নিঃশ্বাস ফেলছিলাম না, দম বন্ধ করে অপেক্ষা করছিলাম। দেখতে পেলাম, বাবার ঠোঁটজোড়া ফেকাসে হয়ে গেল, একটু একটু কাঁপতে লাগল। তাঁর কাঁধ দুটো ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল। আমার জন্য বোধহয় তাঁর ভয় হচ্ছিল। এদিকে আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম, কেন বাবা তাঁর নাম মুখে আনতে মানা করলেন? আমার কিন্তু দারুণ ইচ্ছে হচ্ছিল গোটা মরুভূমিতে শোনার মতো করে তাঁর নাম উচ্চারণ করি যাতে সব সাপ সোরগোল তুলে হাঁকপাঁক করে মারা যায়!

কিন্তু আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। রোদের তাপে আমার মুখ পুড়ে যাচ্ছিল, চোখের ওপর অঝোরে ঘাম গড়িয়ে পড়ছিল।

মনে হল যেন অনন্তকাল চলে গেল। আমার আর শক্তি নেই, বালির উপর পড়-পড় অবস্থা, এদিকে ওরা দাঁড়িয়ে আছে ত আছেই। কালো

ফিতের আকারের সাপটা কখনও হেলছে দুলছে, কখনও ফণাটা সামনে বাড়িয়ে দিচ্ছে, কখনও বা সামান্য পিছিয়ে যাচ্ছে। বাবার গলাটাও টান টান হয়ে এলো।

আমি আর সহ্য করতে পারলাম না।

'কারা*, এই পাজী কারা। বাপজানকে ছেড়ে দে!' সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেলাম সাপটা কাটা ডালের মতো টান টান হয়ে বালিতে পড়ে গেল। বাবাও তৎক্ষণাৎ তার গলাটা খপ করে ধরে থলির ভেতর পুরে ফেললেন।

'বেশ করেছিস, বেটা,' আমি দৌড়ে কাছে আসতে তিনি বললেন। বাবাকে ফেকাসে দেখাচ্ছিল, তাঁর মুখ থেকে ঘাম ঝরছিল।

'আমি বুঝতে পারছিলাম না কী করা যায়,' তিনি বললেন, 'মনে মনে সমস্ত নাম আওড়ালাম, এদিকে নচ্ছারটা দাঁড়িয়ে আছে ত আছেই! কিছুতেই কিছু হবার নয়! এই সাপটার নাম ছিল কারা। তুই আমার প্রাণ বাঁচালি, বেটা!'

আমরা বাড়ির দিকে চললাম। পথে বাবা বললেন:

'সাপও আমার নাম আন্দাজ করার চেষ্টা করছিল। এই কালকূটগুলো মানুষের চেয়েও ধূর্ত। সাধে কি আর লোকে বলে: 'সাপের মতো খল!''

* * *

বাবা সপ্তাহে দুটো-তিনটে সাপ ধরতেন। প্রতিটি সাপের মুখোমুখি হওয়া তার কাছে ছিল মৃত্যুর সঙ্গে সাক্ষাতের সামিল। কিন্তু তিনি কখনই মনমরা হতেন না, তাঁকে সব সময় ফুর্তিবাজ ও খোশমেজাজী দেখাত।

তাঁর মুখটা ছিল শুকনো, যেন করোটির ওপর চামড়া টান করে

* কারা — আক্ষরিক অর্থ — কালো। ব্যক্তির নাম।

লাগানো। বিরাট বিরাট একজোড়া চোখ, সব সময় বিস্ফারিত, সে চোখের দিকে বেশিক্ষণ তাকানো যেত না। তাঁর কালো জোড়া ভুরু একটি সরল রেখার আকার নিয়েছে।

প্রতি রবিবার আমাদের কাছে একজন লোক আসত। সে বাবার কাছ থেকে সাপ নিত, অনেকক্ষণ ধরে ধন্যবাদ জানাত, তারপর দাম শোধ করত। এই টাকায়ই আমাদের সংসার চলত। আমি ছোট ছিলাম, কিন্তু তখনই বুঝতে পারতাম কী মূল্যে আমাদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান হচ্ছে। তখনই আমি মনে মনে সঙ্কল্প করলাম: বড় হয়ে বাপকে বিপদ থেকে উদ্ধার করব, নিজেদেরও বাঁচাব তাঁর জীবনের জন্য চিরকালের এই উদ্বেগ থেকে।

* * *

আমাদের গাঁয়ে ঘরের সংখ্যা বেশি নয় — বারো। এ সংখ্যা বাড়ে না, কমেও না। বাচ্চারা বড় হলেই তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হয় বোর্ডিং স্কুলে। বোর্ডিং স্কুল আমাদের এখান থেকে অনেক দূরে — ঘোড়ায় চড়ে যেতে চব্বিশ ঘণ্টারও বেশি লাগে।

বোর্ডিং স্কুল শেষ করার পর ওরা ভর্তি হয় কারিগরি কলেজে, ইনস্টিটিউটে, বড় বড় নির্মাণকেন্দ্রে ও শহরে চলে যায়, কিংবা যায় সেনাবাহিনীতে, গাঁয়ে আর ফিরে আসে না। যখন আসে, তখন তারা বিদ্বান, সাবালক — আসে কেবল অতিথি হয়ে। বোঝাই যায়, এখানে থাকতে তাদের একঘেয়ে লাগে। প্রত্যেকেই উন্মুখ হয়ে থাকে বিশাল জীবনের জন্য। এই বিশাল জীবনটা কেমন?..

আর তাদের সঙ্গে শহুরে বন্ধুরা এলে নির্ঘাত জিজ্ঞেস করে বসবে:

'তোমরা জল পাও কোথা থেকে?'

'কোথা থেকে মানে?' আমরা অবাক হয়ে যাই, 'কোথা থেকে আবার? কিরিয়াজ থেকে।'

'কিরিয়াজটা কী?' আগন্তুকের চোখ বিস্ফারিত হয়ে যায়।

উত্তর না দিয়ে উপায় নেই। হাজার হোক বড় শহরের লোক। কে জানে, বড় পণ্ডিতই বা হবে--হয়ত মরুভূমিটাকে সমুদ্দুরই বানিয়ে দেবে।

আমিও আগে জানতাম না কিরিয়াজ কী... পরে বাবা আমাকে বলেন।

...এক সময় তৈমুর লং এক অভিযানের পরিকল্পনা করলেন। কিন্তু জলহীন মরুভূমির ওপর দিয়ে হাজার হাজার সৈন্যসামন্ত নিয়ে পাড়ি দেওয়া যায় কী করে? তখন তৈমুর লং হাজার হাজার গোলামকে এখানে নিয়ে আসার হুকুম দিলেন, আর তাদের দিয়ে কুয়ো খোঁড়ালেন... কুয়োগুলো খোঁড়া হল কাঁকর-মাটির স্তর অবধি, তারপর সুড়ঙ্গ খুঁড়ে তাদের মাঝখানে যোগাযোগ করা হল। এইভাবে সেগুলো চলে গেল পাহাড় পর্যন্ত আর সেখান থেকে ঝরণা বয়ে জলের ধারা কুয়োতে নেমে এলো। কিরিয়াজ থেকে কিবিয়াজে জলের স্রোত বইতে লাগল। আজ কয়েক শ বছর ধরে আমরা গোলামদের আনা জল পান করে আসছি।

ধসের ফলে আর বালিতে ভরাট হয়ে বহু কিরিয়াজ শুকিয়ে গেছে, কিন্তু বহু কিরিয়াজ আজও পথিকের তৃষ্ণা মেটায়, আমাদের পরিত্যক্ত গ্রামকে বাঁচিয়ে রাখছে...

* * *

যে কিরিয়াজ আমাদের বসতির জল যোগাত, একবার সেটা শুকিয়ে গেল। লোকে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল। যার যতটুকু সঞ্চয় ছিল তা-ও ফুরিয়ে গেল। পাড়াপড়শীরা একে অন্যের কাছ থেকে শেষ জলবিন্দুও ভাগাভাগি করে নিল। ছোটরা কাঁদতে লাগল। বড়রা হতাশ হয়ে মুখ খারাপ করতে লাগল।

আমাদের এখানে রাতে ঠাণ্ডা পড়ে, জলতেষ্টা পায় না বললেই

চলে। কিন্তু সকালে অনেকেই তেষ্টায় জ্ঞান হারিয়ে ছটফট করতে থাকবে। "তেষ্টায় এইভাবে কষ্ট পেতে হবে? আচ্ছা, সাহায্য চাইতে গেলে হয় না?"

খুব ভোরে বাবা বিছানা ছেড়ে উঠলেন, তাড়াতাড়ি পথ ধরলেন। ভোরের পাখি সবে ডাকতে শুরু করেছে। আমিও লাফিয়ে বিছানা থেকে উঠে তাঁর পেছন পেছন ছুটলাম।

'জায়গাটা অনেক দূরে, বেটা। পথে রোদের তাপে মারা যাবি। আমি ঠিক পেঁছে যাব, তোর যাওয়া উচিত হবে না! সন্ধে নাগাদ গাড়ি করে জল নিয়ে আসব। সব্বাইকে বলে দে যে বুড়ো জোওমার্ত সাহায্য চাইতে গেছে।'

আমি তাঁর কথা শোনার ভান করলাম। এদিকে বাবা বালির পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যেতে আমিও তাঁর পিছু নিলাম।

ওঃ, বালির ওপর দিয়ে যাওয়া কী কঠিন! নিজের ভারী নিঃশ্বাস আর চারদিকে ঝরঝর ঝরে পড়া বালির শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। মরুভূমির শক্ত কাঁটাঝোপগুলোর নীচ থেকে সময় সময় বেরিয়ে আসছে মেঠো ইঁদুর। সেদিকে তখন আর নজর দেওয়ার সময় নেই।

সূর্য ক্রমেই ওপরে উঠতে লাগল, অসহ্য তার জ্বলুনি বালি থেকে জলীয় বাষ্পের ছিটেফোঁটা পর্যন্ত নিংড়ে নিল...

এইভাবে আমরা প্রায় সারা দিন চললাম। ইতিমধ্যে সূর্য দিগন্তে ঢলে পড়তে শুরু করেছে, মনে হচ্ছিল চিরতরে টিলার ওপরে অধিষ্ঠান করবে।

আমি হিসহিস শব্দ শুনতে পেলাম। দেখতে পেলাম বাবা থমকে দাঁড়ালেন, পাশ ফিরেই আড়ষ্ট হয়ে পড়লেন। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুলছিল একটা সাপ... আমিও আড়ষ্ট হয়ে গেলাম, যা যা নাম মনে এলো মনে মনে আউড়ে চললাম...

এইভাবে আমরা বেশ দীর্ঘকাল দাঁড়িয়ে রইলাম।

কাছে এগোতে আমার ভয় করছিল: সাপ সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

তারপরই কী যেন একটা ঘটে গেল: হয়ত নোনা ঘাম বাবার চোখের ওপর গড়িয়ে পড়ল, হয়ত বা তাঁর মনে পড়ে গেল যে বাচ্চারা আর বুড়োরা জলের জন্য অপেক্ষা করছে—বাবা সামান্য নড়ে গিয়ে এক পাশে পা ফেলেছেন মাত্র। সাপটা এরই অপেক্ষায় ছিল। সে একটা চাপ দেওয়া স্প্রিংয়ের মতো টানটান হয়ে পড়ল...

...আমার ঠান্ডায় আড়ষ্ট ভাব কেটে গেল। সূর্য অনেক আগে অস্ত গেছে। বড় বড় তারার আলোয় বাবার শরীরটা ছাইরঙা দেখাচ্ছিল। আমি কাঁপতে কাঁপতে তার দিকে এগিয়ে গেলাম, দেশলাই জ্বালালাম। বাবা চিৎ হয়ে সামান্য হেলে পড়ে ছিলেন, তাঁর আঙ্গুলগুলো কুঁকড়ে গেছে, চোখজোড়া ঠেলে বেরিয়ে এসেছে...

সাপ তখন আর ছিল না, কিন্তু আমার ভয় হচ্ছিল বুঝি ফিরে আসে। আমি বেশি করে কাঁটাঝোপ জড় করে নিয়ে আগুন জ্বালালাম।

আমি অনেকক্ষণ বসে বসে আগুনে কাঁটাঝোপ ফেলতে লাগলাম। এমন সময় দূরে একটা উজ্জ্বল আলো দপ করে জ্বলে উঠল। আমি ভয় পেয়ে গেলাম, ভাবলাম জিন-টিন নয়ত। চোখের পলকে আগুন নিভিয়ে দিলাম। এদিকে উজ্জ্বল আলোটা ক্রমেই এগিয়ে আসতে লাগল।

আমি দুহাতে বাবার দেহটা জড়িয়ে ধরে চোখ বুজলাম। যা থাকে কপালে। কিন্তু ঠিক এই সময় মোটরগাড়ির ইঞ্জিনের ঘরঘর আওয়াজ শোনা গেল, বালির টিলার ওপাশ থেকে ছুটে এলো মোটরগাড়ি।

লোকজনের কণ্ঠস্বর কানে এলো, কিন্তু আমি টুঁ শব্দটি না করে বসে রইলাম। লোকে আমার দিকে এগিয়ে এলো।

'তুই এখানে কী করছিস? এই বুড়োর কী হয়েছে?'

'সাপে ছোবল মেরেছে...' এর বেশি কিছু আমি বলতে পারলাম

না, কেন না পরমুহূর্তেই নিজেকে আর সামলাতে না পেরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলাম।

তখন লোকে আমার বাবাকে নিয়ে গাড়িতে তুলল। আমাকে ড্রাইভারের পাশে বসিয়ে যারা আমার জ্বালানো আগুন দেখতে পেয়ে আমাদের খুঁজে বার করেছিল, তাদের কাছে পেঁছে দিল।

শিবিরে লোকজনকে আমি বললাম যে গাঁয়ে লোকে জলের অভাবে মারা যাচ্ছে, বাবা সাহায্য চাইতে বেরিয়ে শেষ অবধি আর পেঁছুতে পারেন নি...

তখন কম্যান্ডারের হুকুম হল:

'এক্ষুনি ছেলেটির সঙ্গে জলের গাড়ি পাঠানো হোক!'

কয়েক ঘণ্টা বাদে ড্রাইভারের সঙ্গে আমরা লোকজনকে পানীয় জল বিতরণ করলাম।

* * *

বাবাকে নিয়ে আসা হল কেবল সন্ধ্যাবেলায়। তাঁকে গোর দেওয়া হল খাঁটি বীরের মর্যাদায়।

কম্যান্ডার হুকুম দিলেন এলাকাটা ভালো করে দেখেশুনে আমাদের কিরিয়াজে জল শুকিয়ে যাওয়ার কারণ বার করা হোক। দেখা গেল, এক জায়গায় মাটি বসে গিয়ে সুড়ঙ্গ আটকে গেছে। সৈন্যরা তাড়াতাড়ি সেটাকে পরিষ্কার করে গাঁথুনি দিয়ে শক্ত করল, আবার আমাদের জল এলো।

বাবা কিন্তু নেই...
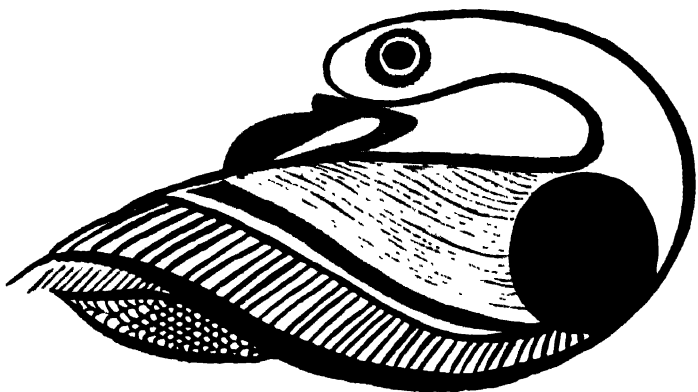
মুর্জা গাপারভ

কারাকুলের হাঁস

বুড়ো শেষবারের মতো উনুনে কয়লা ফেলল। বিশাল লোমশ হাত দিয়ে সে কপালের ঘাম মুছে সদর দরজার দিকে এগোল।

বাগানের প্রান্তে এলুমিনিয়ামের নোংরা টেবিলগুলোর ওপর ইলেক্‌ট্রিক লাইট এসে পড়ছিল। টেবিলের পাশে বসে ছিল জানাশোনা কয়েকজন ড্রাইভার, যারা ওশ থেকে মাল নিয়ে এসেছে, আর ছিল জনা তিন-চারেক স্থানীয় নিষ্কর্মা—তাদের পায়ে লাল মোজা; এ ছাড়া আরও একজন অচেনা লোক। এই লোকটার মুখের আদল দুশান্‌বের তাজিকদের মতো।

ড্রাইভাররা কখনও কখনও উত্তেজিত হয়ে কী নিয়ে যেন তর্কবিতর্ক করছিল, কখনও বা সমস্বরে হো হো করে হাসছিল। তাদের হাসি অন্ধকার বাগানে প্রতিধ্বনি তুলছিল।

অচেনা লোকটি শেষ টেবিলটার পাশে একা বসে ছিল। সে

চারপাশের খারোগ পর্বতমালার চুড়োর দিকে তাকাচ্ছিল। টেবিলে, তার সামনে ছিল খানিকটা পান-করা মদের বোতল।

মদ দেখে বুড়োর জিভে জল এসে পড়ল। সে ড্রাইভারদের দিকে আড়চোখে তাকাল। ড্রাইভাররা সাধারণত দরাজ লোক। তা ছাড়া এরা আবার চেনাও। কিন্তু মদে উত্তেজিত অবস্থায় ওদের এখন তার দিকে নজরই নেই। বুড়ো দমে গেল, নিজেকে নিঃসঙ্গ ও সকলের কাছে অবাঞ্ছিত বলে মনে হল।

সে ক্লান্তভাবে চোখের পলক নামিয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, তারপর গলাবন্ধ ফৌজী পোশাকের কলারের বোতাম খুলল। বছর দুয়েক আগে বাহিনী থেকে খারিজ এক সীমান্তরক্ষীর কাছ থেকে পোশাকটা সে কিনেছিল। ঘামের গন্ধওয়ালা পোশাকের ভেতর থেকে সে মাউথ অর্গ্যান—চোওর বার করল। যন্ত্রটা সাপের গায়ের মতো চকচক করছিল।

বুড়োর শুকনো ঠোঁটজোড়ার ছোঁয়া পাওয়ামাত্র চোওর থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল মধুর বিষণ্ণ ধ্বনি। বুড়ো নিজেই এ সুরের স্রষ্টা। তবে কোন কালে, কী উপলক্ষে এবং কেন সে তা রচনা করেছিল এখন আর তার মনে নেই। একটা বিষয়ে অবশ্য কোন সন্দেহ নেই যখন তার বিষণ্ণ লাগত তখন সে এই সুরটা বাজাত।

যারা শুনত, তারা সুরটার ভেতরে পেত বহুকাল আগের হারিয়ে যাওয়া যৌবন আর সুখের জন্য এক বেদনা।

ড্রাইভাররা আর পরিপাটি বেশধারী স্থানীয় লোকগুলো একের পর এক বুড়োর দিকে তাকাল, পরক্ষণেই যার যার কথাবার্তায় ও ফুর্তির জগতে ফিরে গেল। আগন্তুক লোকটি চট করে তার দিকে ফিরে তাকাল, এমন অবাক হয়ে তাকে নিরীক্ষণ করতে লাগল, যেন সূর্য তার নির্ধারিত জায়গায় না উঠে উঠেছে উল্টো দিক থেকে। তার হাতে যে মদের গেলাসটি ছিল সেটি ধীরে ধীরে সে টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল।

বুড়ো এ সবই লক্ষ্য করল। কিন্তু এখন আর না ড্রাইভারদের

দিকে, না খানিক-খাওয়া মদের বোতলের মালিক আগন্তুকটির দিকে—কারও দিকেই মন দেওয়ার মতো অবস্থা তার ছিল না। সে বাজাচ্ছিল মাথাটা সামান্য পেছনে হেলিয়ে, চিন্তামগ্ন হয়ে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল তার সামনের পর্বতমালার চুড়োগুলোর দিকে আর তাদের পেছন থেকে উঁকি-মারা তারাদের দিকে। সে ততক্ষণে ভুলে গেছে কোথায় সে আছে, ভুলে গেছে যে তার বয়স পঁয়ষট্টি বছর। ঘন মেঘ ভেদ করে ভেসে-ওঠা চাঁদের মতো তার ভাবনাচিন্তা চলে গেছে হারিয়ে-যাওয়া সুদূর কালে।

সন্ধ্যাটা ছিল রোজকার মতোই নিস্তব্ধ। শহরের একমাত্র রাস্তায় গাড়ির ঘরঘর আওয়াজ থেমে গেছে, লোকজনের কোলাহল ও কর্মব্যস্ততার ধ্বনি শান্ত, কেবল অবিরাম কলতান তুলে অনতিদূরে ছুটে চলেছে গুন্ত্ নদী। উঁচু শৈলমালার ওপার থেকে হলুদরঙা থালার আকারের চাঁদ জ্বলজ্বল করে উঠছে। চাঁদের আলোয় ঝকঝক করতে লাগল পাহাড়ের চুড়োগুলো।

এই অপূর্ব শান্ত রাতে চোওরের বিষণ্ন সুর মায়াজালের মতো মনে হল, তা হৃদয়কে উতলা করল, জাগিয়ে তুলল জীবনের বড় ভালো সময়ের স্বপ্ন ও স্মৃতি।

বুড়ো অনেকক্ষণ বাজাল। অবশেষে তার ঠোঁট একেবারেই শুকিয়ে যেতে সে ধীরে ধীরে চোওর আলগা করে তুলে নিয়ে পোশাকের ভেতরে বুকের কাছে লুকিয়ে রাখল। চোওর একটা তাবিজের মতো তার বলিরেখা আঁকা জরাগ্রস্ত কণ্ঠদেশে ঝুলে রইল।

বুড়ো টেবিলগুলোর ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। ড্রাইভাররা আর নিষ্কর্মা ছেলেছোকরারা নিজেদের নিয়ে মত্ত। এদিকে আগন্তুক লোকটি একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে ছিল, যেন তার মধ্যে নিজের কোন পুরনো পরিচিত লোককে চেনার চেষ্টা করছে। চোখে চোখ পড়ে যাওয়ায় লোকটা বুড়োর উদ্দেশে অমায়িক হাসি হাসল। বুড়ো সেটাকে আমন্ত্রণ বলে ধরে নিল, সে হেলেদুলে আগন্তুকের দিকে এগিয়ে গেল।

'আপনি কি দুশান্‌বে থেকে?' আগন্তুক যুবকটির দিকে নোংরা হাত বাড়িয়ে দিয়ে সে ফারসীতে জিজ্ঞেস করল। লোকটা জোরে ওর করমর্দন করল, তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে আবার হাসল। 'তা হলে আপনি কির্গিজ?'

যুবক মাথা নাড়ল, বিনীতভাবে তাকে চেয়ার এগিয়ে দিল। বুড়ো ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল।

'আপনি বেশ চোওর বাজান,' যুবক তাকে প্রশংসা করে বলল।

'ও কিছু নয়...' বুড়ো হাত নাড়িয়ে তাচ্ছিল্যের ভাব করল। সে আড়চোখে মদের বোতলের দিকে তাকাল।

যুবক গাঢ় মদ ঢেলে গেলাস কানায় কানায় ভরে দিল। বুড়োর চোখজোড়া চকচক করে উঠল, পরিপূর্ণ কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে সে আগন্তুকের দিকে তাকাল।

লোকটা হেসে ইঙ্গিতে পানের আমন্ত্রণ জানাল। বুড়ো পান করল। তার পেটে তখনও খাওয়া পড়ে নি। ঠাণ্ডা শিরশিরে মদ মুহূর্তের মধ্যে তার ওপর কাজ করল। তার মেজাজ চাঙ্গা হয়ে উঠল।

'আপনি যখন কির্গিজিয়া থেকে—তার মানে—মুর্গাবে যাচ্ছেন, আপনি মাস্টারি করেন,' বুড়ো দৃঢ়তার সঙ্গে বলল।

যুবক সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল।

'আপনি কী করে আন্দাজ করলেন?' অতঃপর সে জিজ্ঞেস করল।

'জানি। কির্গিজিয়া থেকে মুর্গাবে কেবল মাস্টাররাই যান।'

বুড়ো ধীরে ধীরে গেলাসটা বোতলের দিকে এগিয়ে দিল। আগন্তুক বাকি মদটা তাতে ঢেলে দিল।

'ধন্যবাদ,' বুড়ো বলল। 'ধন্যবাদ।'

সে এই ঔদার্যের বড় তারিফ করল।

এমন সময় নদীর ওপারে পাহাড়ের গায়ে লাগোয়া আফগান পল্লীতে হাঁকডাক করতে করতে ঢুকল একটা গাধা। যুবক গাধার ডাকে আকৃষ্ট হয়ে ঘাড় ফেরাল, অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে দেখতে

লাগল পল্লীটি, বাড়িঘরের জানলার ওপর চাঁদের দীপ্তি আর চাঁদের আলোয় পাহাড়ের বহু নীচে বিতাড়িত ছায়া।

'এখানে কী চমৎকার!' অবশেষে বুড়োকে উদ্দেশ্য করে সে বলল। বুড়ো ততক্ষণে খালি গেলাস টেবিলে রেখে দিয়ে ঠোঁট মুছছে। সে কোন কথা না বলে লোকটার দিকে তাকাল। যুবকের কচি, সুন্দর মুখে বলিরেখার লেশমাত্র নেই। এ মুখ তার ভালো লাগল।

'মুর্গাবে আরও ভালো,' সে স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো বলল, 'সেখানে আছে কারাকুল হ্রদ... তাতে এই বড় বড় মাছ, আর পাড়ে থাকে বুনো হাঁসের দল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুনো। অনেক, অনেক হাঁস। অগুন্তি। ওরা বালির ভেতরে ডিম পুঁতে রাখে। তুমি যদি বালি খুঁড়ে ডিম বার কর, তা হলে কালো মেঘের মতো ঝাঁকে ঝাঁকে তোমার মাথার ওপর পাক খেতে থাকবে, চিৎকারে আকাশ বাতাস ফাটিয়ে দেবে, ওপর থেকে তোমাকে ঘা মারতে চেষ্টা করবে... আঃ!' বুড়ো আচমকা চুপ করে গেল। মদ ততক্ষণে তাকে বেশ ধরেছে।

'কারামশো!' চৌকাট থেকে স্থূলাঙ্গিনী রাঁধুনি তাকে ডাকল।

বুড়ো তার দিকে ফিরে তাকাল।

'এসো খেয়ে যাও,' মেয়েলোকটি বাদাখশানের তাজিক ভাষায় বলল।

বুড়ো তার কথার কোন উত্তর দিল না। সে আবার আগন্তুকের দিকে তাকাল। লোকটার ভাবনাচিন্তাহীন কচি মুখ এবারেও তার মনে ধরল। সে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে ভারিক্কি চালে ক্যান্টিনের কাউন্টারের দিকে পা বাড়াল। কাউন্টারের মেয়েটি দিনের আদায় হিসাব করছিল।

'মুবারো!' বুড়ো উসখুস করে বলল।

'কী চাই তোমার?' কাউন্টারের মেয়েটি তার দিকে না তাকিয়েই জিজ্ঞেস করল।

'আমাকে দুটো গেলাস ঢেলে দাও দেখি। ধারে।'

'না। আগে পুরনো ধার শোধ কর বাপু।'

'মুবারো!'

'না। তা ছাড়া অনেক রাত হয়ে গেছে। এখন বন্ধ করছি।'

বুড়ো পিছু ফিরে তাকাল। ড্রাইভারের দল আর স্থানীয় ছেলেছোকরারা চলে গেছে। আগন্তুক নদীর তীর ও আফগান পল্লীর দিকে তাকিয়ে ছিল।

'মুবারো! অতিথিকে ত কিছু খাওয়াতে হয়। ঢাল না!'

'না, বলে লাভ নেই, কারামশো।'

'কাল মাইনে থেকে আগাম পাব।'

'না।'

কাউণ্টারের ওপর এঁটো মদসুদ্ধ যে গেলাস ছিল বুড়ো কাঁপতে কাঁপতে সেটায় চাপ দিল।

'মুবারো!'

বুড়ো আবার আগন্তুকের দিকে তাকাল। লোকটা তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকল। গেলাস যথাস্থানে রেখে দিয়ে বুড়ো তার কাছে ফিরল।

'আপনি কি আরও মদ খেতে চান?' সে তাকে জিজ্ঞেস করল।

'ওর কাছ থেকে কি আর আদায় করা যাবে?' বুড়ো দাঁত কড়মড় করে বলল, তারপর আবার কাউণ্টারের মেয়েটার দিকে ফিরে মরিয়া হয়ে অনুনয়ের সুরে ডাকল: 'মুবারো!'

'ছেড়ে দিন ওকে, আপনার আর খাওয়া ঠিক হবে না, বেশি হয়ে যাবে,' লোকটা বলল। 'আসুন, আপনার কাছ থেকে বিদায় নিই,' এই বলে সে হাত বাড়াল: 'আপনার মঙ্গল হোক।'

'আমার নাম কারামশো,' আগন্তুকের করমর্দন করতে করতে বুড়ো হড়বড় করে বলতে লাগল, যেন তার ভয় হচ্ছিল পাছে তার কথা সমস্তটা না শুনেই যুবক চলে যায়। 'আমাদের খারোগে আবার এলে অবিশ্যিই আমার খোঁজ করবেন। জিজ্ঞেস করবেন কারামশো, খারোগের যে কোন তাজিক বলে দেবে...'

যুবক মাথা নাড়াল, মৃদু হাসল। তারপর সে বলল:

'জানেন, আপনার কারাকুল যদি রূপকথা না হয়ে সত্যি সত্যিই থেকে থাকে, তা হলে আমি সেখানে নিশ্চয়ই যাব।'

উত্তরের অপেক্ষা না করে সে মুখ ঘুরিয়ে বাগানের অন্ধকারের ভেতরে মিলিয়ে গেল।

বুড়ো কিছুক্ষণ তাকে দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করল।

ক্যান্টিন আর কাউন্টার ইতিমধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে। রাঁধুনি আর কাউন্টারের মেয়েটা বাড়ি চলে গেছে। বরাবরের মতো আজও বুড়ো একা বাগানে রয়ে গেল।

"সবাই চলে গেল," সে আপন মনে বলল, "কেবল তুই পড়ে রইলি। তুই বরাবরই পড়ে থাকিস..." একটা হাড়জিরজিরে কালো কুকুর ছুটে এলো। কুকুরটা রোজই ক্যান্টিন বন্ধ হওয়ার পর এখানে আসে। রান্নাঘরের পেছন থেকে হাড় চিবুনোর কড়মড় আওয়াজ শোনা গেল। "তুই যাস না কেন?" বুড়ো নিজেকে জিজ্ঞেস করল। "তোমার বাড়ি আছে ত? মনে কিছু করো না... বাড়িতে অবিশ্যিই না। অন্য কোথাও। দূরে। এই ধর না কেন কারাকুলের হাঁসগুলোর কাছে... কোথায়?"

বুড়ো নিজের প্রশ্নেই আঁতকে উঠল। তিরিশ বছর হল সে কারাকুল দেখে নি।

মাঝে মাঝে তার কথা ওর মনে হত বটে, কিন্তু যে কারণেই হোক সেখানে যাওয়া তার হয়ে উঠল না।

কারাকুল — তার যৌবনের সরোবর। আর যৌবন তার কেটে গেছে বহুকাল হল।

এটা ঠিক যে সেখানে, হ্রদের একেবারে পাড়ে বালির টিলার ওপর আছে তার প্রথম এবং শেষ স্ত্রীর কবর। পঁচিশ বছর বয়সে সে মারা যায়।

অন্তত তার খাতিরেও যাওয়া যেতে পারে।

বুড়োর বয়স যখন একটু কম ছিল তখন প্রায়ই ছুটি যত এগিয়ে আসত ততই বেশি করে তার মনে পড়ে যেত কারাকুলের কথা, আর

রাতে স্বপ্নে দেখত পাড়ের কাছে বালির টিলার ওপর নিঃসঙ্গ কবরটি ও সাদা মেঘের মধ্যে উড়ন্ত বুনো হাঁসের দল। তার ইচ্ছে হত কারাকুলে যেতে। কিন্তু যাওয়া আর হয়ে উঠল না।

সে তার ছুটি সচরাচর কাটিয়ে দিত চায়ের পেয়ালা নিয়ে খারোগের চাখানায় কিংবা ছিপ নিয়ে গুন্ত্ নদীর তীরে।

শেষ কয়েক বছর হল সে ছুটি নেওয়া একেবারেই বন্ধ করে দেয়। ক্যাণ্টিন ম্যানেজার তাকে বলে যে সে চাইলেই ছুটি পাবে। এবারে তা হলে সে নেবে। অবশ্যিই নেবে। কালই। কালই ছুটি নেবে, চেপে বসবে ওশগামী কোন একটা গাড়িতে। ড্রাইভাররা সব তার চেনা। হয়ত বিনি পয়সায় নিয়ে যাবে। আর যেতে হবে ত তাকে চারশ কিলোমিটারের বেশি নয়। সুতরাং সে আবার এসে পড়বে কারাকুলে, বুনো হাঁসদের হ্রদের ধারে, তার জীবনের সেরা দিনগুলির স্মৃতিবিজড়িত হ্রদের ধারে।

বুড়ো উঠে পড়ল। লম্বা লম্বা ঘাসের মধ্য দিয়ে খরগোসের পায়ে-চলা-পথের মতো সরু যে পথটা বাগান থেকে চলে গেছে তা ধরে বাড়ির দিকে রওনা দিল।

সে থাকত বাগানের কাছাকাছি। বুড়ো মরচে-ধরা তালা নিয়ে অনেকক্ষণ খুটখাট করল, শেষকালে দরজা খুলল, ধীরে ধীরে চৌকাট পেরোল।

গোটা গ্রীষ্মকালের মধ্যে সে একবারও এখানে আসে নি। তাই এখানে সবই ফাঁকা ফাঁকা আর মরা মরা—যেন যাদুঘর, ঠাণ্ডা আর অন্ধকার। ধুলোপড়া জানলার ফাঁক দিয়ে ঘরে এসে পড়েছে চাঁদের আলো, তাতে আলোকিত হয়ে উঠেছে বুড়োর একমাত্র দামী জিনিস—তার মৃত স্ত্রীর ফ্রেমে বাঁধানো ছবি। ছবিটা আগে ছিল বিলকুল খুদে, বুড়ো ওটাকে বুক পকেটে একটা ছোট্ট নোট বইয়ের মধ্যে বয়ে বেড়াত। আজ থেকে তিন বছর আগে জানাশোনা এক সীমান্তরক্ষী-অফিসার তার অনুরোধে ছবিটা বড় করে দেন।

'আমাকে ক্ষমা কর,' চৌকাট থেকে সে ছবিটার উদ্দেশে বলল। 'আমি আজকাল একেবারেই বাড়িতে থাকি না। রাগ কর নি ত?'

ছবি নীরব। সে চিরকালই নীরব।

বুড়ো ছবির দিকে এগিয়ে এসে সন্তর্পণে তার ওপর থেকে ধুলো ঝাড়ল। আনাড়ির মতো পা ফাঁক করে ছবির সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, তারপর পকেট থেকে দেশলাই বার করে উনুনের কাছে ঝোলানো বাতিটা জ্বালাল।

ঘরে ম্যাটমেটে আলো ছড়িয়ে পড়ল।

সবচেয়ে প্রথমে বুড়োর চোখ পড়ল পেরেকে ঝোলানো বন্দুক আর কার্তুজের থলের ওপর, তারপর শতচ্ছিন্ন বিছানা, ধুলোপড়া বাসনপত্র এবং পরে বাকি সব জিনিসের ওপর।

বুড়ো ধীরেসুস্থে বন্দুকটার দিকে এগিয়ে এলো পেরেক থেকে ওটা খুলে নিল। ব্রিচ্ ব্লক খুলে বার করে আলোয় নল দেখল। নোংরায় ভর্তি। বন্দুকের গায়ে সাফ করার জন্য যে রড আটকানো ছিল, বুড়ো সেটাকে টেনে বার করল, ছেঁড়া তোশক থেকে খানিকটা তুলো ছিঁড়ে নিয়ে রডের আগায় জড়াল।

দেখতে দেখতে বন্দুকটা পরিষ্কার ঝকঝকে হয়ে উঠল, আগের জায়গায় তাকে ঝোলানো হল।

তারপর বুড়ো অনেকক্ষণ ধরে টোটায় বারুদ ঠাসতে লাগল। শেষে ক্লান্তিতে হতে পারে, কিংবা পান করার দরুনও হতে পারে সে কাত হয়ে পড়ে গেল এবং এইভাবে আধবসা অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়ল।

তার ঘুম ভাঙল সূর্যের কিরণ ঘরের মধ্যে এসে পড়তে। শরীরটা ভার ভার লাগছিল, ভোঁতা ব্যথায় টনটন করছিল। গলা শুকিয়ে গেছে, বুকের মধ্যে একটা শূন্যতা।

কার্তুজ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে আছে দেখে বুড়ো অবাক হল। কিন্তু পরে সব কথা তার মনে পড়ল। তার ঠোঁটে তিক্ত হাসির রেখা দেখা দিল।

খানিকক্ষণ বাদে সে উঠে দাঁড়াল, দরজায় তালা দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল।

সূর্য ইতিমধ্যে ওপরে উঠে গেছে, রাস্তায় রাস্তায় প্রাণচাঞ্চল্য শুরু হয়ে গেছে।

বুড়ো তাকাতে দেখতে পেল ওপারে আফগান পল্লীতে একটি মেয়ে গাধাকে লাগাম ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। পরক্ষণেই বুড়ো সশব্দে হাই তুলে শিশিরভেজা পায়ে-চলা-পথ ধরে বাগানের দিকে যাত্রা করল।
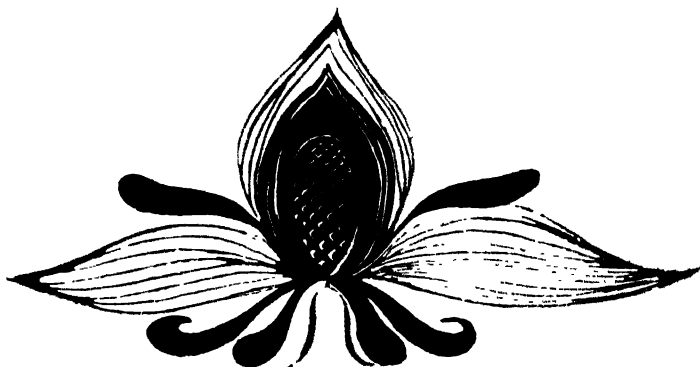
বেকসুলতান জাকিয়েভ

আমার দাদা—আমার ছোট

আমাদের বাড়িতে একটা পোর্ট্রেট ঝুলছে। আমার মনে আছে সেই ছোটবেলা থেকে এটাকে দেখে আসছি। প্রথমে ছিল ছোট, মোটে আমার হাতের তালুর সমান ফোটো। চোন-আতা* ওটাকে নিজের তিন খোপওয়ালা মনিব্যাগের ভেতরে বয়ে বেড়াতেন। মনিব্যাগটাকে আমি সাধারণ ছোট্ট এক মনিব্যাগ বলেই জানতাম, সেই সঙ্গে এমনও বিশ্বাস ছিল যে ওটা নিঃসন্দেহে কোন যাদুশক্তির অধিকারী এবং চোখের পলকে ঝুড়ি বনে যেতে পারে। এই সম্পদের অধিকারী হতে আমার বড় ইচ্ছে হত। কিন্তু চোন-আতার কাছে ওটা আরও বেশি দরকারী ছিল: মনিব্যাগটার মধ্যে তিনি রাখতেন নানা রকমের রসিদ, দলিল আর অসংখ্য হলদেটে কাগজের টুকরো। আর সবচেয়ে গোপন

* চোন-আতা—ঠাকুর্দা কিংবা তাঁর সমগোত্রীয় কেউ।

খোপটিতে অতি প্রিয় স্মৃতিচিহ্নের মতো সযত্নে রাখা ছিল একটি ফোটো, যা থেকে পরে তৈরি হয় দেয়ালে টাঙানো এই পোর্ট্রেটটি। মাঝে মাঝে চোন-আতা ফোটোটা বার করে নিয়ে সন্তর্পণে শান-পাথরের মতো রুক্ষ খসখসে আঙুল দিয়ে তার দোমড়ানো কোনাগুলো পাট করতেন। কখন-সখন কোন সম্মানীয় অতিথিকে ফোটোটা দেখিয়ে বলতেন: 'এ হল আমার ছেলে,' আর কোন কথা না বাড়িয়ে সঙ্গে সঙ্গে ওটাকে লুকিয়ে ফেলতেন, অন্য কোন প্রসঙ্গ নিয়ে কথাবার্তা শুরু করে দিতেন। এই স্বল্পভাষণের পেছনে বিশাল উদার হৃদয়ের ভেতরে চোন-আতা গোপন করে রাখতেন এক অপ্রকাশিত গূঢ় রহস্য, গভীর পিতৃস্নেহ, পুত্রের জন্য গর্ব, বেদনা, মনস্তাপ। 'ছেলে'—বাপের মুখের এই পবিত্র শব্দটি চোন-আতা এমন ভাবে উচ্চারণ করতেন যে সকলে কয়েক মিনিটের জন্য চুপ করে যেত। আর এই নীরবতার মধ্যে উঁচুদরের কিছু একটা ছিল। এর সঙ্গে যে ভাবনা জড়িত ছিল তা আমি বুঝতে পারলাম কেবল তখনই যখন একটু বড় হলাম। খুব ছোটবেলায় আমার মা-বাবা মারা যান। চোন-আতা আমার এবং আমার বড় ভাইয়েরও বাবার জায়গা নেন।

এক

দশ ক্লাসের পড়াশুনা শেষ করার পর আমি ইনস্টিটিউটে ভর্তি হওয়ার জন্য ফ্রুঞ্জেতে যাওয়ার উদ্যোগ করলাম। চোন-আতার কাছে আমি এখন পুরোপুরি স্বাবলম্বী মানুষ। তিনি নিজের সমস্ত কাজকর্মের ব্যাপারে আমার সঙ্গে পরামর্শ করতেন। আমি বাড়ি ছাড়ার সময় চোন-আতা মনিব্যাগ থেকে ফোটো বার করে আমাকে দিলেন, ছোটবেলার মতো এবারে তিনি আর আমার কপালে চুমো দিলেন না, বিদায়বাণী জানিয়ে করমর্দন করলেন। নিজের জন্য আমার মনে মনে বেশ গর্ব হচ্ছিল।

ফোটোটা চোন-আতা আমাকে অমনি অমনিই দেন নি। তিনি

আমাকে কিছু বুঝিয়ে না বললেও আমি বুঝলাম যে তাঁর মতে ওটা অতি মূল্যবান পারিবারিক সম্পদ, তাই বংশ পরম্পরায় তা হস্তান্তরিত হওয়া উচিত। শহরে আমি পোর্ট্রেটটাকে বড় করিয়ে ওয়ালনাটের ফ্রেমে কাচ দিয়ে বাঁধাই করালাম। এখন ওটা ঝুলছে আমাদের গাঁয়ের বাড়িতে, সবচেয়ে ভালো জায়গায়।

আমি যখন গাঁয়ে আসি তখন প্রথম যে জিনিসটার দিকে তাকাই তা হল আমার বড় ভাইয়ের ছবি। আমার মনে হয় সে ছেলেমানুষী বিস্ময়ে বিস্ফারিত বড় দুচোখ মেলে আমার দিকে চেয়ে আছে; আমার কাছে তার দৃষ্টির ভেতরে যেন লুকিয়ে আছে এক অবর্ণনীয় আকর্ষণী শক্তি। এই ছবিতে সে একেবারেই ছোট, তখনও জীবনকে দেখা তার হয়ে ওঠে নি, সত্যিকারের দুঃখকষ্ট সে ভোগ করে নি, তার চোখের দৃষ্টি তখনও কঠিন হয়ে ওঠার অবকাশ পায় নি। আমি মনে মনে কল্পনা করার চেষ্টা করি পরে তার দৃষ্টি কী রকম হল। সম্ভবত জীবনের অভিজ্ঞতা তার মুখ থেকে শিশুর সারল্য মুছে দেয় আর সে মুখ হয়ে দাঁড়ায় রুক্ষ হয়ত বা ক্রূর। আমার তা-ই মনে হয়। কিন্তু 'মনে হওয়া' এক কথা, আর সম্পূর্ণ অন্য কথা হল বাস্তবে কী হল। স্মৃতি জিনিসটাই কুটিল। আমার স্মৃতিতে অনিবার্যভাবে জেগে ওঠে কিশোরের সরল মুখ।

দুই

আমার বয়স তখন পাঁচও নয়। আমি আর চোন-আতা পাহাড়ী গাঁয়ে ঘোড়ার পাল চরাই। পাহাড়তলির ছোট এক সমভূমিতে পাঁচ-ছয়টা তাঁবু। এটাই হল আমাদের গাঁ। পাশ দিয়ে যেন দুই বান্ধবীর মতো হাত ধরাধরি করে ছুটে চলেছে দুটি ছোট নদী। তাদের মাঝখানে ঘন সবুজ ঘাসে ঢাকা এক ফালি জমি। এই দুই নদীর অন্য পারে, একেবারেই কাছে ভেড়ার পালকদের গাঁ। কিন্তু দুই গাঁয়ের ঘনিষ্ঠ মেলামেশায় অন্তরায় হয়ে আছে নদী দুটো। আমরা একে

অন্যের কাছে যাতায়াত করতে পারি না ঠিকই, কিন্তু দূ গাঁয়ের কোথায় কী হচ্ছে তা আমরা যেমন দেখতে পাই তেমনি ওরাও দেখতে পারে। ঐ ত ওদের ওখানে কারা যেন পশুপাল তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। একটা তাঁবুর পাশে পাঁচ-ছয়জন মেয়েমানুষ তাঁবুর এক জায়গায় কম্বলের ঢাকনা উঠিয়ে দিয়ে সেখানকার দড়ির বাঁধনের গায়ে এঁটে ফাঁসদড়ি পাকাচ্ছে। টাটানো সূর্যের আলোয় দাঁড়িয়ে থাকা সহজ নয়। বিশেষ করে সূর্য যখন মাঝ আকাশে তখন তা ভয়ঙ্কর টাটায়। এই সময় প্রাণীরা সকলেই ছায়ায় গা ঢাকার চেষ্টা করে। এমনকি যারা তাঁবুতে থাকে তারাও তাঁবুর মাথার ওপরকার কাঠের গোল ঢাকনাটা টেনে দেয়। মাদী ঘোড়াগুলো গরম সহ্য করতে না পেয়ে নদীতে নেমে পড়ল, জলে মুখ ডুবিয়ে থেকে থেকে অলসভাবে মাথা ঝাড়তে থাকে। আর ওপরে, একটা ছাইরঙা গোরু ডাঁশের কামড় থেকে রেহাই পাওয়ার উদ্দেশ্যে টিলা, খাত কোনটাই লক্ষ্য না করে দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে চলেছে: গরমে অবসন্ন যে সব ঘোড়ার বাচ্চা বাঁধা অবস্থায় ছিল তাদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলে গোরুটা তাঁবুর দিকে ধেয়ে গেল, নিজের চওড়া পাঁজরাগুলো তাঁবুর গায়ে এমন ভাবে ঘষতে লাগল যে তার কাঠামো মড়মড় করে উঠল। একটু দাঁড়িয়ে থেকে গোরুটা তার নিজের ছায়ার গায়ে চাঁট মারল, তারপর লেজ উঁচিয়ে নদী বরাবর নীচের অববাহিকার দিকে ছুটল।

এই সময় আমাদের তাঁবুর কাছে ভাই ঘোড়ার পিঠে জিন চাপাচ্ছিল। বোঝাই যাচ্ছিল যে সে দূর অঞ্চলের ঘোড়ার পাল দেখতে চলেছে। চামড়ার থলি টানতে টানতে বিড়বিড় করতে করতে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলেন চোন-এনে*। আমি ঘোড়ায় চড়ে যেতে বড় ভালোবাসি; তাই সাগ্রহে ভাইয়ের আশেপাশে ঘুরঘুর করতে থাকি, তাকে কোন না কোন ভাবে সাহায্য করার চেষ্টা করি এই আশায় যে হঠাৎ হয়ত সে নিজে যাওয়ার সঙ্কল্প পাল্‌টে আমাকে পাঠাবে।

চোন-এনে — ঠাকুমা।

ভাই যখন ঘোড়ার পিঠে জিন চাপানো প্রায় শেষ করেছে তখন নদীমুখো পায়ে-চলা-পথে দেখা গেল এক তরুণী আর এক সদ্যাবিবাহিতা যুবতীকে। তাদের কাঁধে বাঁক। তারা কুমড়োর খোলে তৈরী পাত্র ভরে জল নিয়ে ফিরছিল। চোন-আতা ও চোন-এনের কথা থেকে আমি জানতে পারি যে এই তরুণীটি বড় ভালো ও বুদ্ধিমতী, তায় আবার সুন্দরী।

আমাদের গাঁয়ের মেয়েরা সচরাচর পাঁচটা ছোট ছোট বিনুনি গাঁথে। অথচ এই মেয়েটির কাঁধে দুলছে দুটো কালো লম্বা লম্বা বিনুনি। লম্বা ঝুলের পোশাকটা সুস্পষ্ট করে তুলছে তার ছিমছাম নমনীয় গড়নটি। হাতকাটা ব্লাউজ, পুঁতির চাঁদি টুপি, হাই বুট—সবই তার বেশ খাপ খায়, তাকে মানায়। কিন্তু তার যেটা সবচেয়ে সুন্দর তা হল মুখ। মনে হয় তা যেন কোন এক বিশেষ, উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করে। চোন-এনে যখন আমাকে রূপকথা বলেন তখন সেখানে সুন্দরী মেয়েদের কথা শুনতে শুনতে আমি মনে মনে কল্পনা করি এই মেয়েটির মুখ। সে যখন হাসে তখন তার গালে টোল পড়ে, দুচোখে ঝরে পড়ে দরদ, তার দিকে তাকাতে তাকাতে আমি অবর্ণনীয় আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়ি। আমার ইচ্ছে হত ওর সঙ্গে ছুটোছুটি করি, লাফালাফি করি, ঘুরপাক খাই, চোর-পুলিশ খেলি। আর ও যদি কখনও আমার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করত তাহলে আমি বেড়াল ছানার মতো ওর কাছ থেকে আদর কাড়তে থাকতাম।

মেয়েটির ওপর থেকে চোখ না ফিরিয়ে ভাই ঘোড়ার জিনের বেল্ট কষে বাঁধতে থাকে। তার মুখে বিমূঢ়তা ও আনন্দের ভাব লক্ষ্য করা গেল। এই মেয়েটিকে দেখলে সব সময় তার ভাবান্তর উপস্থিত হয়। তার চোখে প্রকাশ পায় ফুলকি আর মনে হয় মুখে ফুটে ওঠে তার তরুণ হৃদয়ের সমস্ত পুলক।

মেয়েটি এমন ভাব করল যেন তাকে লক্ষ্য করছে না, কিন্তু পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় অলক্ষ্যে আড়চোখে আমাদের দি[illegible] [illegible] [illegible] তার ঠোঁটের কোণে খেলে গেল হাসি।

ভাই বিচলিত হওয়ার ভাব না করে যথারীতি ঘোড়ার জিন আঁটতে লাগল। আমার মনে হল যে এই হাসি আমার উদ্দেশে, তাই জবাবে আমি গদগদ হাসি হাসলাম, চোখও টিপলাম। তা দেখে ভাই আমার মাথার টুপিটা চোখের ওপর টেনে দিল আর জিনের বেল্‌ট এমন কষে আঁটল যে ঘোড়াটার গোটা শরীর একেবারে বেঁকেই গেল। তারপর আমার হাত থেকে চাবুকটা ছিনিয়ে নিয়ে ঘোড়ার চেপে বসল। আমি রাগে ঠোঁট ফোলালাম, সরে গেলাম। নববধূ এমন গম্ভীর চালে মাপা মাপা পা ফেলে চলছিল যে তার বিনুনির ঝোলানো অলঙ্কারে টুংটাং আওয়াজ উঠছিল। মেয়েটি নববধূর পেছন থেকে তাকাতে তাকাতে আমাকে উৎসাহ দিয়ে হাসল, যেন বলতে চায়: 'আমি তোমাকে সব ছেলেদের চেয়ে বেশি ভালোবাসি ভাই, তোমার দুষ্টুমিতে আমি বড় মজা পাই।' কিন্তু আমার এ-ও মনে হল: 'তা হলেও তোমার জন্যেই দাদা আমাকে ঘোড়া চরানোর মাঠে পাঠাল না,' আমি তাই মেয়েটিকে জিভ দেখিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিলাম। একটু লক্ষ্য করার পর দেখলাম সে কেন যেন রাগ করল না।

আকাশে অনেক উঁচুতে উড়ছিল একটা সোনালি ঈগল, আমার মনোযোগ এবারে গিয়ে পড়ল তার ওপর। পাখিটা প্রায় দেখাই যাচ্ছিল না। ওর ওড়া লক্ষ্য করতে গেলে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে হয়। তাই বলাই বাহুল্য, আমি সঙ্গে সঙ্গে আর সব কথা ভুলে গেলাম।

'দাদা, দাদা, দেখ!' মাথা পেছন দিকে হেলিয়ে আমি চেঁচিয়ে বললাম। আমার মাথা থেকে টুপিটা খসে পড়ে যাচ্ছিল, সেটাকে হাত দিয়ে চেপে ধরলাম। ভাই লাগাম টেনে ঘোড়া থামিয়ে একদৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল।

ঘোড়সওয়ার আর ঘোড়া টিলার ওপর মূর্তির মতো নিশ্চল। তাদের রেখামূর্তি পাহাড়কে আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে, দেখে মনে হয় যেন পাহাড়ের চেয়েও উঁচু। তখন আমার মনে হল আমার ভাইয়ের চেয়ে শক্তিশালী, তার চেয়ে ওপরে দুনিয়ার আর কেউ নেই। নিশ্চল মূর্তির মতো ঘোড়ার পিঠে দৃপ্ত ভঙ্গিতে

মাথা উঁচিয়ে আছে সে—ভাইয়ের এই চেহারাই আছে আমার স্মৃতিতে।

এটা হল গরমকালের ঘটনা, যখন ভাই ছুটিতে বাড়ি এসেছিল। সে পড়াশুনা করছিল টেকনিক্যাল কলেজে। আমরা জানতাম না যে এটাই ছিল তার শেষ আগমন।

তিন

জুন মাসের কাঠফাটা গরমের দিন। ভাইয়ের হাঁটু চোট খেয়ে ফুলে উঠেছে। সে জঙ্গলের ভেতরে ঝোপঝাড়ে ঢাকা এক পথের ধারে বসে ফোলা জায়গাটায় আঙুল ঘষছে। গরমে ঠোঁট শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, ক্লান্তিতে মাথা নেতিয়ে পড়ছে। ফোলাটা বাড়তেই থাকে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে দেহটা পেছনে হেলিয়ে দেয়, পিঠ ঠেকায় একটা বার্চ গাছের গায়ে। তার চোখের পলক বুজে আসে, ঢুলুনি তাকে পেয়ে বসে। এখন আর সে যন্ত্রণা টের পাচ্ছে না বললেই চলে, মাটি তার কাছে দোলনা বলে মনে হচ্ছে। ঘোরের মধ্যে সে যেন সামনে দেখতে পাচ্ছে পাহাড়ের উপত্যকা—নরম, প্রায় বাতাসের মতো ফুরফুরে নানা রঙের রেশমি কাপড়ে ঢাকা। তার দিকে ছুটে আসে একটা বাচ্চা ছেলে, ছেলেটার প্যাণ্ট হাঁটুর ওপরে গোটানো। অদ্ভুত ব্যাপার, ছেলেটা দ্রুত পা ফেলছে, অথচ এগিয়ে আসছে না। হঠাৎ সে অনুভব করল তার মুখের ওপর কার যেন ছায়া পড়েছে, সঙ্গে সঙ্গে তার ঠাণ্ডার আমেজ লাগল। সম্ভবত কেউ তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। চোখ খোলা, খুলে তাকিয়ে দেখা কঠিন, শান্তিটা ভাঙ্গতে ইচ্ছে হচ্ছে না, আর ঐ যে ছেলেটা বনের ভেতরে ফাঁকা জায়গায় খেলা করছে তাকেও ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু কারও একটা ভারী ও নির্নিমেষ দৃষ্টি যে আমাকে বিঁধছে এই অনুভূতিটাও তেমন প্রীতিকর নয়। সে জেগে উঠল, প্রথমেই যা নজরে পড়ল তা হল ধুলোমাখা একজোড়া ভারী

ফৌজী বুট। কে যেন দু পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে, তার পা দুটো মাটিতে বসে গেছে। চারদিকে যখন ফুল আর সবুজের সমারোহ তখন বুটজোড়া ধুলোমাখা কেন? ভয়ঙ্কর... সৈনিকের ভারী বুট... যুদ্ধ! যুদ্ধ চলছে। 'জার্মান নয় ত?' বুকটা ধড়াস্ করে উঠল। তা হলে কি সে বন্দী? এখনও ত যুদ্ধ করারই অবকাশ পেল না... চোখ তুলে তাকাতে সে দেখতে পেল তার দিকে উঁচিয়ে আছে বন্দুকের নল। তার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল দুজন, তারা চুপচাপ তাকে লক্ষ্য করছিল। প্রথমজন লম্বা, রোগা, মনে হয় দ্বিতীয় জনের চেয়ে বয়সে সামান্য ছোট --তার বয়স পঁচিশের বেশি হবে না। অন্য জন দাঁড়িয়ে আছে সামান্য দূরে--লোকটার চুল কটা, আকারে ছোট, মোটাসোটা, ভ্রূকুটি করে দেখছে।

'কী ভয় পেয়ে গেলে না কি হে?' রোগা লোকটা জিজ্ঞেস করল।

পরিচিত রুশ ভাষা শুনতে পেয়ে ভাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। বুক থেকে যেন পাথরের ভার নেমে গেল। ভাই দুহাতে মুখ ঢাকে, তারপর হুঁশ ফিরে আসতে মাথা তোলে।

'তোমরা কোন ইউনিটের, ভাই?' উত্তেজনায় কণ্ঠস্বরটা শোনাল অন্যরকম, চাপা, ভাঙাভাঙা।

মোটা সৈনিকটা ভুরু কোঁচকায়, কিছু না বলে থুতু ফেলে, নীচের ঠোঁট ওল্টায়।

'আর তুমি?' জবাবে পালটা প্রশ্ন করে রোগা সৈনিকটা।

ভাই উত্তর দেয়।

'আমরা অন্য রেজিমেণ্টের,' এই বলে মোটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অন্যদিকে মোড় নেয়, আরও দূরে এগিয়ে যেতে উদ্যত হয়।

'চল্!' সে রোগা লোকটাকে ডেকে বলে।

রোগা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে:

'আমরাও ভাই দলছড়া হয়ে পড়েছি।'

ভাই বার্চ গাছের সদ্যকাটা ডালের ওপর ভর দিয়ে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে উঠে পড়ল। রোগা তাকে ধরল।

'আরে কী হল? তুমি পা ফেলতে পার না না কি?'

'ও কিছু না, যা করে হোক...'

ভাই যখন পা ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে রাস্তা অবধি পেঁছিল, তখন মোটা হতবুদ্ধি হয়ে জিজ্ঞেস করল:

'তুমি কি আহত না কি?'

ভাই মাথা নাড়িয়ে অস্বীকার করল।

'তাহলে খোঁড়াচ্ছ কেন?'

ভাই বন্দুক কাঁধের ওপর তুলে নিল, ইতস্তত করে উত্তর দিল:

'সে আমি নিজেই জানি না...'

'তাজ্জব!..'

'রাতে... পড়ে গিয়েছিলাম। পাথরে লেগে হাঁটুতে চোট পেলাম,' ভাই কোন রকমে যে কথাগুলো বার করল তা প্রায় শোনাই গেল না। তার বড় লজ্জা হচ্ছিল এই ভেবে যে লড়াইয়ের ময়দানে গুলিতে আহত না হয়ে হল কিনা এক মামুলি ঘটনাচক্রে।

মোটা আবার থুতু ফেলল—মনে হয় এটা তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে: কোনকিছু পছন্দ না হলেই সে থুতু ফেলে।

এই ভাবে নিজেদের পশ্চাদপসরণরত ইউনিট থেকে দল-ছাড়া তিন সৈনিকের দেখা। ওরা ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত, বিভ্রান্ত, ফ্রণ্টে হারার ফলে ওদের মন ভারাক্রান্ত। কোন দিকে যাওয়া যায় এ ব্যাপারে ওদের কারও স্পষ্ট ধারণা ছিল না। ওরা কেবল জানত যে যাওয়া উচিত পুব দিকে। ওরা তিনজনেই চুপ—তার কারণ এই নয় যে কথা বলার কিছু ছিল না। আসলে কথা বলার মতো মনের অবস্থা ছিল না। প্রত্যেকেরই মনের ভেতরটা খচখচ করছিল, প্রত্যেকেই যার যার দুঃসহ ভাবনায় মগ্ন। এই কারণেই তারা চলছিল চুপচাপ। রোগা উঁচু কলারের আড়ালে থুতনি ঢেকে মাথা গুঁজে ভারী ভারী পা ফেলে চলছিল। তার চোখের ভাব থেকে সহজেই বোঝা যায় যে নির্দিষ্ট কোন একটি ভাবনা তাকে ভাবিয়ে তুলেছে। মোটা সৈনিকটি কোন রকম বিচার-বিবেচনায় প্রবৃত্ত না হলেও তার মুখে লক্ষ্য করা যাচ্ছিল দরুণ বিরক্তির ভাব।

সে কখনও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ছিল, কখনও বা যেন সঙ্গীদের হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার মতলবে আগে আগে ছুটে যাচ্ছিল। ভাই চোট-খাওয়া পাটা ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে ওদের পেছন পেছন চলছিল, চেষ্টা করছিল যাতে সঙ্গীদের থেকে পিছিয়ে না পড়ে।

প্রত্যেকেরই মনে হচ্ছিল যেন তাদের সামনে অন্তবিহীন দীর্ঘ পথ। তাদের মুখ আর পোশাকের ওপর এসে জমেছে গুঁড়ো গুঁড়ো ধুলোকালি, এখন তাদের দেখাচ্ছিল চলমান পাথুরে ভাস্কর্যের মতো।

মোটা থমকে দাঁড়াল, কান পেতে কী যেন শুনল। ভয়ে তার চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেল। সে বন্দুক আঁকড়ে ধরল।

'শুনছ, গুনগুন আওয়াজ হচ্ছে?' সে উৎকণ্ঠিত হয়ে বলল।

না রোগা, না ভাই—কেউই ফড়িংয়ের ঝিঁঝিঁ আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই শুনতে পেল না, কিন্তু সঙ্গীর ভয় তাদের ওপরও ভর করতে লাগল। এখন তারা পাশাপাশি দাঁড়াল, যেন অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে একে অন্যের সাহায্যপ্রার্থী। মোটা আকাশের দিকে তাকাল, কিন্তু সেখানেও কিছু চোখে পড়ল না। চারদিকে গভীর নৈঃশব্দ্যের রাজত্ব, যেমন হয় ঝড়ের আগে।

দেখতে দেখতে ফড়িংয়ের ঝিঁঝিঁ ডাকের বদলে উঠল মোটরের গোঁ গোঁ আওয়াজ। সৈন্যেরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করল, বগলের তলা ধরে ভাইকে টানতে টানতে নিয়ে গেল রাস্তার ধারের ঘন ঝোপঝাড়ের দিকে। ওদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মোটরের আওয়াজ যেন ক্রমেই বেড়ে উঠল আর ঝোপটাও যেন ওদের চটানোর উদ্দেশ্যেই সমানে দূরে সরে যাচ্ছে। ভাইয়ের চোট-খাওয়া পাটা মাটির ওপর ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে যাচ্ছিল, কখনও ঘাসে কখনও বা উঁচু জায়গায় বেধে যাচ্ছিল। যন্ত্রণায় যাতে মুখ দিয়ে চিৎকার না করে ফেলে সেই চেষ্টায় ভাই শক্ত করে ঠোঁট কামড়াল। ওরা দুজনে প্রথম পাতলা ঝোপটা বুটের তলায় পিষতে পিষতে যেদিক থেকে আওয়াজ আসছিল ভয়ে ভয়ে সেদিকে তাকাতে তাকাতে আড়ালে গা ঢাকা দেওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি পা চালাল। ভাইয়ের কাছে প্রতিটি পদক্ষেপ হয়ে দাঁড়াল মৃত্যুযন্ত্রণা। মনে হচ্ছিল যেন তার

গায়ে পেরেক ফুটছে। অবশেষে সে আর সহ্য করতে পারল না, বলে উঠল:

'আমাদের কিনা তাই বা কে জানে?'

'জলদি! জলদি!' উত্তরে সে শুনতে পেল।

ভাই ঠাণ্ডা ঘামের স্রোতে নেয়ে উঠেছে। এমন সময় মোড়ের আড়াল থেকে ধুলোর ঝড়ের ভেতরে দেখা গেল কতকগুলো গাড়ি। ওরা দুজন ভাইকে না ছেড়ে মাটি ঘেঁষে শুয়ে পড়ল। ভাই চোখে অন্ধকার দেখল। ঠোঁট কামড়ে সে কাতরে উঠল। রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখার মতো শক্তিও তার ছিল না।

'মোটরসাইক্লিস্টদের দল,' রোগার চাপা ফিসফিসানি শোনা গেল।

'স্-স্ স!' মোটা ফোঁস ফোঁস করে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে ভাইয়ের পিঠটা মাটিতে চেপে ধরল।

মোটরসাইক্লিস্টরা এগিয়ে আসছিল। তিনজনের মনে হচ্ছিল দুনিয়ায় মোটরের এই ভয়ংকর ক্রমবর্ধমান আওয়াজ ছাড়া আর কোন আওয়াজের অস্তিত্ব নেই। রুদ্ধ নিশ্বাসে তারা মাটির সঙ্গে লেপ্টে পড়ে রইল, মনে হচ্ছিল তাঁদের হৃৎস্পন্দনও যেন বন্ধ হয়ে গেছে।

মোটরসাইক্লিস্টরা ওদের পাশাপাশি চলে এলো, কোন এক মুহূর্তের জন্য তিনজনের মনে হল ওদের যেন দেখতে পেয়েছে কিন্তু দেখতে দেখতে আওয়াজ মিলিয়ে গেল, বোঝা গেল যে বিপদ কেটে গেছে। ঝোপের আড়াল থেকে দেখা যাচ্ছিল ঢালাই লোহার মূর্তির মতো মোটরসাইক্লিস্টরা টিলার ওপর দিয়ে দিগন্তের দিকে ছুটে যাচ্ছে, তারপর মিলিয়ে যাচ্ছে, যেন ঝাঁপিয়ে পড়ছে খাদের ভেতর। তিনজন তারপরও অনেকক্ষণ অবধি ধাতস্থ হতে পারল না, প্রথম উঠল রোগা লোকটা, সে ভাইয়ের পাশে গিয়ে বসল:

'জল খাবে?' উত্তরের অপেক্ষা না করে সে বেল্টটা কষে বাঁধল, জলের বোতলের ছিপি খুলে বোতলটা ভাইয়ের হাতে তুলে দিল। ভাই লোভীর মতো কয়েক ঢোক জল গিলল, হাসলও।

'কেমন একটু শ্বাস নেওয়া গেল ত?' ওভারকোটের বোতাম আঁটতে আঁটতে রোগা জিজ্ঞেস করল। 'তা শ্বাস যখন নেওয়াই হল তখন যাওয়া যাক...'

ভাই সামান্য ওঠার চেষ্টা করল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অসহ্য যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করে উঠল। মোটা সৈনিকটি তার ওপর ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হানল, গাঁক গাঁক করে বলল:

'এসো, আমার কাঁধে ভর দাও!'

তিনজনের কারোই বুঝতে বাকি রইল না যে এখন রাস্তা বরাবর যাওয়া বিপজ্জনক, তারা নিজেদের মধ্যে কোন কথাবার্তা ছাড়াই বনের দিকে রওনা দিল: কিছুক্ষণ পরে তারা লক্ষ্য করল যে-মোড়টায় আগে মোটরসাইক্লিস্টদের দেখা গিয়েছিল সেখানে এখন জার্মান সৈন্যবোঝাই বেশকিছু খোলা জীপগাড়ির আবির্ভাব ঘটেছে।

হয়ত ভাই যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছে বলে তার মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে রোগা লোকটা হঠাৎ বলে উঠল:

'আরে আমাদের ত আলাপ-পরিচয়ই হল না। ক্রাস্নভ্... আলেক্সান্দর।'

ভাইও নিজের নাম বলল। ক্রাস্নভ্ ভাইয়ের নাম আওড়ানোর চেষ্টা করল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। সে তখন মুখ টিপে হেসে বলল:

'বড় কঠিন, আমি তোমাকে শুধু সেরিওজা নামে ডাকব... সেরিওজা, কেমন? চলবে ত? তুমি বোধহয় মধ্য এশিয়ার লোক?'

'আমি কির্গিজিয়া থেকে। ইসিক-কুলের নাম শুনেছেন?'

'ভূগোলে পড়েছি।'

'তা হলে জানেন না,' ভাই বিষণ্ণ হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ভূগোল পড়ে কি আর ঢেউ দেখা যায়, পাড়ের বালুতে গড়াগড়ি দেওয়া যায়, সাঁতার কাটা যায়?

তারপর মোটা লোকটিকে জিজ্ঞেস করল:

'আপনার নাম কী?'

'বগ্‌দানিউক,' একটু থেমে মোটা উত্তর দিল। তারপর আবার দাঁতের ফাঁক দিয়ে থুতু ফেলে ভাইয়ের প্রতি পুরোদস্তুর ঔদাসীন্য দেখিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

এই এক মিনিট আগেও ভাই প্রায় উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল, কিন্তু লোকটার নিরুত্তাপ স্বরে ভাই তৎক্ষণাৎ চুপসে গেল। আবার নীরবতার রাজত্ব।

দুজনে ভাইকে ধরাধরি করে চুপচাপ চলতে থাকে। তার উপস্থিতি বগ্‌দানিউকের কাছে অসহ্য ঠেকছে ভেবে ভাইয়ের যেন কেমন কেমন লাগছিল। প্রায়ই সে লোকটার শত্রুতাপূর্ণ দৃষ্টি বোঝার চেষ্টা করে, সে দৃষ্টি যেন বলছে: কী কুক্ষণেই না তোর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, এতক্ষণে আমরা শালা কোথায় চলে যেতাম, তুই কিনা আমাদের হাত-পা বেঁধে দিলি। এমন কি ভাইয়ের এ-ও মনে হতে লাগল যে লোকটা তার হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার উপযুক্ত অবসর খুঁজে বেড়াচ্ছে। আবার এমনও ত হতে পারে যে এটা তার মনে হচ্ছে মাত্র? এই লোকটাই ত ভাইকে দেখে, তার পায়ের আঘাতের কথা যখন সে বিন্দুমাত্র জানত না, তখনও মুখ গোমড়া করে ছিল। সৈনিক নিজের ইউনিট ছাড়া হয়ে পড়েছে, আমাদের সেনাবাহিনী যে শত্রুর প্রবল আক্রমণ মোকাবিলা করতে না পেরে পিছু হটছে তার জন্য মনে মনে কষ্ট পাচ্ছে। কিন্তু এরকম চিন্তাভাবনা সত্ত্বেও ভাইয়ের কেবলই মনে হচ্ছিল যে তার উপস্থিতি বগ্‌দানিউকের সবচেয়ে বেশি বিরক্তি উৎপাদন করছে। সে যে ওদের পক্ষে একটা ঝামেলা হয়ে দাঁড়িয়েছে৲ এটা উপলব্ধি করে ভাই দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ক্রাস্‌নভ্‌ তার দীর্ঘশ্বাসকে নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করল। তার মনে হল ভাই হয়রান হয়ে পড়েছে, তাই থমকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল:

'জিরোতে চাও?'

ভাই উত্তর দেওয়ার অবসর পেল না, ইতিমধ্যে বগ্‌দানিউক নিজের হাত সরিয়ে নিয়ে মুখে অসন্তোষের ভাব নিয়ে একপাশে সরে দাঁড়িয়েছে। ক্রাস্‌নভ চটপট গুটানো ওভারকোটের পাক খুলে সেটাকে

মাটির ওপর ছুঁড়ে দিল, সাবধানে ভাইকে তার ওপর নামিয়ে রাখল। সে নিজেও ওভারকোটের এক প্রান্তে বসল, রুমাল বার করে মুখের ঘাম মুছল। রুমালটা চোখের পলকে একটা নোংরা পিণ্ড হয়ে গেল। ক্রাস্নভ সেটাকে ঝোপের মধ্যে ফেলে দিয়ে ধীরেসুস্থে কাগজে মাখোর্কা তামাক পাকাতে লাগল।

'তামাক খাবে?'

ভাই মাথা নেড়ে অসম্মতি জানাল।

'সূর্য অস্ত যেতে চলেছে,' খবরের কাগজের টুকরোর একটা ধারে থুতু লাগাতে লাগাতে সে বলল, তারপর অনেকটা যেন প্রসঙ্গতই জিজ্ঞেস করল, 'ফৌজে তোমার কখন ডাক পড়ে?'

'উনচল্লিশে,' তারপর মাথাটা দুহাতের ওপর ঠেকিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে যোগ করল, 'যখন ফিন যুদ্ধ শুরু হয়।'

চার

ভাই যেদিন ফৌজে যায় সেই দিনটি আমার বেশ মনে পড়ে। ভোরের আলো দেখা দিতে না দিতে চোন-এনে উঠে পড়ল, মাখন, ননী আর ঘোড়ার দুধের বোঝা নিয়ে গ্রামের দিকে রওনা দিল: কারও অন্ত্যেষ্টি উপলক্ষে ভোজ, না সুন্নৎ- ঐরকমের একটা কিছু ছিল। আমি আর চোন-আতা ঘোড়ার পাল নিয়ে পাহাড়ে রয়ে গেলাম। চোন-এনে'র শিগগিরই ফেরার কথা। কিন্তু দুপুর হয়ে এলো, অথচ তার পাত্তা নেই। আমি কয়েক বার তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে দূরে, পথ যেখানে কালো পাহাড়ের পাশ দিয়ে চলে গেছে সেদিকে ভালো করে লক্ষ্য করতে লাগলাম কোন ঘোড়সওয়ারকে এগিয়ে আসতে দেখব এই আশায়। অবশেষে কালো পাহাড় ঘন কুয়াসায় ঢাকা পড়ে গেল, পথ আর দেখা গেল না। দুপুরের খাওয়ার সময় বৃষ্টি নামল, সে বৃষ্টি পরে গুঁড়ি গুঁড়ি বর্ষণের ঘন পর্দার রূপ নিল।

আমাদের মনে হল এই বৃষ্টিই চোন-এনে'র বিঘ্ন ঘটিয়েছে।

ঘোড়াগুলোকে একটা সরু খাতের ভেতরে খেদিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর আমি আর চোন-আতা তাঁবুতে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। চোন-আতার মাথায় চাঁদি টুপি, গায়ে ওপরের পোশাক, তিনি হাতা গুটিয়ে, বসে বসে ভাইয়ের জন্য জিন তৈরি করছিলেন। করার মতো কিছু না পেয়ে আমার মেজাজ খারাপ লাগছিল। আমি তাই এ কাজ ও কাজ হাতড়ে বেড়াচ্ছিলাম। চাপা, আধা অন্ধকার তাঁবুতে আমার বিরক্তি ধরে যাচ্ছিল। কিন্তু বৃষ্টি পড়ছে ত পড়ছেই। শেষকালে পশুলোমের কোটটা গায়ে জড়িয়ে তাঁবুর একেবারে মাঝখানে শুয়ে পড়লাম, কানায় কানায় ভর্তি একটা নক্সা-কাটা বাটি থেকে খড়ের নল দিয়ে টেনে টেনে ঘোল খেতে লাগলাম। বাদলা দিনে এই ভাবে গরম কাপড়ে শরীর ঢেকে শুয়ে শুয়ে মনের আনন্দে ঘোল টেনে খেতে আমার বেশ লাগত। এটাও একটা কাজ বলে আমার মনে হত।

দুপুর গড়িয়ে অনেক বেলা হয়েছে এমন সময় ভেজা ঘাসে ঘোড়ার খুরের ছপছপ আওয়াজ শোনা গেল। আমাদের তাঁবুর কাছে কে যেন এসে থামল, তাঁবুর দড়ির সঙ্গে ঘোড়াটাকে বাঁধল। আমি ভাবলম বোধহয়, চোন-এনে, তাই খুশি হয়ে উঠলাম। দাদু বা দাদীকে অর্ধেক দিন না দেখলেই আমি আকুল হয়ে পড়তাম। আমার মনে হত কী যেন একটা নেই, আমি মনের শান্তি একেবারেই হারিয়ে ফেলতাম। পশুলোমের কোটটা গা থেকে ফেলে দিয়ে আমি চোন-এনে'র দেখা পাওয়ার আশায় ছুটলাম, কিন্তু তাঁবুর দরজা ফাঁক হয়ে যেতে ভেতরে প্রবেশ করল কালো দাড়িওয়ালা এক পুরুষ। তার গায়ের ওপরের পোশাক থেকে অজস্র ধারায় গড়িয়ে পড়ছে বৃষ্টির জল। তার ভিজে চোপসানো জামাকাপড় দেখে আমারও ঠাণ্ডা আর অস্বস্তি লাগল।

'সালাম আলেকুম।'

'আলেকুম সালাম। আসুন।'

'জাহান্নামে যাক এই বৃষ্টি। এ'টে থাকা কুয়াসার মতো। টিপটিপ করে পড়ছে ত পড়ছেই।'

আগন্তুক টুপি খুলে চৌকাটের কাছে ঝেড়ে আবার মাথায় পরল।

'ভিজে জবজবে হয়ে গেছি।'

'ওপরের ভারী জামাটা খুলে দরজার ওপর ঝুলিয়ে রাখ, শুকোক খানিকটা।'

আগন্তুক জামা খুলে ঝুলিয়ে রাখল, চোন-আতার হাত ধরে তাকে সম্ভাষণ জানাল, তারপর অতিথির জন্য নির্দিষ্ট আসনের দিকে এগিয়ে গেল।

'ঘোড়ার দুধ নিয়ে আয়,' চোন-আতা আমাকে বললেন।

আমি চামড়ার খোলে রাখা ঘোড়ার দুধ এগিয়ে দিতে চোন-আতা পাত্রটা কয়েকবার ঝাঁকিয়ে নিলেন, পাত্রের কানা মুড়ে পুরো এক বাটি ঘোড়ার দুধ ঢেলে অতিথিকে দিলেন।

অতিথি যতক্ষণ না পানীয় নিঃশেষে পান করছে ততক্ষণ তিনি অপেক্ষা করলেন, তারপর বললেন:

'তোমার যাত্রা শুভ হোক, খবর কী বল,' বলেই আবার বাটি ভর্তি করে দিলেন।

কালো দাড়িওয়ালা লোকটা আরও এক বাটি শেষ করার পর জিভের ডগা গোঁফের ওপর বুলিয়ে নিল।

'আসছি গাঁ থেকে। ঘোড়ায় যখন জিন চাপাচ্ছিলাম তখন আপনার গিন্নির সঙ্গে দেখা। তিনি জানাতে বললেন, আপনার যে-ছেলে কারাকোলে আছে তার ফৌজে ডাক পড়েছে, আজই স্টীমার ছাড়ছে।'

দাদু নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। এতক্ষণে আমি বুঝলাম চোন-এনে ফেরেন নি কেন! লোক যে কত রকমের হয়! একেই দেখ না। এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার সঙ্গে সঙ্গে জানাবে কোথায়, তা নয় আগে সে গিলল ঘোড়ার দুধ—যেন এটা তার কাছে সবচেয়ে বড় হল, তারপর আবার চুল্লির কাছে গা গরম করার তাল! ওঃ দেড়েল, দেড়েল! তোমার ঐ কালো দাড়ি আর সাদা পোশাকটা ছাড়া আর কিছুই এখন আর আমার মনে পড়ছে না, এমন কি তোমার

নামও না। নইলে এখন তোমাকে খুঁজে বার করে লজ্জা দিতাম। কী দুঃখই না তখন তুমি আমাদের দিয়েছিলে!

'এমন হুটমুট কেন?' হতবুদ্ধি চোন-আতা অবসন্নস্বরে জিজ্ঞেস করল।

'আরে ঐ যে কী বলে ছাই?..' কালো দাড়িওয়ালা তোতলাতে লাগল, সে আরও কয়েক ঢোক ঘোড়ার দুধ গিলল। 'আরে ঐ যে কী যেন বলল... পিন* যুদ্ধ না কী যেন? মোট কথা ওখানে কী যেন এক লড়াই বেধেছে। আমরা কির্গিজরা ভালো ঘোড়সওয়ার কিনা, তাই গোটা দল যোগাড় করছে।'

'হায় হায়! ছেলেটার ভাগ্যই খারাপ,' চোন-আতা প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন। পাত্রটা অতিথির হাতে ছুঁড়ে দিয়ে তিনি চটপট গায়ে পোশাক চাপালেন, তাড়াহুড়োয় গোড়ালি দুমড়ে মুচড়ে জুতোজোড়া পায়ে গলিয়ে নিলেন।

দাদুর দেখাদেখি আমিও পিছিয়ে পড়ে রইলাম না। দরজার কাছাকাছি এসে তিনি কালো দাড়িওয়ালার দিকে ফিরে তাকালেন:

'আমরা যতক্ষণ না ফিরছি ততক্ষণ ঘোড়াগুলোকে একটু দেখো ভাই।'

'আরে বুড়োকর্তা আমি...' অতিথি আমতা আমতা করতে লাগল।

দাদু চোখে অন্ধকার দেখলেন, তাঁর গোঁফ খাড়া হয়ে উঠল।

'ভয় পেয়ো না, এখানে নেকড়ে তোমাকে ধরে খাবে না!'

'আচ্ছা, আচ্ছা... ওঃ কী বিপদ!'

আমি আর দাদু মিলে তাড়াতাড়ি ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে গাঁয়ের দিকে ছুটলাম।

রাস্তা ধুয়েমুছে একসা হয়ে গেছে। ঘোড়া কখনও কাদায় পিছলে যাচ্ছে, কখনও যা হাঁটু-সমান কাদায় ডুবে যাচ্ছে। তা সত্ত্বেও চোন-আতা নিজের ঘোড়াকে তাড়িয়ে নিয়ে চললেন, তাঁর ভয় হচ্ছিল

---

* ফিন থেকে বিকৃত রূপ।

স্টীমার ছাড়ার আগে আমরা পেঁছুতে পারলে হয়। ছেড়ে গেল কিনা তা-ই বা কে জানে? তখনকার দিনে লোকে হ্রদ পার হত স্টীমারে চেপে কিংবা ঘোড়ার গাড়িতে বা ঘোড়ার পিঠে চড়ে পাশ ঘুরে যেত। মোটরগাড়ি কমই ছিল, গোটা এলাকায় মাত্র দুটো আধটনী গাড়ি—একটা রাষ্ট্রীয় খামারে, দ্বিতীয়টা মেশিন-ট্র্যাক্টর স্টেশনে। এখনকার মতো নয়।

সুতরাং ভাইকে সম্ভবত বালিকচি অবধি পেঁছুতে হবে স্টীমারে চেপে। আমরা যখন উপত্যকায় নামলাম তখন দাদু আমার দিকে ফিরে তাকালেন, নিজের ঘোড়ার পিঠে চাবুক কষিয়ে দিয়ে হেঁকে বললেন:

'পিছু নে!'

তাঁর বাদামী রংয়ের জিলান তোরু* তীরবেগে ছুটল, দ্রুত আমার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে লাগল।

দাদু ঘোড়ার কেশরের ওপর ঝুঁকে পড়লেন, তাঁর পোশাকের প্রান্ত বাতাসে উড়তে লাগল, দূর থেকে তাঁকে দেখাচ্ছিল একটা পাখির মতো। তাহলেও আমি জিলান তোরুর নাগাল ধরে ফেললাম। তার খুর থেকে দলা দলা কাদা ছিটকে এসে সমানে আমার মুখের ওপর পড়তে লাগল, আমি মোড় নিয়ে পথের এক পাশে সরে গেলাম। দুটো ঘোড়াই ঘামে নেয়ে উঠেছে। আমরা গাঁয়ের পাশ কাটিয়ে চলে গেলাম। ঘাটের কাছাকাছি আসতে দেখলাম লোকজনের ভিড়। এমন সময় তীব্র একটানা ভোঁ শোনা গেল। এ রকম ভোঁ পড়ে তখনই যখন স্টীমার ঘাটে ভেড়ে কিংবা ঘাট ছেড়ে যায়। এবারের আওয়াজটা ছিল ছাড়ার সঙ্কেত। আমার হৃৎপিণ্ডটা প্রথমে ভয়ানক ধড়াস ধড়াস করে উঠল, মনে হচ্ছিল এই বুঝি বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসবে, তারপর আড়ষ্ট হয়ে প্রায় থেমে গেল। দাদু ঘোড়া হাঁকিয়ে টিলার ওপর উঠে গেলেন, রেকাবের ওপর দাঁড়িয়ে পড়লেন, মাথার ওপর চাবুক উঠিয়ে মরিয়া হয়ে মুখ বিকৃত করে যেন আর কারও কণ্ঠে চেঁচিয়ে বললেন:

* জিলান-তোরু—বাদামী সাপ।

'ওহে তোমরা বল না একটু অপেক্ষা করতে!'

জনতার প্রথম সারি সরে গিয়ে আমাদের পথ করে দিল, কিন্তু তার পরে গুঁতিয়ে ঢোকা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। যারা ঘাটের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছিল তারা দাদুর চেঁচামেচিতে কানই দিল না, আমাদের ঠেলে এগোনোর বেপরোয়া চেষ্টায় কেউ মনোযোগ দিল না। দুর্যোগের সময়কার হ্রদের মতো লোকের ভিড় আওয়াজ তুলল, দুলতে লাগল।

বিচ্ছেদের শোকে আকুল লোকের এমন জমায়েত আমি এর আগে কখনও দেখি নি। পরে অবশ্য দেখেছি পিতৃভূমির মহাযুদ্ধের সময়, আরও নিদারুণ।

আমি আর দাদু যদিও তখন ঠেলে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছি, এমনকি ঘোড়ার পিঠে চাবুকও কষিয়ে চলেছি, কিন্তু সবই নিষ্ফল। স্টীমার বাঁক নেওয়ার সময় এক দিকে কাত হয়ে পড়ে দূরে সরে যেতে লাগল। দাদু তখন ঘোড়ার মুখ পেছনে ঘুরিয়ে নিয়ে ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এলেন, স্টীমারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তীর ধরে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। আমিও তার পিছু পিছু ঘোড়া হাঁকালাম। চোন-আতা মাথা থেকে চাঁদি-টুপি খুলে নিয়ে নাড়তে লাগলেন, চিৎকার করে কী যেন বললেন। হঠাৎ যাত্রীদের মধ্যে একজন ডেকের কিনারায় ছুটে এলো, রেলিংয়ের ওপর দিয়ে এমনভাবে ঝুঁকে পড়ল যে দেখে মনে হল বুঝি হ্রদের জলে ডুব দেয় দেয়। সে ক্ষিপ্তের মতো টুপি নাড়াতে নাড়াতে চেঁচিয়ে কী যেন বলল।

আমি চিনতে পারি নি, তবে শিগগিরই আন্দাজ করতে পারলাম ওটা আমার ভাই। কিন্তু সে যে চেঁচিয়ে কী বলছিল তা বোঝার সাধ্য ছিল না। আমার কাছে এসে পেঁছুল কেবল প্রতিধ্বনি: 'আ-আ-আ...' হঠাৎ আমি দেখতে পেলাম দাদু নেমে পড়েছেন, রেকাব আঁকড়ে ধরে ঘোড়ার পাশে পাশে ছুটে চলেছেন কোন রকমে তার সঙ্গে তাল রেখে। তারপর গতিবেগ কিছুমাত্র না কমিয়ে তিনি লাগাম হাতে জড়িয়ে নিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, পেছনে টেনে নিয়ে চললেন অবাধ্য ঘোড়াটাকে। তাঁর বুক থেকে কাতরানির মতো বেরিয়ে এলো:

'বাছা! বাছা রে!' তারপর তিনি একেবারেই কেমন যেন দমে গেলেন, স্টীমারের ডেকের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন—সেখানে ভাই তখনও টুপি নাড়িয়ে চলছে।

. স্টীমার ইতিমধ্যে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে। ঢেউগুলো যেন চোন-আতার প্রতি করুণাবশত সস্নেহে তাঁর চার পাশে মৃদু ছলাৎ ছলাৎ করছে। চোন-আতা কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে নাজেহাল ঘোড়ার কেশর ধরে জলে দাঁড়িয়েই রইলেন।

আমি তীরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছিলাম।

যা ঘটল তা এই যে ভাইকে ফ্রণ্টে নিয়ে যেতে যেতে ফিন যুদ্ধও শেষ হয়ে গেল।

১৯৪১ সনের গরমের শুরুতে ভাই যখন ট্রান্স-কার্পাথিয়ান এলাকায় তখনই তার কাছ থেকে এই মর্মে চিঠি পেলাম যে শরৎকালে গাঁয়ে আসছে। কিন্তু... যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল।

পাঁচ

মানুষ যখন দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করে তখন সময়ের গতি সম্পর্কে তার বোধ লোপ পায়। ভাইয়ের মনে হচ্ছিল যে ক্রাস্‌নভ ও বগ্‌দানিউকের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর বোধহয় কয়েক দিন কেটে গেছে। আসলে কিন্তু কেটেছে মোটে চব্বিশ ঘণ্টা।

ভাইয়ের হাঁটু এমনই ফুলে উঠেছে যে প্যাণ্ট আঁটো আঁটো লাগায় হাঁটতে অসুবিধা হচ্ছিল, তাই চোট খাওয়া পাটাকে বার করার জন্য সেলাই ধরে প্যাণ্ট ফেড়ে ফেলতে হল। কিন্তু এতেও বিশেষ সুবিধা হল না। যন্ত্রণায় ভাইয়ের মুখ মড়ার মতো ফেকাসে হয়ে গেল, সে মুখ হাঁ করে ঘন ঘন নিশ্বাস নিতে লাগল, তাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন জলের মাছকে ডাঙায় তোলা হয়েছে। তার মাথাটা নিস্তেজ হয়ে একবার এ কাঁধে আরেক বার ও কাঁধে হেলে পড়ছিল, প্রতিটি পদক্ষেপে বুক থেকে বেরিয়ে আসছিল আর্তনাদ।

বগ্‌দানিউক ও ক্রাস্‌নভ ওভারকোট আর দুটি লাঠি দিয়ে স্ট্রেচার বানাল, তাতে ভাইকে শুইয়ে দিল। তাদের নিজেদেরও তখন ক্লান্তিতে পড় পড় অবস্থা। ঐ অবস্থায়ই তারা চলতে লাগল। সময় সময় তারা ছায়ার নীচে দাঁড়িয়ে পড়ে, স্ট্রেচার নামিয়ে রাখে, সঙ্গে সঙ্গে অবসন্ন হয়ে মাটির ওপর গড়িয়ে পড়ে।

চারদিকে নিস্তব্ধতা!.. উপুড় করা নীল বাটির মতো আকাশ!.. সূর্য আতপ্ত হয়ে সোহাগ জানাচ্ছে অক্ষুব্ধ প্রকৃতিকে!.. দেখে শুনে মনে হয় কোন যুদ্ধ নেই। থেকে থেকে ভেসে আসছে মৃদুমন্দ বাতাস, মধুর খেলায় মেতেছে বার্চ আর ফার গাছের মাথায়, শিহরণ জাগছে গাছের পাতায়, যেন ওরা একে অন্যকে বড় মজার কোন কথা চুপে চুপে বলছে। মাঠ থেকে ভেসে আসছে ফুলের সুবাস, এসে মিশছে ফার গাছের মাতাল করা ঘ্রাণের সঙ্গে। ভাই আর এখন কাতরাচ্ছে না।

'সাশা? ও সাশা?' এমন মধুর, দরদমাখা স্বরে বগ্‌দানিউক ক্রাস্‌নভকে ডাকল যে সে কণ্ঠস্বর যেন আর কারও।

'বল্‌।'

'আমি ভাবলাম বুঝি তুই ঘুমিয়ে পড়েছিস।'

'কেবল এই জন্যেই ডাকলি?'

বগ্‌দানিউক দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'মাথা ঝিমঝিম করছে!'

'তা এই ত, বিশ্রাম কর না।'

ক্রাস্‌নভ চোখ বুজে চিৎ হয়ে শুয়েই থাকে। বগ্‌দানিউক তার দিকে তাকায়, তারপর পাশ ফিরে হাতের ওপর থুতনি ঠেকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে যেন আপন মনেই বলতে শুরু করে:

'আমাদের বাড়িতে মাদী শুয়োর আছে, বিয়োনোর মতো গোরু আছে, অবশ্য বাচ্চা। হাঁস মুরগী গোটা তিরিশেক। আমাদের বাড়ি যৌথখামারের শেষে, একেবারে নদীর ধারে। বালিহাঁস, পাতিহাঁস আরও সব পাখির ইয়ত্তা নেই... তোর কী মনে হয়, এসবই কি জার্মানদের হাতে গিয়ে পড়বে?'

'তোর নিজের কী মনে হয়?'

'জানি না।'

'তা হলে ভাব!'

বগ্‌দানিউক গা ঝাড়া দিয়ে উঠল, বলল:

'তা লোকের নিজস্ব গেরস্থালির দিকে ওরা চোখ দেবে বলে আমার মনে হয় না।'

'বটে!' ক্রাস্‌নভের মুখে সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধের লক্ষণ প্রকাশ পেল। 'আচ্ছা, আর কী তুই ভাবিস?'

'না, এই অমনি আর কি... ভাবলাম হয়ত ওরা নেবে না,' বগ্‌দানিউক আরও একবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে চিৎ হয়ে শুল।

'না, তুই বল, বল!'

'নেবে,' হঠাৎ ওদের শিয়রের ওপাশ থেকে শোনা গেল।

ক্রাস্‌নভ ও বগ্‌দানিউক ধড়মড় করে উঠে পড়ল, দেখতে পেল ওদের চার-পাঁচ পা দূরত্বের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে ছাইরঙা সার্ট গায়ে বছর বারো বয়সের একটা ছেলে, তার মাথার চুল কটা, নাকটা বড়ি বসানো। ছেলেটা বাঁ হাতে জড়িয়ে ধরে আছে বার্চ গাছ, ডান হাতে মুঠো করে ধরে রেখেছে চাবুক। সে বাতাসে সাঁই সাঁই শব্দ করে চাবুক দোলাল, গম্ভীর ভাবে সৈনিকদের দিকে এগিয়ে গিয়ে আলগোছে ওদের কাছাকাছি বসল।

'নেবে,' ছেলেটা আবার বলল।

তারপর বগ্‌দানিউককে লক্ষ্য করে বলল,

'আপনি ভেবেছেন নেবে না? তাহলে ঐ যে টিলাটা আছে ওটার ওপরে উঠুন। ওর ওপারে গোরু চরছে। ওগুলো কার ছিল জানেন? খামারে যারা কাজ করে তাদের গোয়ালে ছিল। এখন ওসব জার্মানদের। আমাকে দিয়ে জোর করে চরাচ্ছে। বুঝলেন ত?'

বগ্‌দানিউক ছেলেটির চোখে চোখে তাকাতে পারল না, মনে মনে ভাবল: "উঃ, বাচ্চারাই যদি এমন বুড়োদের মতো হয়ে গেল তা হলে আর কী বাকি রইল?"

ক্রাস্‌নভ ছেলেটাকে মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করতে লাগল।

'এতটুকু বাচ্চা, ওর ত এখন ছুটোছুটি করার বয়স, অথচ ও বোধ হয় ভুলেই গেছে যে দুনিয়ায় খেলনা বলে কিছু আছে, তায় আবার আমাদের জ্ঞানও দিচ্ছে। কী দারুণ বিপদ আমাদের ওপর এসে পড়েছে!'

দরদে ওর বুক ফেটে যাচ্ছিল, সেই সঙ্গে ছেলেটার উত্তর শুনে তার গর্বও হচ্ছিল। তার ইচ্ছে হল ছেলেটা ইদানীং যে দুর্ভোগ ভুগছে সে সবের ভার যেন কাটিয়ে উঠতে পারে। ক্রাস্‌নভ ইচ্ছে করে তাকে খোঁচা দিয়ে বলল:

'তা তুই কি জার্মানদের রাখাল হয়ে ভাড়া খাটছিস নাকি?'

ছেলেটা লাফিয়ে উঠল, যেন কেউ তাকে হুল ফুটিয়ে দিয়েছে।

'মুখ সামলে কথা বলবি!'

'আহা অমন চটে যাস কেন? ঠাট্টা করছিলাম আমি। তুই দেখছি সঙ্গে সঙ্গে তুই-তোকারি শুরু করে দিলি। বড়দের সঙ্গে ওভাবে কথা বলে নাকি?' কোন রকমে হাসি চেপে রেখে গুরুমশাইয়ের ভঙ্গিতে ক্রাস্‌নভ বলল।

ছেলেটা লজ্জায় লাল হয়ে গেল, নাক টানতে টানতে গজগজ করে বলল:

'অমন ঠাট্টা কেউ করে?' কথার সঙ্গে সঙ্গে ওর চোখে খেলে গেল দুষ্টুমির ঝলক। 'আপনারা ত জানেন না, ভেবেছেন গোরুর গায়ের একটা লোমও জার্মানদের জন্যে রাখব? দেখবেন, কী রকম রাখি!'

'তা কী করে হবে?' বয়সের তুলনায় পাকা-পাকা, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত এই ছেলেটিকে ক্রাস্‌নভের ক্রমেই আরও বেশি ভালো লাগছিল।

'কী করে তা জানি।'

'শুনিই না।'

ছেলেটা কটাক্ষে জ্বলন্ত দৃষ্টি হেসে ক্রাস্‌নভের দিকে তাকাল, একটু দাঁড়িয়ে রইল, যেন ভেবে দেখল বলবে কি বলবে না। পরে

এমনভাবে ঘন হয়ে বসল যে তার খোঁচা খোঁচা হাঁটু জোড়া সৈনিকের বুটের সঙ্গে প্রায় এসে ঠেকল। সে ফিসফিস করে বলল:

'আমার কেবল জানা দরকার গেরিলারা এখন কোথায় আছে। সব গোরু ওদের কাছে খেদিয়ে নিয়ে যেতাম, নিজেও ওদের সঙ্গে থেকে যেতাম। আমার আর কোন পথ নেই।'

কী করে ছেলেটাকে সাহায্য করা যায় তা ক্রাস্‌নভের জানা ছিল না, তাই সে চুপ করে রইল। তার ভেতরে ভেতরে দারুণ ইচ্ছে হচ্ছিল ছেলেটাকে শক্ত করে বুকে চেপে ধরে, আদর করে, সান্ত্বনা দেয়। কিন্তু সে যে ওকে বাচ্চা বলে ভাবছে তার কোন লক্ষণ প্রকাশ করলে চলবে না, কেননা ছেলেটা নিজেকে ভাবছে পুরুষমানুষ বলে।

'আপনাদের এই বন্ধু কি জখম হয়েছে নাকি?' মাথা দিয়ে ভাইয়ের দিকে ইঙ্গিত করে ছেলেটি বলল।

ক্রাস্‌নভ তার কথার সমর্থনে মাথা নাড়ল।

ছেলেটা বোদ্ধার মতো দীর্ঘশ্বাস ফেলল, যেন এই কথাই বলতে চায়: "হ্যাঁ, আপনাদের গতিক খারাপ দেখছি।"

'আমি আপনাদের অনেকক্ষণ আগে দেখেছি, আপনারা যখন ঐ টিলাটা থেকে নামছিলেন তখনই দেখেছি। প্রথমে বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল -- কে, পরে ভালো করে দেখার পর বুঝলাম।'

একটু ভেবে ও বলল:

'আচ্ছা এক কাজ করলে হয়। আমি এখন গিয়ে দাদুর সঙ্গে কথা বলে দেখি। দাদু সাহায্য করবে। ওকে কোনভাবে জার্মানদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখব, সারিয়ে তুলব।'

এই কথাগুলো শুনে বগ্‌দানিউক চাঙ্গা হয়ে উঠল, আশার আলো দেখতে পেয়ে ছেলেটার দিকে তাকাল।

ছেলেটাও যেন সঙ্গে সঙ্গে বগ্‌দানিউকের মনের কথা টের পেয়ে গেল।

'তিনজনকেই জায়গা দেওয়া কিন্তু শক্ত হবে। আচ্ছা আমি এক্ষুনি আসছি। আমার জন্যে এখানে অপেক্ষা করবেন!'

ছেলেটা পা বাড়াল। ওর পায়ের বড় বড় হাইবুট দেখেই বোঝা যাচ্ছিল অন্য কারও। ক্রাস্‌নভ ভাইয়ের দিকে ঝুঁকে পড়ল:

'সের্গেই, শুনছ সের্গেই?'

ভাই ঘোলাটে চোখ মেলে তাকাল।

'শুনলে ছেলেটা কী বলল?'

'হ্যাঁ।'

'থাকবে ত?'

'আমার কাছে সবই সমান,' তার উত্তর প্রায় শোনাই গেল না, তবু ক্রাস্‌নভ তার স্বরে আহত হওয়ার ভাব টের পেল।

এটা অবশ্য ঠিকই যে সৈনিকের পাশে যখন সৈনিক থাকে তখন সে স্বচ্ছন্দ বোধ করে। দুজনেই এটা বুঝল। কিন্তু আর কিছু করার নেই। ছেলেটি কখন ফিরে আসে ওরা তার অপেক্ষা করতে লাগল। দুঘণ্টা কেটে গেল। ছেলেটার তখনও দেখা নেই। ওরা ভাবল ছেলেটা আর আসবে না, তাই পথে বেরিয়ে পড়ার তোড়জোড় শুরু করে দিল। শেষকালে একেবারে অন্য দিক থেকে শোনা গেল বুটের খটখট আওয়াজ। ছেলেটা কাছে এগিয়ে এলো, ওদের দিকে না তাকিয়ে নিশ্বাস ফেলে অস্ফুট স্বরে বলল:

'ফাঁসি দিয়েছে।'

দুই সৈনিকই একসঙ্গে বলে উঠল:

'কাকে? দাদুকে?'

ছেলেটা কান্না চাপার চেষ্টা করছিল, তাই সে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না।

'আমাদের এক মাস্টারমশাই ছিলেন... তিমফেই আন্দ্রেয়েভিচ্... বয়স অনেক। ওঁর বৌ... মেয়েটা আমার সঙ্গে পড়ত...' বলতে বলতে ছেলেটা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। 'ওদের সব্বাইকে ফাঁসিতে ঝোলাল... তারপর...'

'কাঁদিস না, বল।'

নাক টানতে টানতে, হাতের মুঠো দিয়ে মুখময় চোখের জল মাখামাখি করে ফেলে ছেলেটি বলতে লাগল:

'এত ভালো লোক ছিল ওরা... আমরা জানতামই না যে চিলেকোঠায় আমাদের এক জখম হওয়া অফিসারকে লুকিয়ে রেখে দিয়েছিল। মনে হয় অফিসার রাতে আমাদের এখানে এসে পড়েছিল। জার্মানরা জানতে পারে...'

ছেলেটা আবার কেঁদে আকুল হয়ে পড়ল।

'অফিসারকেও ফাঁসিতে ঝোলায়। আমি যখন আসি তখন জার্মানরা লোকজনকে তাড়িয়ে চত্বরে নিয়ে যাচ্ছিল, যাতে সকলে দেখতে পায়।'

তারপর কিছুটা শান্ত হওয়ার পর তার মনে পড়ে গেল হাতে ধরা থলেটার কথা। সে থলেটা মাটির ওপর নামিয়ে রাখল।

'দাদু এখন আসতে পারছে না। বলেছে, রাতে আসবে, বলছে, এখন লুকিয়ে অপেক্ষা করুক। দাদু আসবে। এই যে খাবার পাঠিয়ে দিয়েছে।'

কিন্তু খাওয়ার মতো অবস্থা কারও ছিল না। সকলেই দাঁড়িয়ে রইল, যেন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময়, মাথা নীচু করে, মাটির দিকে তাকিয়ে। তারপর ক্রাস্নভ ছেলেটার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল:

'তোর ভালো হোক! দাদুকেও অনেক ধন্যবাদ!'

সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে থলে থেকে খাবারটা নিজের জিনিসপত্র রাখার ব্যাগে পুরে রাখল।

'রাস্তায় খাওয়া যাবে,' এই বলে বিদায় জানানোর জন্য ছেলেটার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। 'আচ্ছা, এখন তা হলে চলি, দাদুকে সালাম।'

'আপনারা চলে যাচ্ছেন?' ছেলেটা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

ক্রাস্নভ সম্মতিসূচক মাথা নাড়াল।

'কিন্তু দাদু যে আসবেন, বলেছেন,' বগ্দানিউক আপত্তি জানিয়ে বলল।

ক্রাস্‌নভ ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল:

'তুই কি চাস ওদেরও ফাঁসি দিক?'

তারপর ভাই যেখানে শুয়ে ছিল সেখানে, স্ট্রেচারের দিকে এগিয়ে গিয়ে হাতল দুটো ধরে হাঁকল:

'ওঠা!' বিষণ্ণ কণ্ঠে ছেলেটাকে বলল, 'চলি রে।'

ভাই যখন বুঝতে পারল ওরা তাকে ছেড়ে যায় নি তখন কৃতজ্ঞতাভরে সে ক্রাস্‌নভের দিকে তাকাল।

ছেলেটা অনেকক্ষণ ওদের চলে যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে রইল। তার কটা চুলের রাশি বাতাসে উড়ছিল, যতক্ষণ পর্যন্ত ওরা দৃষ্টির আড়ালে চলে না গেল ততক্ষণ সে এক ঠায় দাঁড়িয়ে রইল।

বগ্‌দানিউক মুখ গোমড়া করে চলছিল, ক্রাস্‌নভের ওপর রাগে তার গা রি রি করছিল।

নাড়াচাড়া পড়ার ফলে ভাইয়ের পায়ের ব্যথা বেড়ে গেল, সে কাতরাতে লাগল। এতেও বগ্‌দানিউক বিরক্ত হল। ক্রাস্‌নভের আচরণে তার মনের মধ্যে যে অসন্তোষ জমেছে তা উদ্‌গারের জন্য সে ঝগড়ার অজুহাত খুঁজছিল। ভাই আরও জোরে কাতরাতে লাগল। বগ্‌দানিউক তখন স্ট্রেচার ঝাঁকিয়ে তার ওপর ঝাল ঝেড়ে চেঁচিয়ে উঠল:

'অ্যাই থাম দেখি!'

ভাইয়ের মুখ থেকে বেরিয়ে এলো একটা করুণ আর্তনাদ: 'ওঃ!' সে চোখে অন্ধকার দেখল, চুপ করে গেল।

ক্রাস্‌নভ থমকে দাঁড়াল।

'বগ্‌দানিউক, তুই!..'

'কী? আমি কী?' বগ্‌দানিউক ফেটে পড়ল।

'ভুলে যাবি না, তুই এখন ফৌজে কাজ করছিস! ভুলে যাবি না!'

'ফৌজে?!' বগ্‌দানিউক আত্মসংযম হারিয়ে কেমন যেন চেরা-চেরা আওয়াজ করে উঠল।

'ঠিক তাই। তুই কেবল শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লড়াই করতেই

বাধ্য নোস, অন্যদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসতেও বাধ্য। তাছাড়া মানুষ হতে জানা দরকার। নে, এগো দেখি!'

'তুই কি হুকুম করছিস নাকি?' বগ্‌দানিউক বাঁকা হাসি হেসে বুঝিয়ে দিল যে ওর হুকুম মানতে সে রাজী নয়।

'হ্যাঁ, হুকুম করছি!'

'তুই আমার ওপরওয়ালা নোস!'

'তা হলে জেনে রাখ, এই মুহূর্ত থেকে আমি ওপরওয়ালা!'

বগ্‌দানিউক আগের মতোই মুখ ঝামটা দিল।

'তোর কোন খেতাব-টেতাব নেই।'

'খেতাব যদি না-ও থাকে ত অধিকার আছে। সামনের দিকে গিয়ে দাঁড়া দেখি!'

ক্রাস্‌নভ তার সঙ্গে মোটেই ঠাট্টা করছে না দেখে বগ্‌দানিউক ঘাবড়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি সামনের দিকে পথ বাড়াল।

'পেছন দিক সামনে ঘোরানো -- এ আর কী শক্ত কাজ?' সে সামনে এগিয়ে এগিয়ে এসে তাচ্ছিল্যভরে স্ট্রেচারের হাতল ঝটকা মেরে তুলে নিল।

এবারে ক্রাস্‌নভ চলল পেছন পেছন, সে বগ্‌দানিউককে লক্ষ্য করতে লাগল।

'ধীরেসুস্থে চল!'

বগ্‌দানিউক অধীনতা স্বীকার করল।

ভাই ঠোঁট কামড়ে নিঃশব্দে কাঁদছিল। চোখের জলের তপ্ত ধারা মুখ বয়ে গড়িয়ে পড়ছিল ওভারকোটের ওপর। তাকে কেউ সান্ত্বনা দিল না, ও প্রাণভরে কাঁদার অবকাশ পেল।

বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। প্রথমে মৃদু, এমন কি প্রীতিকর। তারপর বেগ বাড়ল। চলা আরও কঠিন হয়ে দাঁড়াল! মুহূর্তের জন্য থামার পর বৃষ্টি এমন প্রবল ধারায় পড়তে লাগল যে পায়ের নীচের অবস্থা তাকিয়ে দেখা কঠিন হয়ে পড়ল। কিন্তু ওরা দুজন যেন সব কিছু অগ্রাহ্য করে অবিরাম পা চালায়। ক্রাস্‌নভ ও বগ্‌দানিউক ওদের

গায়ের ওভারকোটের কলার সামান্য তোলে, ভিজে পোশাক যাতে গায়ে না লেপ্টে যায় সেই উদ্দেশ্যে বেল্ট খুলে ফেলে। কলারের ভেতর দিয়ে যে জলধারা গড়িয়ে পড়ছিল তা থেকে নিজেদের বাঁচানোর চেষ্টায় ওরা কুঁজো হয়ে ওভারকোটের কলারের নীচে চিবুক আড়াল করল।

মাটি প্যাচপেচে হয়ে গেছে, পা ফেলা কষ্টকর, বিশেষ করে ওরা যখন নলখাগড়ার ঝোপঝাড়ের মধ্যে গিয়ে পড়ছিল। নলখাগড়ার ঝোপড়া মাথা জলে ভারী হয়ে পড়ায় যখন গালের ওপর আছড়ে পড়ছিল তখন ব্যথা লাগছিল। হাই বুট প্রতি পদক্ষেপে জলকাদায় দেবে যাচ্ছিল, দুপাশে ছিটকে পড়ছিল কাদা।

ভাইয়ের অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপ হতে লাগল। এখন আর যন্ত্রণা বোধ করার মতো শক্তি তার নেই, বৃষ্টিতে ভিজে যে সপসপে হয়ে গেছে সে বোধও নেই। কেবল কখনও সখনও তার হুঁশ ফিরে আসছিল।

নলখাগড়ার ঝোপঝাড় শেষ হল, এখন দেখা দিল নতুন বিপত্তি। প্রায় দুশ মিটার খোলা জায়গা দৌড়ে পার হতে হল। ঝাঁকুনির চোটে ভাইয়ের হুঁশ ফিরে এলো। আকাশের দিকে চোখ বড় বড় করে সে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দেখে ক্রাস্নভ অস্বস্তি বোধ করল। তার বুকটা ধড়াস্ করে উঠল। কিন্তু ভাই চোখ পিটপিট করল, মাথাটা সামান্য নাড়িয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কোথায় আছে তা মনে করার চেষ্টায় সে যেন এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। অবশেষে অতি কষ্টে নিজের বন্ধুদের চিনতে পেরে সে আশ্বস্ত হল, আবার ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

এবারে তারা চলল বনের ভেতর দিয়ে। বিশাল বিশাল পাখির মতো মেঘের টুকরোগুলো দুপাশে ছিটকে সরে গেল। বৃষ্টিতে ধোয়া আকাশ ঝকঝক করছে। বাতাস পরিষ্কার ও স্বচ্ছ। সৈন্য দুজন একটা ফার গাছের নীচে এসে থামল, ভিজে ঘাসপাতা সরিয়ে মাটি সাফ করে নিয়ে স্ট্রেচার নামিয়ে রাখল। ভাইয়ের জ্ঞান ফিরে এলো। ক্রাস্নভ ক্লান্ত হয়ে দু হাতে হাঁটু জড়িয়ে ধরে হাঁটুর ওপর

মাথা রেখে স্ট্রেচারের পাশে বসে ছিল। বগ্‌দানিউক বিষণ্ণ, চুপচাপ। বোঝাই যাচ্ছিল ক্রাস্‌নভ যে দাদুর সাহায্য প্রত্যাখ্যান করেছে সেই দুঃখে সে কিছুতেই ওকে ক্ষমা করতে পারছিল না। এক পাশে সরে গিয়ে সে ওভারকোটের প্রান্ত নিঙড়ালো, একটা দিক পেতে বসল, অন্যটা দিয়ে এমনভাবে নিজেকে ঢাকল যাতে বাকিদের দেখা না যায়।

ভাই অন্যমনস্কভাবে আকাশের দিকে চোখ মেলে শুয়ে থাকল। পরে সে ক্রাস্‌নভের দিকে তাকিয়ে হাসল। হাসিটা হল করুণ। ক্রাস্‌নভ ভাইয়ের মেজাজ চাঙ্গা করার উদ্দেশ্যে বলল:

'খাবে?' নিজের কণ্ঠস্বর তার নিজের কানেই ভয়ার্ত, ভাঙা ভাঙা শোনাল।

ভাই উত্তর দিল না। তার মুখে এমন একটা হাসি ছড়িয়ে পড়েছিল যাতে ক্রাস্‌নভ ভয় পেয়ে গেল। সে হাতটা সামান্য ওঠাল, কাঁপা কাঁপা আঙুল তুলে ক্রাস্‌নভের বসা গাল দেখিয়ে বলল:

'মুখ ত গোঁফদাড়িতে ঢেকে গেছে। আমারও বোধহয় সেই অবস্থা?'

'না। গোঁফদাড়িতে মুখ ঢাকার মতো বয়স তোমার এখনও হয় নি।'

'আমি মাত্র একবারই দাড়ি কামিয়েছি। কথার কথা বললাম আর কি,' বলে সে আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

অস্তগামী সূর্যের আভায় ফুঁয়ো ফুঁয়ো মেঘগুলো রক্তিম হয়ে উঠেছে। ভাই স্থির হয়ে শুয়ে শুয়ে ধীরে ধীরে নিভে আসা কিরণ লক্ষ্য করতে লাগল।

'অদ্ভুত ব্যাপার,' সে বলল, 'সূর্য সব জায়গায় এক রকম ভাবে অস্ত যায় না। আমাদের ওখানে সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে। যুদ্ধ শেষ হলে এসে দেখে যাবেন।'

তারপর সমস্ত শক্তি জড় করে নিয়ে ফৌজী ইউনিফর্মের ভেতরের পকেট থেকে টেনে বার করল দরকারী কাগজপত্র, তিনকোনা করে ভাঁজ করা একটা চিঠি আব নিজের ফোটো।

'এগুলো আপনার কাছে লুকিয়ে রাখবেন?'

ক্রাস্‌নভের মনে হল তার গলার ভেতরে একটা দলা ঠেলে উঠছে। সে বলতে চাইল: "কী দরকার? তোমার কাছেই থাক না কেন!" কিন্তু মুখ ফুটে সে কথা বলতে পারল না। নিজের অজানতেই সে হাত বাড়িয়ে ভাইয়ের কাছ থেকে কাগজগুলো নিল। মাথার ভেতরে একটা চিন্তাই ঝলক দিয়ে উঠল: "মারা যাবে।" এর আগেও অবশ্য ক্রাস্‌নভের মনে হয়েছিল যে ছেলেটা মারা যেতে পারে। সে নিজে একজন নির্ভীক মানুষ, তাই ঠিক করল ভাই যখন নিজের মৃত্যু আসন্ন বলে ভাবছে তখন তাকে প্রতারণা করার কোন মানে হয় না। সে ওর অন্তিম ইচ্ছা পূরণ করার জন্য প্রস্তুত হল।

'আমার মনে হচ্ছে আমি নিজে এগুলো কোথাও হারিয়ে ফেলতে পারি,' কথাগুলো বলে ভাই হালকা বোধ করল। ক্রাস্‌নভকে আরও অনেক কিছু বলার ইচ্ছে তার ছিল, কিন্তু তার কণ্ঠস্বর থেমে থেমে যাচ্ছিল, শোনাচ্ছিল অবসন্ন, ভাঙা ভাঙা।

তারা দেখা দিল, নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে তারাদল তাকিয়ে রইল অসহায়ভাবে শায়িত তরুণ সৈনিকের দিকে। ক্রাস্‌নভ তার গায়ের ওপর ওভারকোটটা ঠিক করে দিল।

'আচ্ছা এবারে বিশ্রাম করা যাক। ভালোমতো ঘুমোও।'

নিস্তব্ধতা নেমে এলো। কেবল থেকে থেকে স্নিগ্ধ বাতাস এসে গাছের পাতায় মৃদু সরসর শব্দ তুলতে লাগল।

ভোরবেলায় ক্রাস্‌নভ বগ্‌দানিউককে ঝাঁকুনি দিয়ে ঘুম ভাঙাল:

'সের্গেই নেই!'

বগ্‌দানিউক লাফিয়ে উঠল, ভয়ে তার চোখজোড়া ঠেলে বেরিয়ে এলো।

'বাজে কথা ছাড় দেখি!'

ভাই যেখানে শুয়ে ছিল সে জায়গাটার দিকে এগিয়ে যেতে সে দেখতে পেল কেবল স্ট্রেচার আর ওভারকোট। কিন্তু নড়াচড়ার

ক্ষমতা ভাইয়ের নেই একথা মনে হতে বগ্‌দানিউক আলস্যভরে গা চুলকাল, হাই তুলল।

'আরে যাবে কোথায় ও। বোঝাই যাচ্ছে, কাছে পিঠে কোথাও আছে...'

'আমি এর মধ্যে দেখেছি, কোথাও নেই। তুই গিয়ে ও দিকটা খুঁজে দ্যাখ, আমি এদিকে যাব...'

ক্রাস্‌নভ কাঁধের ওপর ওভারকোটটা ফেলে বন্দুক হাতে নিয়ে আবার খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। বগ্‌দানিউক ধীরে সুস্থে নিজের জিনিস গুছিয়ে নিল, বন্দুকটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিল, তারপর যে ফার গাছটার নীচে ঘুমিয়ে রাত কাটিয়ে এখন ঝরঝরে বোধ করছে, তার সামনে থমকে দাঁড়াল, প্রাতঃকৃত্য সারল, ক'কাতে ক'কাতে আরও অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বোতাম আঁটতে লাগল। তারপর ক্রাস্‌নভ তাকে যে দিকটা দেখিয়ে দিয়েছিল ধীরে ধীরে সেদিকে এগিয়ে গেল। হঠাৎ শুনতে পেল ক্রাস্‌নভের জোর গলায় চিৎকার: 'সের্গেই!' বগ্‌দানিউক সঙ্গে সঙ্গে বিরক্তিভরে থুতু ফেলল।

'ছ্যাঃ, বুদ্ধির বলিহারি। আরে বাবা, জার্মানরা শুনে ফেলতে পারে সে বোধও নেই নাকি?'

ক্রাস্‌নভের চিৎকারের প্রতিধ্বনি ফার গাছগুলোর মাথার ওপর দিয়ে গড়িয়ে দূরে কোথায় যেন গিয়ে মিলিয়ে গেল, আর তাতে বগ্‌দানিউকের মুখ ভয়ে আরও বিকৃত হল।

ক্রাস্‌নভের চিৎকারটা মনে হয় অনিচ্ছাকৃতভাবে মুখ ফসকে বেরিয়ে এসেছিল। এরপর আবার নেমে এলো নিস্তব্ধতা। বগ্‌দানিউক একই জায়গায় পাক খেতে লাগল মরুভূমিতে উটহারা যাত্রীর মতো। ক্রাস্‌নভ যখন হাঁপাতে হাঁপাতে ঝোপঝাড় তোলপাড় করে বেড়াচ্ছিল তখন তার মনে হল: "ও যখন ভূতে-পাওয়ার মতো ছুটোছুটি করছে তা হলে সের্গেই হয়ত সত্যি সত্যিই হারিয়ে গেছে।" ক্রাস্‌নভের উদ্বেগ ওর মধ্যেও সঞ্চারিত হল। ভাইয়ের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ায় মনে মনে খুশি হলেও সে খোঁজার ব্যাপারে আগের চেয়ে

বেশি উদ্যোগী হল। ক্রাস্‌নভের মতো সে অবশ্য গলদ্‌ঘর্ম হল না, কিন্তু ভাই যে কী ভাবে 'উধাও হল' তা ভেবে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল। "এখন পাওয়া গেলেই হল, নইলে আমিই দোষী হব।"

বগ্‌দানিউক যখন এই সব কথা ভাবছিল ততক্ষণে আপন মনে ভাইয়ের নাম উচ্চারণ করতে করতে খাত আর ঝোপঝাড় ঘুরে ঘুরে ক্রাস্‌নভ হয়রান হয়ে পড়েছে। তার ওভারকোটে ডালপালার খোঁচা লাগে, কাঁটা বিঁধে যায়। ভাইকে কোথাও পাওয়া গেল না। হঠাৎ ক্রাস্‌নভের মনে হল ঝোপঝাড়ের মাঝখানে কার যেন মাথা এক ঝলক দেখা দিল। সে সেইদিক লক্ষ্য করে এগিয়ে গেল, কিন্তু কাছে আসতে দেখা গেল ওটা হল বগ্‌দানিউক।

হতাশ হয়ে সে দাঁড়িয়ে পড়ল এবং একমাত্র তখন অনুভব করল ভয়ানক ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সে ধপ করে মাটিতে বসে পড়ল।

'তামাক!' তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো।

বগ্‌দানিউক ঘাসের ওপর নেতিয়ে পড়ে ছিল। পকেট থেকে তামাক বার করার উদ্দেশ্যে সে কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে সামান্য উঠল।

ধূমপান করার পর ক্রাস্‌নভ উঠে দাঁড়াল। হঠাৎ সে আড়ষ্ট হয়ে পড়ল, তার মুখের ওপর খেলে গেল আতঙ্কের ছাপ। তারপর নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে না পেরে সে চোখ কোঁচকাল, আবার চোখ খুলল, হাত বাড়িয়ে রাস্তার দিকে দেখাল। সেতুর ওপাশ থেকে জার্মান সৈন্যদের দল নিয়ে পুরো বেগে ছুটে আসছে চারটি ট্রাক, আর তারই মুখোমুখি, পা ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে, তবে টমিগানটা ঠিক উঁচুতে, মাথার ওপর তুলে ধরে সেতুর মুখে এগিয়ে চলেছে ভাই। বগ্‌দানিউক এখন ক্রাস্‌নভের পাশেই দাঁড়িয়ে। সে দাঁত কড়মড় করে গালাগাল দিয়ে উঠল, গুলি করার জন্য তৈরি হল। ক্রাস্‌নভও বন্দুক উঁচিয়ে ভাইয়ের ঠিক বুকে নিশানা স্থির করতে লাগল। এই মুহূর্তে সে ভুলে গেল যে নিজেরও বিপদ ডেকে আনছে — জার্মানরা সন্ধান পেয়ে যেতে পারে। ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে সর্বশেষ শক্তি ব্যয় করে

কয়েক দিন ধরে কিনা এমন একটা লোককে টেনে বেরিয়েছে — এই চিন্তায় তার বিরুদ্ধে রাগে ওর সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল।

অতর্কিতে ওদের বন্দুকের আগেই কার বন্দুক থেকে যেন গুলি ছুটল, আর সামনের গাড়ি থেকে শোনা গেল আর্তনাদ। গাড়িটা সেতুর ওপর এদিক ওদিক নড়েচড়ে রেলিং ভেঙে নদীতে গিয়ে পড়ল। পেছনের গাড়িগুলো তাড়াতাড়ি এক পাশে সরে যাওয়ার চেষ্টায় মাটি তোলপাড় করে একটা আরেকটার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। জার্মান সৈন্যদের গালাগাল শোনা গেল, ওরা গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে আড়াল খুঁজতে ছুটল। আরও এক রাউণ্ড গুলির আওয়াজ শোনা গেল। এটা ভাইয়ের কাজ, রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে সে বন্দুক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ছুঁড়ছে আর চেঁচিয়ে যা মুখে আসে তা-ই বলে গালাগাল করে যাচ্ছে। তারপর ওর মাথাটা একটা হেঁচকা টানে উঁচু হয়ে গেল, মনে হল যেন থুতনিতে আঘাত খেয়েছে, বন্দুক ওর হাত থেকে খসে পড়ল, ও সঙ্গে সঙ্গে নিস্তেজ হয়ে পড়ল, কিন্তু তা সত্ত্বেও ভালো পাটায় ভর দিয়ে খাড়া থাকার প্রাণপণ চেষ্টা করল, শেষকালে ধপ করে মাটিতে পড়ে গেল।

এবারে জার্মানরা আড়াল থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এলো, ভাইয়ের দিকে ছুটে গেল। প্রথম তার কাছাকাছি এলো এক জার্মান অফিসার, সে ওর ওপর পুরো এক রাউণ্ড গুলির ছর্‌রা চালিয়ে দিল।

ক্রাস্‌নভ এত জোরে নিজের হাত কামড়ে ধরল যে তা ব্যথায় টনটন করে উঠল, সে উত্তেজিত মাথাটা বন্দুকের গায়ে ঠেকিয়ে রাখল, মর্মান্তিক করুণায় অস্ফুট কাতরোক্তি করল। হতভম্ব বগ্‌দানিউক হাঁ করে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওর মুখ দেখে মনে হচ্ছিল বুঝি বা সাহায্যের জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছে।

জার্মানরা ভাইকে টেনে এক ধারে সরিয়ে দিল, আহত ও মৃতদের একটা গাড়িতে গাদাগাদি করে তুলে নিয়ে এগিয়ে চলল, তবে এখন আর তাদের আগের সেই ফুর্তি ও নিশ্চিন্ত ভাব নেই।

পথ নির্জন হয়ে এলো।

তখন ওরা দুজন ভাইয়ের নিষ্প্রাণ দেহের দিকে এগিয়ে গেল। ওর গুলিতে ঝাঁঝরা মুখ দেখে ওরা শিউরে উঠল। নিদারুণ ক্রোধে সৈন্য দুজনের চোখ ধকধক করে উঠল, ওরা পাথরের মতো স্থির হয়ে অনেকক্ষণ নিহত তরুণ যোদ্ধার দেহের ওপর ঝুঁকে পড়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ওকে তুলল, ওর দেহটা যেন পরম পবিত্র এইভাবে সন্তর্পণে ওরা তাকে বয়ে নিয়ে গিয়ে একটা নিঃসঙ্গ কচি বার্চ গাছের নীচে নামিয়ে রাখল। এখানেই ওরা তাদের ফৌজী মালপত্রের সঙ্গে যে কোদাল ছিল তা দিয়ে কবর খুঁড়ে সঙ্গীকে কবরস্থ করল। প্রথমে ধীরে ধীরে মাথার টুপি খুলল ক্রাস্‌নভ। হারানোর গভীর শোকে সে কবরের সামনে চুপচাপ নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, সে কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না, কিছুই শুনতে পাচ্ছিল না। তার চোখে জল ছিল না। ক্রাস্‌নভের দেখাদেখি বগ্‌দানিউকও তারই মতো আচরণ করল।

কিছুক্ষণ এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকার পর ওরা ধীরে ধীরে পথের ধারে গড়ে ওঠা কবরের ঢিবি থেকে সরে দাঁড়াল। আমার ভাই শেষ শয্যা নিল জন্মস্থান থেকে বহু দূরে অচেনা জায়গায়। তার কবরের ওপর চোখের জল ফেলার মতো কোন আত্মীয়স্বজন ছিল না।

বগ্‌দানিউক ক্রাস্‌নভের পেছন পেছন চলছিল, সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। সে তার চোখের জল লুকোনোরও চেষ্টা করল না। ওর চোখ জলে ঝাপসা হয়ে উঠেছিল, চোখের জল গাল বয়ে গড়িয়ে পড়ছিল, তার মুখ জলে মাখামাখি হয়ে গেল, সে বারবার বলে চলছিল একই কথা:

'আমি কিনা ওর হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা করছিলাম। ভাবলাম, "এ এক ফেকড়া হল দেখছি।" ও এটা বুঝতে পেরেছিল... আমার ওপর অভিমান নিয়েই চলে গেল।'

শোকাচ্ছন্ন ক্রাস্‌নভ চুপ করে রইল।

'আমি পালানোরও মতলব করেছিলাম,' ফোঁপাতে ফোঁপাতে বগ্‌দানিউক বলল।

'এখন পালা না!' দাঁত কড়মড় করতে করতে ক্রাস্‌নভ বলল।

'এখন আমি আর বোকা নই,' বগ্‌দানিউক শিশুর মতো কাঁদতে কাঁদতে বলল।

'তার মানে ও মারা যাওয়ায় তুই অপরাধের হাত থেকে বাঁচলি।'

'কোন অপরাধ?'

'আজ যদি তুই আমাদের ছেড়ে পালিয়ে যেতিস তা ফৌজ থেকে পালানেরাই সামিল হত।'

বগ্‌দানিউক থমকে দাঁড়াল, ওর ফোঁপানি পর্যন্ত থেমে গেল। ক্রাস্‌নভ ওর দিকে মনোযোগ না দিয়ে আরও দ্রুত পা চালাল। বগ্‌দানিউক মুখ কাচুমাচু করে ছুটতে ছুটতে ক্রাস্‌নভের নাগাল ধরল। ক্রাস্‌নভ কিন্তু চুপচাপ চলতে লাগল, যেন ওকে এটাই বোঝাতে চাইল যে এর জন্য সে কখনই ওকে ক্ষমা করতে পারবে না। বগ্‌দানিউক মনে মনে নিজেকে অপরাধী বিবেচনা করে ক্রাস্‌নভের আরও অলক্ষিতে থাকায় চেষ্টা করল, অনুশোচনায়, নিজের প্রতি ঘৃণায় সে ভেতরে ভেতরে জ্বলেপুড়ে যাচ্ছিল।

এইভাবে তারা চলল - চুপচাপ, ক্লান্তি না মেনে, প্রায় না থেমে, পুবের দিকে...

এখানে আমি যে বৃত্তান্ত দিলাম তা আমার মনগড়া নয়। ক্রাস্‌নভ ও বগ্‌দানিউক ততদিনে মস্কোর উপকণ্ঠে এসে রাজধানী প্রতিরক্ষার লড়াইয়ে যোগ দিয়েছে। সেখান থেকে তারা যে চিঠি লেখে সেটা আমার হাতে পড়ে।

চিঠিটা ছিল সংযত ধরনের, কোন রকম অতিরঞ্জন তাতে ছিল না। যা যা ঘটেছিল সে সবেরই বিবরণ চিঠিতে দিয়ে বগ্‌দানিউক চোন-আতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। ফোটোগ্রাফসমেত চিঠিটা চোন-আতা আমাকে দেন।

কির্গিজদের মধ্যে একটা প্রথা আছে: লড়াইয়ের মাঠে কোন যোদ্ধার মৃত্যু হলে জ্ঞানী ও শ্রদ্ধাভাজন প্রবীণ মোড়লজাতীয় লোকজনের পেছন পেছন তার আত্মীয়রা সকলে এসে হাজির হয়, একমাত্র তখনই জানানো হয় শোকসংবাদ। চোন-আতা কিন্তু ভাইয়ের মৃত্যুসংবাদ গোপন রাখেন, এ ব্যাপারে একটা কথাও বলেন না। কেবল এখন, এই কাহিনীর মাধ্যমে আমি আত্মীয়স্বজনকে আমার দাদার মৃত্যুসংবাদ জানাচ্ছি।

আমার আপনজনেরা আমার অন্তরঙ্গরা, তোমাদের কাছে অনুরোধ, কেঁদো না! আর কারও যদি নেহাৎই অসম্ভব ঠেকে, যদি তিক্ত কান্না কারও গলা ঠেলে উঠে আসতে চায় তা হলে বলি একলা হ্রদের ধারে চলে এসো, তোমার চোখের জল হ্রদের জলের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে যাক আর তুমি সেই জলে নিজের মুখ ধোও।

আমি হ্রদের ধারে এসেছিলাম... চোখের জল ফেলেছিলাম। তারপর জলের ঝাপটা দিয়ে নিজের তপ্ত মুখটাকে জুড়াই। আমার চোখের জল কেউ দেখতে পায় নি। আমার ভাইয়ের দেহাবশেষের প্রয়োজন নেই চোখের জলের, প্রয়োজন নেই কাতরানির; যুদ্ধের যে রক্তক্ষয়ী বছরগুলির অভিজ্ঞতা আমার ভাইয়ের হয়েছিল সে স্মৃতি বহন করার ক্ষমতা তার দেহাবশেষের নেই। লোকে যদি স্মৃতিভারে পীড়িত হতে থাকে তা হলে সে কষ্ট পাবে। তাই বলি, তাকে শান্তভাবে শুয়ে থাকতে দাও। নিজের শোক মাথা উঁচু করে বহন করা দরকার। ভাই আমাদের কাঁদতে মানা করে গেছে। চোখের জল মোছ! ভাইয়ের নাম করে তোমাদের অনুরোধ করছি।

আমার মনে জেগে ওঠে আরও একটি স্মৃতি।

যুদ্ধ যখন শুরু হয় আমি তখন স্কুলে পড়ি। চোন-আতাও তখন গাঁয়ে ছিলেন, তিনি ফৌজের জন্য নির্দিষ্ট ঘোড়ার পাল দেখাশোনা করছিলেন।

স্মরণাতীত কাল হল আমাদের মাটিতে বরফ কখনও পড়ে

থাকে না। বরফ যদি পড়েও তা ঘোড়ার খুরের চেয়ে উঁচু হয়ে জমে না, আর দু-তিন দিনের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কিন্তু আজও মনে আছে, সে বছর গোটা শীতকালটা মাঠ ছিল বরফে ঢাকা। ঠাণ্ডার সময় আমাদের জলকষ্ট দেখা দেয়। খাল জমে যায়। দাদু তখন সকাল থেকে সন্ধে অবধি আস্তাবলে ব্যস্ত, কখনও ঘোড়ার নাদ পরিষ্কার করেন, কখনও গামলায় দানপানি দেন, কখনও ঘোড়ায় চড়ে গোটা ঘোড়ার পালকে খেদিয়ে নিয়ে যান জল খাওয়াতে গাঁ থেকে দুভার্স্ট দূরে কাঁটা ঝোপঝাড়ে ভর্তি ছোট নদীটার ধারে। ঘোড়াগুলোও ইতিমধ্যে ঐ পথে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার ফলে নিজেরাই নদীর দিকে ছুটে যায়, কোন রকম তাড়নার অপেক্ষা না করে নিজেরাই ফিরে আসে। সচরাচর আমিই চলতাম ঘোড়ার পালের পেছন পেছন। এই নদীতেই জল আনতে যেত মেয়েরা। তাদের মধ্যে আমি পাহাড়ী গাঁয়ের সেই মেয়েটিকেও দেখতে পেতাম।

প্রতিবারই আমার মনে হত সে যেন আমাকে কিছু একটা জিজ্ঞেস করতে চায়। কিন্তু বোঝাই যেত বাইরের লোকের সামনে আমার সঙ্গে কথা বলার ভরসা তার হত না, তাই কেবল তার ডাগর কালো চোখের চোরা চাউনি মেলে আমার দিকে তাকাত।

মেয়েদের দেখাত বিষণ্ণ, তারা মাঝে মধ্যে খুবই মৃদু স্বরে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলত। আমাকে ওরা লক্ষ্যই করত না। একদিন যখন আমি ঘোড়াগুলোকে জল খাইয়ে ফিরে আসছি, তখন দেখতে পেলাম মেয়েটি পথের ধারে আলগোছে বসে আছে। বালতিসমেত বাঁক কাঁধের ওপর, আর বালতি দুটো খাড়া হয়ে আছে বরফের ওপর।

মাটির ওপর তখন নেমে এসেছিল প্রদোষের অন্ধকার, কিন্তু আমি দূর থেকেই ওকে চিনতে পারলাম। আমি ঘোড়ার পিঠে চড়ে এগিয়ে আসতে ও উঠে দাঁড়াল, বালতি তুলে নিয়ে আমার পাশে পাশে চলতে লাগল।

'একটু জিরিয়ে নিলাম,' যেন কৈফিয়তের সুরে সে বলল, মুখে

ফুটিয়ে তুলল হাসির মতো ভাব। সে ভাবল যে আমি এখনও বাচ্চা, কিছুই বুঝি না। কিন্তু তার বিষাদ ভারাক্রান্ত চোখ দেখে আমি সবই বুঝলাম। কোন হাসিই সেই বিষণ্ণতা গোপন করতে পারল না। মনে আছে তার হাসি কেমন ছিল? কেমন তার গালে টোল খেত?

ঘোড়াটার লাগাম সামান্য টেনে ধরে আমি চেষ্টা করছিলাম যাতে ওকে ছাড়িয়ে চলে না যাই। ওকে সান্ত্বনা দেওয়ার, খুশি করার কিছুই আমার কাছে ছিল না এই ভেবে আমি মনে মনে কষ্ট পাচ্ছিলাম। সত্যি বলতে গেলে কি আমার ভয় হচ্ছিল এই বুঝি ও প্রশ্ন করে বসে। একবার ও যেন জিজ্ঞেসও করেছিল ভাইয়ের কাছ থেকে চিঠি আছে কি না।

এবারে কিন্তু সে কিছুই জিজ্ঞেস করল না -- মনে হয় অপেক্ষা করছিল আমি নিজেই আঁচ করে ভাই সম্পর্কে কিছু একটা ওকে বলব। মেয়েটি চলছিল ধীরে ধীরে, যাতে জল ছলকে না পড়ে। সেই মুহূর্তে আমি অনুভব করলাম আমার ভাই ওর কাছে কত প্রিয়, কত কাছের মানুষ।

'আপা,' আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

বেচারি, সে হয়ত ভেবেছিল ওর সঙ্গে কথা বললে আমি নির্ঘাৎ ভাইয়ের কথা বলব, তাই সে চমকে উঠল, বালতি থেকে জল ছলকে পড়ল, জলের ছিটে বরফের মধ্যে মিশে গেল।

'ভাইয়ের কাছ থেকে চিঠি এলেই আপনাকে বলব, ছুটে এসে বলে যাব।'

মেয়েটি মাথা নীচু করল। খুশি করার বদলে আমি ওকে হতাশই করে দিলাম। নিজের কথার জন্য আমার আফশোস হল। চুপ করে থাকলেই ভালো হত।

কখন কখন সে আমাদের বাড়িতে আসত। ও আর দাদী কোন কথা ছাড়াই একে অন্যকে বুঝতে পারত, ওদের কথাবার্তা অল্পই হত।

সে এসে দেখা করার পর প্রতিবারই দাদীকে খুশি খুশি মনে

হত। মনে হয় মেয়েটির কোমল হৃদয়ের আন্তরিকতা তাকে উৎফুল্ল করে তুলত।

মেয়েটি দশ ক্লাসের পাঠ সাঙ্গ করার পর পড়াশুনা করার জন্য চলে গেল ফ্রুঞ্জে শহরে। যাওয়ার আগে সে আমাদের কাছে এসে বিদায় নিল, দাদীকে চুমো খেল, আমার দিকে তাকিয়ে হেসে ওকে এগিয়ে দেওয়ার অনুরোধ জানাল।

আমার আনন্দ হল এই দেখে যে শেষ পর্যন্ত ওর গালে টোল দেখা দিয়েছে। আমি ওর আগে আগে লাফিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। ও আমার নাগাল ধরল, আদর করে আমার মাথার চুল নেড়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল:

'আমি যদি তোর কাছে একটা জিনিস চাই, তুই আমাকে দিবি?'

'যদি আমার কাছে থাকে তবেই না।'

'তুই আমাকে তোর... কানের মাকড়িটা দিতে পারিস?'

আমি যখন খুব ছোট ছিলাম তখন দাদী আমার বাঁ কান ফুঁড়িয়ে একটা লাল সুতো পরিয়ে দিয়েছিলেন। কিছুকাল বাদে আমি কানে পরতে শুরু করলাম রুপোর গোল মাকড়ি। মেয়েটি ঘটনাক্রমে কী করে যেন জানতে পেরেছিল যে এই মাকড়িটাই ছোটবেলায় পরত আমার ভাই, তাই স্মৃতিচিহ্ন হিশেবে আমার কাছে চায়। আমি কোনরকম ভাবনাচিন্তা না করে মাকড়িটা খুলে ওকে দিলাম।

দারুণ খুশি হয়ে সে আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল, মাকড়িটা হাতের মুঠোয় চেপে ধরল, বুকে চেপে ধরে ছুটে গেল নিজেদের বাড়িতে। সেখানে মালপত্র নিয়ে অপেক্ষা করছিল ওর আত্মীয়স্বজন। ওকে যে খুশি করতে পেরেছি এই আনন্দে আমি নিজেকে একটা কেউকেটা গোছের অনুভব করলাম।

এর পর দুবার গরমকালে মেয়েটি ছুটিতে এসেছিল। প্রায়ই আমাদের কাছে আসত। সে আমাদের বাড়ির চৌকাট পেরোবার সঙ্গে সঙ্গে চোন-এনে কোন এক সেকেলে প্রথা অনুযায়ী জলভর্তি বাটি তার মাথার চারদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে সেই জল চারধারে ছিটোতেন।

আমাদের বাড়িতে মেয়েটির আগমন সব সময় আনন্দের আর সুখের হত।

কিন্তু তৃতীয়বার গরমের ছুটির সময় মেয়েটি যখন এলো তখন আর আমাদের কাছে এলো না। আমার এমনও মনে হল সে যেন আমাদের এড়িয়ে চলছে। ও এসেছে জানতে পেরে দাদী টাটকা রুটি সেঁকলেন, ননী বানালেন, কিন্তু বৃথাই প্রতীক্ষা। মেয়েটি গাঁয়ে খুব কম দিনই থাকল, শিগগিরই আমরা জানতে পেলাম ও চলে গেছে। এর পর ও আর গাঁয়ে আসে নি।

তারপর বহুকাল কেটে গেছে, একবারও ওকে আমি দেখি নি।

আমার দিব্য, মোহন স্বপ্ন, কোথায় তুমি? কোথায় তুমি, আমার সহোদরের আকাঙ্ক্ষার ধন, কোথায় গেলে তুমি তোমার ভালোবাসা অচরিতার্থ রেখে? তুমি যে আমাদের কাছে আস না তার জন্য তোমার ওপর আমরা ক্ষুব্ধ হই নি। চোন-আতা আর চোন-এনে আশীর্বাদ করেছেন যেন তুমি সুখে থাক। আমিও তোমার সুখ কামনা করি, স্মরণ করি মাকড়িটার কথা। ঐ মাকড়ি হয়ে উঠুক এমন আগুনের কনা, যে আগুন বুকের ভেতরে তাপ সঞ্চার করে, মুখে ফুটিয়ে তোলে টোল খাওয়া হাসি।

ছয়

এখন আমি রীতিমতো সংসার পেতে বসেছি। আমার এক ছেলে, এক মেয়ে। প্রত্যেক বছর গরম কালটা আমরা কাটাই নিজেদের গাঁয়ে। সারা দিন ধরে এই মাটি খুঁড়ছি, এই হ্রদে স্নান করছি, রোদে শরীর সেঁকছি।

ভাইয়ের ছবি থেকে নেকড়া দিয়ে ধুলো ঝাড়ার জন্য ছেলেটা প্রায়ই আমার কাঁধে ওঠে।

মেয়ে ঈর্ষাভরে ওর দিকে তাকায়:

'আমি মুব্‌ব...'

'ঠিক আছে মোছ,' আমি বলি। ছেলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওকে জায়গা ছেড়ে দেয়।

কেন জানি না, আমি কিন্তু মেয়ের কাছ থেকে প্রশ্ন প্রত্যাশা করি:

'বাবা, কে বড়, তুমি না তোমার দাদা?'

'দাদা বড়,' আমি জবাব দেব।

'ও মা কী মিথ্যুক, ওর দাড়িই নেই, আর তুমি ত ওজ দাড়ি কামাও...'

'তা হলে আমিই বোধহয় বড়।'

আর কী বলতে পারি আমি? শিশুর মাথায় তার দুর্বোধ্য ব্যাখ্যা ঠেসে দিয়ে কাজ কী? যাই বলি না কেন, ওর পক্ষে এখন কিছু বোঝা কঠিন। এখন না হয় না-ই বুঝল কেন আমি আমার দাদার চেয়ে বড় হলাম। বড় হয়ে নিজেই সব বুঝতে পারে।

বছরের পর বছর কাটবে। আমার মাথার চুলে পাক ধরবে। আমি বুড়ো হব। ভাই চিরকালই থেকে যাবে অল্পবয়সী, থেকে যাবে তার চোখের সেই কেমন যেন বেমানান ধরনের ছেলেমানুষী দৃষ্টি। উত্তরপুরুষদের স্মৃতিতে তার এই চেহারাই ধরা পড়েছে।

আমাদের পরে যারা জন্মেছে তাদের কাউকে যেন নিজেদের দাদাদের চেয়ে বড় না হতে হয়, তারা যেন সুখেশান্তিতে বাস করে।

কেনেশ জ্হস্হপভ
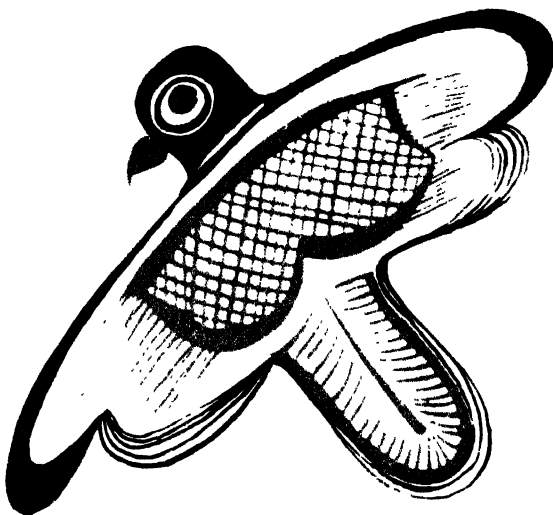
পর্বতের মহিমা অপার

মেয়েরকান জানলার ধার থেকে পুরনো, রংচটা তালাটা তুলে নিল। আজ বহু বছর হল তালাটা নীচু ছাদওয়ালা এই বাসা পাহারা দিয়ে আসছে। কর্ত্রী হাসপাতালে যায়, দিনরাত তাকে সেখানে কাটাতে হয়। তালা দরজায় ঝুলতে থাকে, ধৈর্য ধরে তার অপেক্ষা করে।

মেয়েরকান অভ্যাসবশত ঘরের ওপর নজর বুলাল। জিনিসপত্র কমই, সে সবও পুরনো, সেই সারবাগিশের আমলে কেনা। বাসন বলতে অবশ্য একটা পেয়ালা, একটা থালা — দীর্ঘ বছরে কম জমে নি! ফেলে ত আর দেওয়া যায় না... খাটের ওপর ঝুলছে পশমের একটা রংচটা গালিচা। গালিচার গায়ে — ছোটো একটা ছবি, কালে হলদেটে হয়ে গেছে। সৌম্য, প্রশান্ত দৃষ্টি। সারবাগিশ! ওর সাথি...

'সোনা আমার! নিভন্ত বিজলী! বেদনা আমার...'

মেয়েরকান ছবি থেকে চোখ সরিয়ে নিল, মখমলের জীর্ণ ঝুলকোটটা গায়ে চাপিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল।

বার-বারান্দায় চোখে পড়ল বারোটি প্রশাখাযুক্ত হরিণের শিং। মেয়েরকান থমকে দাঁড়ায়। চাও আর না চাও, স্মরণ না করে উপায় নেই। এখানে সবকিছুই মনে করিয়ে দেয় সারবাগিশের কথা।

...ভোরবেলায় বাড়িতে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। যেমন সচরাচর হয়ে থাকে শিকারের আগে। কখনও কার্তুজের খোঁজ চলে, কখনও বা বারুদের... আনাচে-কানাচে কোথাও হাতড়াতে, বাক্স পেঁটরা সিন্দুক তন্ন তন্ন করে দেখতে বাকি থাকে না। শেষকালে সে যাত্রা করে। চলে যাওয়ার পর অর্ধেক দিন ধরে ঘরদোর গোছাও। বেটাছেলের আর কী? ও কি বোঝে! ওরা সকলেই অমন...

সারবাগিশ পাহাড়ে রাত কাটিয়ে পর দিন বাড়িতে ফেরে সেই সন্ধ্যায়। 'এই, কী হল গো তোমার?' 'হরিণ শিকার করেছি!' 'আহা, হাসির ঘটা দেখ!' হাসিঠাট্টা করে, ছুটোছুটি করে, চোখ দুটো আনন্দে চকচক করতে থাকে। এক মুহূর্তও জায়গায় বসে থাকে না। রাস্তায় যাকেই দেখে বাড়িতে টেনে আনে হরিণের মাংস চেখে দেখতে। সারাটা সপ্তাহ জুড়ে বাড়ির দরজা বন্ধ হওয়ার নাম নেই... এমনই ছিল সে, তার সারবাগিশ, বড় সাদাসিধে মন! তারপর থেকেই বার-বারান্দায় ঝুলছে হরিণের শিং। বাইশ বছর কেটে গেছে। মেয়েরকানের চুলে এখন পাক ধরেছে...

হরিণের শিং ত নয়, যেন সারবাগিশ নিজেই অদৃশ্যভাবে আছে এখানে। বাড়িতে আসার সময় হোক কিংবা বাড়ি থেকে বেরোবার সময়ই হোক — দরজা খুললেই মেয়েরকান শুনতে পায় দূরাগত গুলির আওয়াজ। সারবাগিশ বাজির মতো গুলির আওয়াজ করে তাকে অভ্যর্থনা করছে, বিদায় জানাচ্ছে। যাতে মেয়েরকান ওকে ভুলে না যায়। মেয়েরকান এই আওয়াজে অভ্যস্ত, স্বামীর স্মৃতি হিশেবে তা ওর সঙ্গে রয়ে গেছে। সারবাগিশের সমস্ত জিনিসপত্রে — খাটের ওপর যে তাবিজটি ঝুলছে তার মধ্যে, হরিণের শিংয়ে সর্বত্রই আছে

এই আওয়াজ... কিন্তু গুলির শব্দ আজ আর গাছের পাখিদের, পাহাড়ের জন্তুদের — কাউকেই ভয় পাইয়ে দেয় না।

এই ত সূর্য...

সূর্য যখন ধীরে ধীরে পাহাড়পর্বতের ওপার থেকে ভেসে উঠতে থাকে তখন মেয়েরকানের সর্বাঙ্গে যেন একটা ঠান্ডা স্রোত বয়ে যায়। মেয়েরকান সূর্যের নাম দিয়েছে রাজা।

পাহাড় থেকে বইতে থাকে স্নিগ্ধ বাতাস — বিদায় করে দেয় ঝিমন্ত রাতকে। পাহাড়ের চারধারে গড়িয়ে পড়ে নীলাভ কুয়াসা। বাতাস বয়ে আনে বুনো ফুলের মৃদু ঘ্রাণ। এ হল প্রভাতের প্রথম বারতা।

এবারে রাজার পালা।

প্রকৃতি পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রতীক্ষা করছে সূর্যের।

দেখা দিল মিহি সোনার সুতো। এ যেন নকিব, সূর্যের আগে আগে ছুটছে। দেখতে দেখতে চোখে পড়ল স্বর্ণমুকুটের চুড়ো। সোনার সুতোর সংখ্যা ক্রমাগতই বাড়ছে। আবার বইতে থাকে মৃদু বায়ু। সে বায়ু ধরণী থেকে রাতের অবশিষ্ট শীতলতা দূর করে, সূর্য আগমনের পূর্ব মুহূর্তে ধরণীকে পরিচ্ছন্ন করে।

মাটিতে গাছপালা আর লোকজনের দীর্ঘ ছায়া পড়ে।

সূর্যকে অভ্যর্থনার প্রস্তুতি নিয়ে গোটা প্রাণিজগতে চাঞ্চল্য শুরু হয়। তাকে অভ্যর্থনা জানায় না কেবল শুকনো ঝোপঝাড়, নলখাগড়া আর কবর। তারা অচেতন, তারা মৃত। কবরের ওপর যে সব ঘাস উঠেছে তারা পর্যন্ত সূর্যকে অভ্যর্থনা জানায়। সর্বত্রই জীবনের জয়।

অবশেষে সমস্ত ঐশ্বর্য নিয়ে সুরুজ-রাজার উদয়।

সূর্য জগৎকে অধিকার করে। সর্বত্র আধিপত্য বিস্তার করে তার নিয়ম। সে আর কাউকে নিজের ক্ষমতার ভাগ দেয় না।

'প্রণাম তোমাকে, সুরুজ-রাজা!'

মেয়েরকান চোখ না কুঁচকে সোজাসুজি সূর্যের দিকে তাকায়। এ হল সূর্যের প্রতি তার অভিনন্দন। তার চোখ জলে ভরে ওঠে।

মেয়েরকান পুলকিত হয়ে ওঠে — চোখের জল ভেদ করে তার এবং সূর্যের মাঝখানে বিস্তৃত হয় সোনালী পথরেখা। পথরেখার দুধারে নীলচে-সাদাটে কুয়াসার আবরণ। কুয়াসায় পাহাড়পর্বত ঢাকা পড়ে আছে। ঝকঝক করছে কেবল সোনালী পথরেখা... এমন সময় ঘটল এক আশ্চর্য ঘটনা: সূর্য বহু টুকরোয় ভেঙে খান খান হয়ে গেল। অগ্নিপুচ্ছ টানতে টানতে টুকরোগুলো চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে... সূর্য যেন এক সুবিশাল বিজলী!.. অবশেষে সে শান্ত হয়ে আসে। টুকরোগুলো আবার জোড়া লাগে, সূর্য তার চোখের পলক তোলে। দেখতে দেখতে সে পলকের রোঁয়া প্রসারিত হয়ে মেয়েরকানকে স্পর্শ করে, মেয়েরকানের পলকের রোঁয়ার সঙ্গে এসে মেলে, থির হয়ে যায়... মেয়েরকান হাসপাতালে যায়, পথে যাতে সেগুলো হারিয়ে না যায় তার জন্য সতর্ক থাকে...

সে যায় খাল বরাবর, তারপর পাহাড়ের একেবারে ধারে — এখান দিয়ে কাছে হয়। খালে হাঁসেরা সাঁতার কাটে, ধবধব করে তাদের ঝাঁক। জলে পাহাড় আর মেঘের ছায়া পড়েছে, মেয়েরকান তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায় ছোট্ট শহরটি, তার জমকাল বাগবাগিচা আর উলটো দিকের পাহাড়ের শ্রেণীর ন্যাড়া ঢাল।

মেয়েরকান যখন এই শহরে আসে তারপর থেকে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। এ সবই মরহুম সারবাগিশের জন্য!.. সবে দুজনের মিলন হয়েছে। সংকীর্ণ উপত্যকায় অবস্থিত শহরটির প্রশংসায় সে পঞ্চমুখ হয়ে উঠল, ওকে এখানে নিয়ে এলো। দুটো লেপ ছাড়া ওদের তখন আর কিছুই ছিল না। এই না হলে আর সারবাগিশ!-- পাহাড়তলিতে, একেবারে উপকণ্ঠে একটা জায়গা বেছে নিল, সেখানে বাড়ি বানাল। সারবাগিশ সব কাজে পটু... বাড়ি তৈরি করে নেবার মতো লোক তখন অল্পই ছিল -- লোকে আটটা বাড়ির এক সারি বানিয়ে রাস্তার নাম দিয়ে ফেলল। জলপ্রপাত সড়ক। চারদিকে গড়ে উঠল বাগান। 'শহরের বাড়িঘর থেকে খারাপটা কিসের বল দেখি!' প্রশংসা আর ধরে না! পেরেক থেকে বন্দুকটা তুলে নিয়ে চলল

পাহাড়ে। ওর কথা শুনলই না। বলে, লক্ষণ ভালো আছে। কতকগুলো লক্ষণ আর আজগবী ব্যাপার সে মানত।

এর পর বিশ বছরেরও বেশি কেটে গেছে। "কত কাল!" মেয়েরকান দীর্ঘশ্বাস ফেলে পাকধরা চুলে হাত বুলাল। "অথচ তুমি, সারবাগিশ, তুমি সেই একই রকম কাঁচা রয়ে গেলে!.."

আইদারের কথা মনে পড়ে গেল। তাকে দেখে কেন যেন সারবাগিশকে মনে পড়ে। তাই কি মাথা থেকে ওর চিন্তাটা যাচ্ছে না? আর আইদারের আঁকা পাহাড় সরাসরি মেয়েরকানের চোখের সামনে ভাসে। এই এখনও সে ছবি তার দেখার ইচ্ছে হল।

"এই ছোট ছবি আমাকে সব সময় কেন এমন টানে?" মেয়েরকান অস্বস্তি বোধ করে। "যেন গুণ করেছে। যেখানেই যাই না আমার সঙ্গে সঙ্গে চলছে। এ কী ব্যাপার?"

মেয়েরকানের মনে পড়তে লাগল আইদারের সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাৎ।

...হাসপাতালে ছুটোছুটি: গুরুতর অসুস্থ একজন লোককে নিয়ে আসা হয়েছে। মেয়েরকান বেড ঠিক করল, কলঘরে গেল সেই অসুস্থ লোকটাকে ধোয়ামোছা করতে। পুরনো সোফার ওপর বিদঘুটেভাবে গুটিসুটি মেরে বসে আছে ঢ্যাঙা, রোগা এক পুরুষ। "কী রোগাই না বেচারি! অস্থিচর্মসার..." মেয়েরকান মনে মনে করুণা অনুভব করল। চোখে জ্যোতি নেই, ঠোঁটজোড়া হাঁ হয়ে আছে, ভারী নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে কাঁধ দুটো খটখট করে নড়ছে। মেয়েরকান যখন ওকে স্নান করায় তখন ও লজ্জায় কুঁকড়ে যায়। "লজ্জাসরম আছে দেখছি," মেয়েরকান ভাবল। "শরীরের ময়লার মতো তোমার রোগ যদি রগড়ে ধুয়ে ফেলা যেত! আমাকে দেখে লজ্জা পাওয়ার কোন কারণ নেই..." পিঠে, কাঁধের হাড়ের নীচের দিকে লাল টকটক করছে ফুসফুস অপারেশনের দুটি ক্ষতচিহ্ন। তা দেখে মেয়েরকান কেঁপে উঠল, তবে চট করে সামলে নিল। গা ডলার ছোবড়ায় বেশ করে সাবান লাগিয়ে আলতোভাবে, সাবধানে তার কাঁধের হাড়-ওঠা,

হাড়গোড় বার করা শরীর রগড়াতে লাগল। এই লোকটাই আইদার। কেমন যেন অদ্ভুত লোক। কিন্তু ভালোমানুষ, দিলখোলা। ওঃ, এই যুদ্ধ!.. ওর একটা ফুসফুস গুলিতে এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গিয়েছিল। বাস করে রাজধানীতে, লোকে বলল ছবি আঁকে। পাহাড় আঁকার সাধ হতে জিওলজিস্টদের দলের সঙ্গে বেরিয়ে পাহাড়েপর্বতে ওঠা-নামা করে। 'মিছিমিছিই মরতে গেল পাহাড়ে,' মেয়েরকান সিস্টারদের কাছ থেকে শুনতে পেল, 'রোগটা গাড়িয়ে গেল, এ যাত্রায় রক্ষা পেলে হয়।'

আইদার কিন্তু একটু একটু করে সুস্থ হয়ে উঠতে লাগল। একটু ভালো বোধ করলেই তুলি হাতে নেয়। সারা দিন স্কেচের সামনে বসে থাকে। মেয়েরকানের কী! আঁকলই না হয়, কিন্তু ডাক্তারদের বারণ। এদিকে আইদার ডাক্তারদের কাছ থেকে গোপনে ছবি আঁকে। কী যে করা যায় ওকে নিয়ে?

মেয়েরকান আইদারের ঝুঁকে-পড়া রোগা মূর্তিটার পেছনে দাঁড়িয়ে থাকে, উদ্বেগ বোধ করে, ওর জন্য ভয় হয়, মনে মনে সে ওকে ভর্ৎসনা করে: "আমাদের এই পাহাড়ে তুমি কী পেলে বল দেখি? আজব বটে! এর মধ্যে খোঁজার কী আছে, কী-ই বা পেতে চাও? তোমার ছবি কি বাপু জীবনের চেয়েও বড় হল? সুস্থ মানুষ হলেও না হয় বুঝতাম, তা নয়ত..."

আইদারের আঁকা পাহাড়ের ছবি তার বেডের ওপর ঝুলছে। ঐ ছবিই ত সর্বত্র মেয়েরকানের সামনে ভাসছে...

এখন বসন্তের শুরু। গিরিখাতের এপাশ ওপাশ থেকে ভিজে হাওয়া বইছে। এ সময় যে পাহাড়ে উঠবে, ফার গাছের বনে হাঁটাহাঁটি কববে, শিলাখণ্ডের স্পর্শ নেবে, বুক ভরে বসন্তের পাহাড়ী বাতাস টানবে, সে আবার যৌবন ফিরে পাবে—এমন একটা জনশ্রুতি আছে।

খালের পার দিয়ে যেতে যেতে মেয়েরকান একটা কচি পপলার গাছের সামনে থমকে দাঁড়াল। কে যেন তার গায়ে লোহার গোঁজ

বিঁধিয়ে দিয়েছে। গোঁজটায় ইতিমধ্যে মরচে ধরেছে। তার চারপাশের বাকল ফুলে উঠেছে, ক্ষতস্থান বুজে গেছে।

'নিষ্ঠুর!..' মেয়েরকানের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো।

ছায়াঘন বাগানটি রোদে-পোড়া মাটির পাঁচিলে ঘেরা। দেয়াল যেখানে ধসে পড়ে মাটিতে বসে গেছে সে জায়গাটার ওপর দিয়ে গিয়েছে পায়ে-চলা-পথ। কোন এক সময় বাগানে ঢুকতে গিয়ে ছেলেছোকরার দল দেয়াল ভেঙ্গে ফেলেছে। এখানেই লোকের পায়ের চাপে চাপে তৈরী হয়েছে হাসপাতালে যাওয়ার পথ। এখন যদি কাঁটাতারের বেড়ও দেওয়া হয় তা হলে সকালে উঠে দেখা যাবে লোকে অভ্যস্ত পথেই পা ফেলছে। হাসপাতালের বড় ডাক্তার প্রত্যেক মিটিং-এ এর জন্য বকাবকি করেন। "বড় ডাক্তার হও আর যা-ই হও লোকজনের সঙ্গে পেরে উঠতে হচ্ছে না," মেয়েরকান মনে মনে হাসল।

এখান থেকেই ওষুধের গন্ধ ধরা পড়ে। এখানকার মাটিই রোগী-রোগী ভাবে ভরপুর।

অথচ এককালে এটা ছিল পতিত জমি, এখানে ছিল কেবল ঢিবি আর গর্ত। ওর চোখের সামনে তৈরী হয় এই হাসপাতাল। টানা দোতলা দালান, আলো-ঝলমলে বড় বড় জানলা। মেয়েরকান আজ বিশ বছর হল এখানে আসা-যাওয়া করছে।

বিশাল উঠোনের সমস্তটা জুড়ে দড়ি টাঙানো। তাতে শুকোতে দেওয়া হয়েছে চাদর, তোশকের ওয়াড়, জামাকাপড়। এর আর শেষ নেই। "রোগীরও শেষ নেই," বিষণ্ণ হয়ে ভাবে মেয়েরকান, "একদল যায়, আরেক দল আসে..."

সদর দরজার সামনে ঝুলছে ফলক: 'নগরের শল্যচিকিৎসা বিভাগ'। এই লেখাটি মেয়েরকানকে এককালে বানান করে পড়তে হত।

করিডরে, 'সম্মান ফলকে' — পাঁচটি ফোটোগ্রাফ। এখানে সে-ও আছে — শেষ প্রান্ত থেকে দ্বিতীয়, যৌবনোত্তীর্ণা, রগের দুপাশে পাক ধরেছে। বার্ধক্যের আর দেরি নেই... ছবির নীচে টাইপ করে লেখা: 'হাসপাতালের বিশ বছরের কর্মী, পরিচারিকা।' বাড়িতে

এ রকম ছবি নেই। মেয়েরকান নিজের ছবি তোলা পছন্দ করত না। বাড়িতে একমাত্র যে ছবি আছে সেটা সারবাগিশের আমলে তোলা, তাতে সে গোলগাল, অল্পবয়সী মেয়ে।

করিডরে তার পরিচিত ঈথারের গন্ধ। তার মানে কারও অবস্থা খারাপ হয়েছিল। রাত আবার উদ্বেগে কেটেছে। "কার অবস্থা খারাপ হল? আইদারের?" মেয়েরকান ভেবে শঙ্কিত হল।

'আসি, গুরুতর অসুস্থ কেউ আছে?' হাসপাতালের পরিচ্ছন্ন স্মক গায়ে আঁটতে আঁটতে সে সিস্টারকে জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, আছে।'

'রাতে নিয়ে এসেছে বুঝি?'

'না, আইদারের অবস্থা খারাপ।'

"যা ভেবেছিলাম..." মেয়েরকান দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সে পুরনো আলমারিতে তার বাড়ির জামাকাপড় ভরে রাখল। "মনটা তা-ই বলছিল..."

রেজিস্টারীতে পরিষ্কার জামাকাপড়ের হিসাবের নীচে সই করার পর মেয়েরকান ডিউটি শুরু করল।

যে পাতাবাহার গাছটাকে সে রোজ পরিষ্কার জলে ধুত সেটা আর জানলার ফুলগাছগুলো আজ ম্লান দেখাচ্ছে। "বহুকাল রোদে দেওয়া হয় নি। রোদে নিয়ে যাওয়া দরকার, সঙ্গে সঙ্গে তাজা হয়ে উঠবে," সে মনে মনে ভাবল।

'ক্লোরিন' লেখা বালতিটা মেয়েরকান তুলে নিল। ক্লোরিন গোলা জলে ন্যাতা ভিজিয়ে দেয়াল আর দরজা রগড়াতে লাগল। ছোট করিডরটা তার কাছে অসম্ভব দীর্ঘ বলে মনে হল। ধোয়া মোছা করতে করতে আইদারের ওয়ার্ড পর্যন্ত যেতে সে সম্পূর্ণ হয়রান হয়ে পড়ল। "ও কেমন আছে? সত্যি সত্যিই কি একেবারে খারাপ অবস্থা?"

সে সন্তর্পণে ওয়ার্ডে উঁকি মারল।

ওয়ার্ডে ছিল মাত্র দুটি বেড। একটাতে ছিল কুলমাত। অপারেশনের

পর সে আরোগ্যলাভের পথে। আমুদে ছোকরা, কথা বলতে ভালোবাসে। মজাদার সঙ্গী। দোকান কর্মচারী।

আইদারের চেহারা ফেকাসে। সে শুয়ে ছিল অক্সিজেন দেওয়া অবস্থায়। চোখ বন্ধ।

মেয়েরকান ঢুকেই আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, সে বুঝতে পারছিল না কেন এসেছে, কেনই বা দাঁড়িয়ে আছে।

তার দৃষ্টি পড়ল ছবির ওপর। তার হুঁশ ফিরে আসতে লাগল।

পাহাড় যথাস্থানেই আছে। সাদা কাগজের ওপর, দেয়ালে ঝুলছে।

নিছকই পাহাড়... সেই একই চিরকেলে পাহাড়...

মেয়েরকান জোর করে সেদিকে মনোযোগ দিয়ে দেখল।

তা, পাহাড় যেমন হয়ে থাকে।

তাকিয়ে দেখ, মেয়েরকান, ভালো করে তাকিয়ে দেখ!..

বিরাট পাহাড়... তুষারধবল চুড়োর মালা, এ যেন সরোবরের বুকে মালার মতো বিস্তৃত মরালের ঝাঁক! তাদের ওপর ফেনায়িত মেঘপুঞ্জ।

"এটা কী ব্যাপার?" মেয়েরকান ভাবল, ছবি থেকে দৃষ্টি সে ফেরায় না। "এটাই তোমার সম্পদ, এরই ওপর তুমি সকাল-সন্ধেয় ঝুঁকে থেকেছ, একেই তুমি দিয়েছ তোমার মনপ্রাণ, এর জন্যে তুমি তোমার শরীরপাত করেছ? আমি বোকা, আমি অজ্ঞ, কিন্তু আমি তোমাকে বুঝতে চাই!"

পাহাড়ের শ্রেণীর ওপর ঘুরছে মেঘমালা। মনে হয় এই বুঝি ছবি থেকে ভেসে বাইরে চলে এলো।

"আচ্ছা, এগুলো আমার চেনা," মেয়েরকান মেঘ আর পাহাড় নিরীক্ষণ করে দেখল। সে উত্তেজিত হয়ে পড়ল। "আমি যে নিজের চোখে এদের দেখেছি! এক্ষুনি মনে পড়বে। আর এই সন্ধে... মনে হচ্ছে যেন আমাদেরই পাহাড়... হ্যাঁ, আমাদেরই ত গো!.. ওর চোখ বটে! আঁকার ঠিক জিনিস খুঁজে বার করেছে!.."

এমন সময় ছবিটা দপ করে জ্বলে উঠল, চোখের সামনে খুলে গেল পাহাড়ী নিসর্গের অনন্ত প্রসারিত দূরপ্রান্ত।

তুষারাচ্ছন্ন পর্বতমালা। ওপরে ঝুলছে মেঘ... বাতাস বয়ে চলেছে। জনপ্রাণী বলতে আছে একা মেয়েরকান...

ততক্ষণে তার দম শেষ হয়ে এসেছে। সূর্য পাটে যায় যায়। কাছের সারির পেছনে যে ঢালটা দেখা যাচ্ছে, আলো থাকতে থাকতে সেখানে পেঁছুতে হবে। সম্ভবত পেরে উঠবে না। মনে হয় সারা জীবন পা ফেলে গেলেও পেঁছুতে পারবে না। কিন্তু যে করেই হোক পারতে হবে। এদিকে শক্তি ফুরিয়ে আসছে। সে হতভম্ব হয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে।

ঈগলের ডাক শোনা গেল। কোথা থেকে যেন ভেসে এলো চেনা গলা -- অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের গলা। পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তুলছে সারবাগিশের গান।

আরও কত নদী পার হতে হবে, কত উপত্যকা আর গিরিপথের ওপর দিয়ে না যেতে হবে।

মেয়েরকান দৌড়ায়, দৌড়তে দৌড়তে হয়রান হয়ে যায়... অবশেষে শেষ চুড়ো... আর আছে শেষ নদী... সেটাও পার হল।

অথচ পথের শেষ চোখে পড়ে না...

"মেয়েরকান!" ওর কানে এলো প্রতিধ্বনি।

'মেয়েরকান চাচী!'

জগতের এই মহিমাপূর্ণ দৃশ্যপট উলটে গেল, অদৃশ্য হয়ে গেল। মেয়েরকান যেন গভীর নিদ্রা থেকে জেগে উঠল, সে অবসন্ন হয়ে ধপ করে চেয়ারের ওপর বসে পড়ল...

দেয়ালে আগের মতোই ঝুলছে পাহাড়ের ছবি-আঁকা ছোট এক টুকরো পিচ্‌বোর্ড।

"হয়েছে, চলি..." কী যে তার হল তখন পর্যন্ত মেয়েরকান তা বুঝে উঠতে পারছিল না। সে বালতি আর ঝাঁটা তুলে নিয়ে টলতে টলতে ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে এলো।

'মেয়েরকান চাচী!' সিস্টার ওকে হাসপাতালময় খুঁজে বেড়াচ্ছিল।

'এই যে আমি!.. এক্ষুনি... এক্ষুনি...'

সিস্টারকে গরম জল দিয়ে সে অন্যান্য ওয়ার্ড সাফ করতে গেল। দেয়ালের ছোট ছবিটা অবিরাম তাকে অনুসরণ করে চলল। 'এই লেগে রইল...' মেয়েরকান বিড়বিড় করে বলল। খানিকটা জিরিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে সে করিডরের শক্ত সোফার ওপর গা এলিয়ে দিল।

মেয়েরকান আপিসাকে দেখতে পেল। মহিলাটি হাসপাতালে চুল ছাঁটে। তাকে গরম জল আর চাদর দিতে হয়। তার অনুরোধের অপেক্ষা না করে মেয়েরকান নিজেই সেগুলো নিয়ে এলো। আবার ওয়ার্ড সাফ করতে গেল।

দু নম্বর ওয়ার্ডের মেয়েটি বোধহয় একটু সুস্থ বোধ করছে, সে হাসি-হাসি মুখে বেডের ওপর বসে ছিল। মেয়েরকান আসাতে খুশি হয়ে উঠল। কী এক আনন্দে যেন সে ভেতরে ভেতরে ঝলমল করছে। একটা বয়ামে জল দিয়ে ফুল রাখা হয়েছে। "আহা বেচারি," মেয়েরকান মনে মনে বলল, "বলেছিলাম না তোকে!.. দেখলি ত? তোর এখনও কচি বয়স। তোর এই আনন্দটা যেন থাকে... আনন্দের মতো ওষুধ আর নেই --- ডাক্তাররা তা-ই বলেন..."

মেয়েরকান তার পাশে খাটে গিয়ে বসল। তার মনে পড়ল এই কিছুদিন আগেও মেয়েটি দুঃখে, কান্নায় ভেঙে পড়েছিল। একবার সে এখানে জানলা ধোয়ামোছা করতে এসেছিল। হঠাৎ বাইরে থেকে কার ছায়া পড়ল। কোন এক ছোকরা। "আচ্ছা," মেয়েরকান শেষকালে বুঝতে পারল। "ওরা কথা বলুক।" মেয়েরকান ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে গেল।

যখন সে ফিরে এলো ছোকরা তখন আর ছিল না। আজকের মতো সেদিনও নাইট টেবিলটার ওপর ছিল ফুল। আর আইগানিশ জোর কান্নাকাটি করছিল।

'আর নয়, বাছা, কী হয়েছে, বল ত?' মেয়েরকান ওর দিকে ঝুঁকে পড়ল।

মেয়েটি আরও অনেকক্ষণ কাঁদল, ফোঁপাল, মেয়েরকান বসে বসে

ওর মাথায় হাত বুলিয়ে চলল। খানিকটা শান্ত হয়ে মেয়েটি চোখের জল মুছে বলল:

'বলে, আমাকে ভালোবাসে। বলে, ভালোবাসবে। কিন্তু আমার ত এই দশা। আমি ফুসফুসের রোগী যে! এমন মেয়েকে কি ভালোবাসা সম্ভব? না, না, হতে পারে না... আসলে ও আমাকে দয়া করে। কিন্তু দয়া কি আর ভালোবাসা? ও আমাকে আশা-ভরসা দিতে চায়... আমি কি আর বুঝি না?.. ওকে আমি বিশ্বাস করি না... ও আমার ভালো চায়, চায় যেন আমি সুস্থ হয়ে উঠি। তাই আমাকে ঠকায়... এর চেয়ে বরং সত্যি কথা বললেও ভালো হত...'

মেয়েটি আরও কেঁদে ভাসিয়ে দিল।

এর পর থেকে ছেলেটি আগের চেয়েও ঘন ঘন আসতে লাগল। মেয়েটি একটু একটু করে সুস্থ হয়ে উঠতে লাগল।

"জিজ্ঞেস করব না কি?" মেয়েরকান ভাবে। "থাক গে। নিজে থেকে বললে বলুক..."

'চাচী!..'

'উঁ...' মেয়েরকান তার দিকে ফিরে তাকাল।

'ভালোবাসা কাকে বলে?'

"বোঝ ব্যাপার!.." মেয়েরকান ভয়ে শিউরে উঠল। মনে মনে অনুভব করল, কেবল এই মেয়েটির নয়, সমস্ত প্রাণীরই দরকার ভালোবাসার। সঙ্গে সঙ্গে তার মাথায় খেলে গেল যে জীবনে সে কেবল এক সারবাগিশকেই ভালোবেসেছিল, আর কাউকে তার মনে ধরল না। "ওকে বলা দরকার," সে নিজেকে বোঝাল, "বেচারি গুলিয়ে ফেলেছে!.. ওকে সাহায্য করা দরকার..."

'বল না গো চাচী...'

'তুই অনেক পড়িস, কেতাবে কি তার কথা নেই। কেতাবে কী বলে? কোথাও না কোথাও তার কথা নিশ্চয়ই লেখা আছে... ওগুলোর জ্ঞানবুদ্ধি ত আমার চেয়ে বেশি...'

'না, চাচী, ওগুলোতে মিথ্যে কথা থাকে... নয়ত এমনও হতে পারে

যে অন্যদের হয় অন্য ধরনের? কিভাবে আমি নিজেকে পাই নি... তুমিই বরং বল...'

"আরে এর বৃত্তান্ত দেওয়া আমার কম্ম নয়," মেয়েরকান বিব্রত বোধ করল। "ভালোবাসা কী, তা কেমন হয় সে কথা অন্যকে বোঝাই কী করে?.. একথা বলে বোঝানো যায় না... সারবাগিশকে আমি ভালোবেসেছিলাম... নীরবে ভালোবেসেছিলাম... এ নিয়ে নীচু গলায়ও কিছু বলি নি... স্রেফ ভালোবেসেছিলাম। যেমন ভালোবাসে আর দশজনে। সারাটা জীবন তাকে সঁপে দিয়েছি..."

মেয়েরকান মনে মনে সারবাগিশের উদ্দেশে বলল: "এই বোকা মেয়েটাকে দেখছ সারবাগিশ? কিছুতেই ছাড়ে না, তুমিই বল দেখি ওকে, ভালোবাসা কী। আমাকে উদ্ধার কর!.."

সৈনিক সারবাগিশ বিধবা মেয়েরকানের কানে ফিসফিসিয়ে বলল: "হুঃ, মেয়েরকান, ভালোবাসা যে কী তা কি তুমি জান না? না কি বুড়ো বয়সে তা ভুলে যাচ্ছ? আমাদের ভালোবাসা কি তুমি ভুলে গেছ?.."

"থাম!" ভীত হয়ে মেয়েরকান হাত নাড়ল। "তুমি ত জান, একমাত্র তাই নিয়েই আমি বেঁচে আছি..."

"তা হলে বলই না বাপু!" সারবাগিশ তাকে অনুনয় করে বলল। "বল যে ভালোবাসা হল সুখ!.."

'ভালোবাসা হল সুখ!' মেয়েরকানের মুখ দিয়ে ফস করে বেরিয়ে গেল। "তারপর? তারপর কী?.."

সারবাগিশ সম্ভবত তার বিধবাকে যাচাই করতে চাইল। সে আর তাকে ধরিয়ে দিল না। কিন্তু মেয়েরকান এবারে নিজেই কথা খুঁজে পেল।

'তাকে ছাড়বি না, শক্ত করে ধরে রাখিস... নিজের সুখকে ছেড়ে দিলে সারা জীবন কষ্ট পেতে হবে... যখন টনক নড়বে তখন দেরি হয়ে যাবে...'

'ওঃ!' মেয়েরকান স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

তার কথাগুলো মেয়েটার মনে ধরেছে বলে মনে হল। সে শান্ত হল, গভীর চিন্তায় ডুবে গেল।

'আইগানিশ...'

'অ্যাঁ...'

'ও তোকে ভালোবাসে...'

'ভালোবাসে...'

'আর তুই?'

'হুঁ...'

'তা হলে ভালোবাসা মানে কী?' মেয়েরকান একদৃষ্টিতে মেয়েটির দিকে তাকাল।

'ভালোবাসা হল সুখ!..' মেয়েটি দৃঢ় স্বরে আওড়াল। তার পর সে সরাসরি, খোলাখুলি মেয়েরকানের দিকে তাকাল।

'তোমরা কী নিয়ে কথা বল?'

'পাহাড় নিয়ে।'

'আর?'

'চাঁদ।'

'আর?'

'মেঘ... ও আমাকে মেঘ নিয়ে পুরাণের গল্প বলেছে।'

'গল্পটা বল দেখি আমাকে।'

'সেই কবেকার কথা কেউ বলতে পারে না, সুলতান-সারি পাহাড়ের ওপরে ছিল দুর্বাঘাসে ঘেরা এক হ্রদ। কেউই তার কথা জানত না। মেঘ পাহাড়ে রাত কাটাত আর ভোরবেলায় হ্রদে নেমে এসে তার জলে পিপাসা মেটাত। পিপাসা মেটানোর পর কালো মেঘের দল হয়ে দাঁড়াত সাদা ধবধবে, তারা সুন্দরী কিশোরীদের মতো নরম ভঙ্গিতে আকাশে উঠে যেত। একবার এক শিকারীর তা চোখে পড়ল। তার বয়স্থা মেয়ে রোগে একেবারে কালো হয়ে গিয়েছিল। শিকারী তার মেয়েকে হ্রদের কাছে নিয়ে এলো, তার মুখ ধোয়াল, চোখের পলকে মেয়ের মুখের বর্ণ হয়ে দাঁড়াল ধবধবে, ফরসা, তাকে দেখতে হল যেন রূপকথার

পরী। নানা জায়গা থেকে তার সম্বন্ধ আসতে লাগল। এই অলৌকিক ঘটনা খানের কানে গেল। তাঁর ইচ্ছে হল নিজের মেয়েকেও অমন সুন্দরী করে। শিকারীকে ডেকে পাঠালেন। জেরা করলেন। শিকারী অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। শেষে ওকে ফাঁসিতে লটকানোর হুকুম হতে হ্রদের রাস্তা দেখাতে রাজী হল। খান মেয়েকে হ্রদে মুখ ধুতে বললেন। জলে খানের মেয়ের মুখে সাদা রং ধরল। কিন্তু মেয়ের এটা কম মনে হল। তার সাধ হল হ্রদে স্নান করার। কিন্তু জলে নামামাত্রই হ্রদ টগবগ করে উঠল, খানের মেয়েকে ভেতরে টেনে নিয়ে গেল। ফুটন্ত জলের ফেনায় দেখা গেল রক্ত, সে রক্ত গোটা হ্রদকে রাঙিয়ে দিল। হ্রদের চারধারের ফুল নেতিয়ে পড়ল। মেঘ আর হ্রদে নামে না, তার জল পান করে না, কেবল তার ওপর ভেসে বেড়ায়। তখন থেকে লোকেও জলের কদর করতে শিখল...'

"সুখে থাক!" মেয়েটি চুপ করে যেতে মেয়েরকান মনে মনে তাকে আশীর্বাদ করল। "ঝগড়াঝাঁটি করে কাটানোর চেয়ে একে অন্যকে রূপকথা শোনানো ভালো!"

আইগানিশকে ইঞ্জেকশন দেওয়ার জন্য সিস্টার এলো।

"এখানে আবার আমি আটকে পড়লাম কী করতে?" মেয়েরকান চুপচাপ বেরিয়ে গেল।

আপিসা যেখানে কাজ করে সেই ঘরের দিকে মোড় নিল।

'তিরিশ কোপেক!..' আপিসার কণ্ঠস্বর শোনা গেল। ও বরাবরই এইভাবে রোগীদের সঙ্গে দর কষাকষি করে।

মেয়েরকান থমকে দাঁড়াল।

"নচ্ছার আর কাকে বলে। বিবেকের বালাই রেখেও যদি নিত! ওর কথাগুলো শুনতেও ইচ্ছে হয় না।" সে দরজা থেকে কিছু দূরে সরে গিয়ে দাঁড়াল। ঠিক করল করিডরে আপিসার জন্য অপেক্ষা করবে।

আপিসা শিগ্‌গিরই বেরিয়ে এলো।

'দাঁড়া দেখি আপিসা!' মেয়েরকান ওর পথ আগলে দাঁড়াল। 'আচ্ছা,

দাড়ি কামানোর জন্যে দশ-পনেরো কোপেক কি তোর কম না কি? লজ্জাও করে না! লোককে ঠকানো কেন?'

'তা বাঁচতে হলে দরকার ত...'

"মা গো, লজ্জা সরমের বালাই নেই, সোজাসুজি এমন কথা বলতেও পারে!.."

মেয়েরকান আপিসাকে ভালোমতো জানে। ওকে নিয়ে মুশকিল!.. স্বামী যুদ্ধে মারা যায়। বাচ্চাটাকে দিয়েছে বোর্ডিং স্কুলে, এখন ঝাড়া হাত-পা। দু-তিনটে স্বামী পাল্‌টেছে। আমোদ-আহ্লাদ করে জীবনটা কাটিয়েছে!.. মেয়েলোক হলে কী হবে, মদ খাওয়ার দোষও আছে।

'বাড়তি পনেরোটা কোপেকে আর বড়লোক হয়ে যাবি না, আপিসা...'

'যা-ই হোক না কেন, তোর চেয়ে ভালো আছি। তোর তাতে কী? যা যা, ঘর মোছ গে!'

'আমার তাতে কী, বলছিস? তোর ভালোর জন্যেই বলছি। ভাবি, হয়ত তুই শোধরাবি। তোর জন্যে মনে কষ্ট হল। বড় ডাক্তারকে বলে দিলে তোর চাকরিটা যাবে।'

আপিসা ভাবিত হয়ে পড়ল।

'মেয়েরকান... আমার আর তোর একই ভাগ্য...'

'না, এক নয়!'

মেয়েরকান এর পর অনেকক্ষণ শান্ত হতে পারল না। সে সোফায় বসে পড়ল, ভেতরের কাঁপুনি চাপার চেষ্টা করল। ওয়ার্ড থেকে কুলমাত খবরের কাগজ হাতে বেরিয়ে এলো, সামান্য ঝুঁকে পড়ে ওর মুখের দিকে তাকাল। মেয়েরকান জিজ্ঞেস করল:

'কাগজে কী লিখছে?'

'যুদ্ধ!..'

'মা গো! কোথায়, কিসের যুদ্ধ?'

'ভিয়েতনামে!'

'কবে শেষ হবে এই হতচ্ছাড়া জিনিস?'

মেয়েরকানের আবার কাঁপুনি ধরল। তার বুকে যেন জ্বলন্ত কয়লা এসে পড়ল।

...যুদ্ধ!

ঐ দিনটিতে সূর্যে যেন গ্রহণ লাগল।

এক দিনে ঘাসপাতা হলুদ হয়ে গেল, নেতিয়ে পড়ল...

সেই ভোর অবধি কান্না...

শোকে লোকে চোখেমুখে অন্ধকার দেখতে লাগল।

রাতটা ছিল নেহাৎই ছোট!.. মেয়েদের চোখের জল পুরুষদের মুখ ভিজিয়ে দিল।

'কবে এর শেষ হবে? অ্যাঁ?'

কুলমাত যে কুলমাত, যে ছোকরা বকবক করতে ওস্তাদ, সে-ও চুপ!

'পরিচারিকাদের শ্রমের মর্যাদা দিন!' — দেয়ালের ওপর লেখাটি মেয়েরকান পড়ল। এই লেখাটি ওর ভালো লাগে না। "এর কী দরকার? কেন লেখা হয় না সিস্টার ও ডাক্তারদের শ্রমের মর্যাদা দিন?"

ডাক্তাররা আইদারের কাছ থেকে বেরিয়ে যাওয়ামাত্র মেয়েরকান লাফিয়ে উঠে পড়ল। ওয়ার্ডে ঢুকল। উৎকণ্ঠাভরে তার দিকে তাকাল। "তা হলে কি তুমিও?.." ভয়ঙ্কর চিন্তাটাকে সে সঙ্গে সঙ্গে দূর করল। আইদার বোধহয় ঘুমুচ্ছিল। শুয়ে ছিল, যেন অসাড়। ইঞ্জেকশনের পর অবিশ্যিই...

আইদারের শিয়রে অক্সিজেন সিলিন্ডার, যেন পাহারাদার। ওঃ, কী বিচ্ছিরি!.. মেয়েরকানের দারুণ ইচ্ছে হচ্ছিল ওটাকে বেড থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, আইদারের পাশে গিয়ে বসে।

ওকে বরং রক্ষা করুক পাহাড়!.. রক্ষা করুক সূর্য!..

জানলা থেকে উঁকি মারছে উঁচু উঁচু পাহাড়।

"তোমরা দেখছ ওর কী অবস্থা?" মেয়েরকান ভুরু কুঁচকে সেদিকে তাকাল।

সঙ্গে সঙ্গে আবার দৃষ্টি ফিরে গেল অন্য পাহাড়ের দিকে — দেয়ালে পাহাড়ের যে ছবি ঝুলছিল তার দিকে। ওরা কেন তার মনে অমন করে নাড়া দেয়?..

পর্বতশ্রেণীর শেষ খাঁজটি পর্যন্ত সূর্যের আলোয় আলোকিত। ছায়া সরে গেছে, লুকিয়ে পড়েছে, উজ্জ্বল কিরণে সবকিছু উদ্ভাসিত, ঝকমকিয়ে উঠেছে। সবই সত্যিকারের, কেবল ছোট আকারে। মাটি আর ফুলের উষ্ণ ঘ্রাণ ভেসে আসছে। ঝরণার মর্মরধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

মেয়েরকান হঠাৎ এই পাহাড়ের শ্রেণীর দিকে উড়ে চলল। সে হয়ে গেল একেবারে ছোট্টটি, গিয়ে উঠল পাহাড়ের চুড়োয়। দমকা বাতাস তার পোশাকের আঁচল উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। চুড়োগুলো সাদা চকচক করছে। সূর্যের কিরণে ধোয়া, ফুলের সাজ পরা পাহাড়!

সারবাগিশের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। একেবারেই কাছে। মেয়েরকান কণ্ঠস্বরের অনুসরণে ছুটে চলল। গুলির আওয়াজ হল... মেয়েরকান অধীর হয়ে পড়ল। কোথায় গেল ও, কোথায় সারবাগিশ? সারবাগিশ পাহাড়ী প্রেতাত্মায় পরিণত হয়েছে...

"কতকাল বাস করছি এই দুনিয়ায়, অথচ ভাবতেই পারি নি যে আমাদের দেশটা এত সুন্দর," মেয়েরকান মনে মনে অবাক হয়ে যায়। "দেখ দেখি! কী সুন্দর এই পাহাড়গুলো!.. দেখে দেখে আর আশ মেটে না। আমার চোখ কোথায় ছিল, এ সব আগে খেয়াল করি নি কেন?"

...অথচ সেই একই পাহাড়। মেয়েরকান এদের মধ্যে বড় হয়ে উঠেছে। সেখানে সে ফুল কুড়িয়েছে, ফুলের মালা গেঁথেছে, ছুটোছুটি করে বেড়িয়েছে, খেলাধুলা করেছে, সারবাগিশের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়েছে... সেই একই পাহাড়, যাদের সে বরাবর দেখে এসেছে চোখের সামনে।

"আইদার!.." মেয়েরকান ফুঁপিয়ে উঠল। "তোমার পাহাড় অনেক আগে থেকে ছিল আমাদের পাহাড়, আমার আর সারবাগিশের, ওরা ছিল আমাদের বুকের ভেতরে। তুমি বলেছিলে: 'এই জগতে আমরা

আমাদের জীবন রেখে যাই। মরণকে নিয়ে যাই সঙ্গে করে। জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে আমরা পৃথিবীতে আনি আলো, মরার সময় সঙ্গে করে নিয়ে যাই অন্ধকার।' তুমিই ঠিক, আইদার। তোমার পাহাড়ে পাহাড়ের ঘোর বৃথা যায় নি। এতকাল জীবন কাটালাম, এর আগে জানতেই পারি নি পাহাড় কী... এরই জন্য ত তুমি হাত থেকে তুলি ছাড় নি... এখন আমিও দেখতে পাই তোমার পাহাড়... তোমার জীবন বৃথা যায় নি..."

'মেয়েরকান চাচী!'

'অ্যাঁ...'

মেয়েরকান চমকে উঠল। সিস্টার ডাকছিল।

করিডরের শেষপ্রান্তে দেখা গেল আশিরকে। ওর কিডনিতে পাথর হয়েছে, এদিকে বয়স মোটে দশ বছর। চলছে যেন বুড়ো, মাথা নুইয়ে, বিপদ সে-ও আঁচ করতে পারছে। কখনও কখনও মেয়েরকানকে দেখতে পেয়ে তার কাছে ছুটে আসে। এখন যেন দেখতেই পাচ্ছে না। আইদারের সঙ্গে তার খাতির। একসঙ্গে বেড়াত, ওদের মধ্যে রূপকথার গল্প চলত, ধাঁধা আর তার উত্তর চালাচালি হত। মাঝে মাঝে মেয়েরকান ওদের আমোদ ফুর্তিতে যোগ দিত।

'হাত নেই, পা নেই, পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ল। কী জিনিস?' আইদার ধাঁধা ধরল।

'জানি, জানি! বল!' আশির চেঁচিয়ে উঠল।

"ওর মনটা খারাপ," আইদারকে আশিরের সঙ্গে খেলতে খেলতে শিশুর মতো হয়ে যেতে দেখে মেয়েরকান ভাবে। সে আর সহ্য করতে পারে না, নিজেও ওদের সঙ্গে যোগ দেয়।

'কুচ্ছিতের গায়ে বিদঘুটে...'

'উট...'

এটা মেয়েরকানের জানা ছিল।

'যেমন ফেলা পা, নড়ে উঠল কাঠ।'

'এটা কঠিন...'

'তা হলে হার মানছ?'

'এর উত্তর দেওয়া আমার কম্ম নয়... আরেকটা ধর।'

'গগাঁ কে?'

'কী বললে কগাঁ?.. না বাপু, তোমার কগাঁকে আমি চিনি না,' মেয়েরকান অমন নাম শোনে নি। আইদার হাসতে লাগল।

'গগাঁ — ছবি আঁকিয়ে।'

'তা আমি জানব কোত্থেকে?..'

'এই ত জানলে।'

মেয়েরকান কাগজে মোড়া চিনির মিঠাই পকেটে হাতড়াতে হাতড়াতে আশিরকে ইসারায় ডাকল। পাশে বসিয়ে ওকে আদর করল। বাচ্চাটা ছিল ফেকাসে, কেন যেন এদিক ওদিক তাকাত আর কাঁপত, অসহায়। এই একরত্তি -- তার এত কষ্ট! ওকে মিঠাই দিতে গিয়ে মেয়েরকান ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে আর কি!

দুপুরের বিশ্রামের পর আইদার চোখ খুলল। করিডরে কানাকানি চলছিল, অচেনা কোন এক মহিলা বড় ডাক্তারের কাছে গেছে। সে আইদারের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। তাকে স্মক দেওয়া হল, ওয়ার্ডে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হল। প্রথম দৃষ্টিতেই মহিলাকে মেয়েরকানের পছন্দ হয় নি। শিগ্গিরই জানা গেল যে সে হল আইদারের বৌ। হঠাৎ কোত্থেকে উদয় হল? মেয়েরকান অবাক। আইদার একবারও বৌয়ের কথা বলে নি। বৌ-ই যদি হবে ত দুমাসের মধ্যে এই প্রথম এলো কেন?

মহিলা যখন ওয়ার্ড থেকে বের হল সূর্য তখনও মধ্য আকাশে। সাদা চেহারা, রংচং লাগানো, বয়স বছর তিরিশেক। আশেপাশের কারও দিকে লক্ষ্য না করে করিডরে সূক্ষ্ম হিলের খটখট আওয়াজ তুলে এগিয়ে গেল, গা থেকে স্মক খুলে তাচ্ছিল্যভরে আলমারিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। মেয়েরকান এর মধ্যেই লক্ষ্য করল যে তার চোখ শুকনো।

ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে এলো ক্লান্ত।

'এ সব বৌয়ের ছিরি দেখ একবার!..' রাগে গজগজ করতে করতে ও বলল।

'তোমার তাতে কী?'

'আরে ওর বৌ ত বটে! একবার চুমুও যদি খেত। আইদারের মতো মানুষ হয়?.. অথচ ওর কপালে জুটল এমন মাগী, ফুঃ!..'

'আচ্ছা, হয়েছে হয়েছে...' মেয়েরকান ওকে শান্ত করার চেষ্টা করল।

'আমি ত আর ঘুমিয়ে ছিলাম না।' পাকেচক্রে ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী কুলমাত বিবরণ দিতে শুরু করল। ''এলে কেন?' ও আবার এখনও তার সঙ্গে কথা বলে! বড় বেশি রকমের ভালো মানুষ। আমি হলে ওটাকে আমার ত্রিসীমানায় ঘেঁসতে দিতাম না, চৌকাট থেকেই বিদেয় করে দিতাম। উত্তরে বলল, 'তোমার কাছে এলাম.' -- যেন কিছুই হয় নি। 'একেবারে ঠিক সময়ে,' আইদার শুনিয়ে দিল। তারপর তাকে বলল: 'বল দেখি শাহিদা, তুমি ত জানই, আমি তোমাকে কত ভালোবাসি। তা হলে আমার কাছ থেকে দূরে সরে গেলে কেন?' কী নরম স্বরেই না জিজ্ঞেস করল, কোন নিন্দাবাদ নেই, কোন অনুযোগ নেই। নিজের মর্যাদা হারায় না.. অথচ মহিলাটি? --- 'তোমার ছবি, তোমার বুনো পাহাড়পর্বত দিয়ে আমার হবে কী? নিজেই ওগুলো নিয়ে পরমানন্দে থাক গে! তুমি চিরকালই ওদের স্থান দিয়েছে আমার ওপরে। আমি চাই স্বামী!..' এই কথা বলল। আমি প্রায় লাফিয়ে উঠে ওকে ওয়ার্ড থেকে বার করে দিই আর কি!.. বালিশে দাঁত কামড়ে পড়ে থাকি। আইদার দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'তা হলে বলেছিলে কেন যে ভালোবাস?' একটু চুপ করে থেকে আবার বলল: 'আমি তোমাকে ভালোবাসি। এখনকার তোমাকে নয়। সেই তাকে ভালোবাসি যাকে আমি গড়েছি আমার স্বপ্নে... ভালোবাসি যৌবনকে...' দুজনেই অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। 'আচ্ছা খুলে বল দেখি কেন এলে?' উত্তরে সে বলল: 'আমি এখন ঘরের কর্ত্রী। তোমার উচিত সমস্ত সম্পত্তি আমার নামে উইল করে দেওয়া।' ঠিক এই কথা বলল। 'আমার ভালোবাসা আমার কাছেই থেকে যাবে,' আইদার দাঁতে দাঁত চাপল।

'আমাকে তোমার দরকার ছিল না, দরকার ছিল আমার জিনিসের। তা নাও!''

মেয়েরকান অবাক হয়ে চুপ করে রইল, একটা কথাও উচ্চারণ করার মতো ক্ষমতা তার ছিল না। করিডরে পুরনো ঘড়ি ঢং ঢং করে বেজে উঠল। ঘড়িব চেনের সঙ্গে বাঁধা ভারী লোহা প্রায় মেঝে অবধি নেমে এলো। ফুলের টবের ওপর মৌমাছির দল গুঞ্জন করে চলল...

সন্ধ্যার অন্ধকার পর্যন্ত মেয়েরকান আইদারের ওয়ার্ড থেকে কোথাও নড়ল না, ধারেকাছে ঘুরঘুর করতে লাগল। হঠাৎ অনুভব করল তার বুকের পুরনো ব্যথাটা যেন ঘনিয়ে আসছে। নাড়ির স্পন্দন বেড়ে গেল, বুক ধড়ফড়ানি শুরু হল। সে সিস্টারের কাছ থেকে বুক ব্যথার ড্রপ চেয়ে নিল।

খোলা হাওয়ায় বেরিয়ে এলো।

চাঁদনি রাত। চাঁদের পাশে মিটমিট করছে নিঃসঙ্গ একটি তারা। ঘাসের ভেতরে লাফালাফি করছে ব্যাঙের দল। ঝলকে ঝলকে উড়ছে বাদুড়েরা।

পাহাড়গুলো দিনের বেলায় যেমন দেখা যায় তার চেয়েও সুন্দর দেখাচ্ছে — সুবিশাল, রাতের নিস্তব্ধতায় জমাট বেঁধে আছে। নীরবতার মধ্যে যেন শোনা যাচ্ছে তাদের প্রবল নিশ্বাসপ্রশ্বাস। আর আকাশের চাঁদ তাদের সুপ্তিকে প্রহরা দিচ্ছে।

কোথা থেকে যেন বিষণ্ণ সুরের টুকরো ভেসে এলো।

বিশাল কালো পাহাড়ের স্তূপ সামনে এগিয়ে আসতে লাগল, প্রথমে ধীরে ধীরে, তারপর জোরে আরও জোরে। না, মেয়েরকানকেই যেন টেনে নিয়ে চলেছে কোন এক 'অপ্রতিরোধ্য' শক্তি। এমন কি সে হাঁসফাঁস করে উঠল।

লম্বা লম্বা ঘাস ছড়িয়ে আছে, যেন নারীর মুক্ত বেণী। জন্তুজানোয়াররা মেয়েরকানকে ভয় পায় না, দলে দলে, পালে পালে তার পাশ দিয়ে ছুটে যায়। মেয়েরকান একটা হরিণকে ধরে ফেলল, লাফাতে লাফাতে সামনের দিকে ছুটে চলল। পাহাড়পর্বত, গাছপালা,

ঘাস কাঁপছে, ক্ষিপ্রগতিতে পিছু হটছে। "এই ত ছুটতে ছুটতে গিয়ে দুনিয়ার শেষ সীমানায় পৌঁছুব, আমার যৌবনের নাগাল ধরব," মেয়েরকান ভাবে। বৃষ্টির ধারায় মাটির বুকে ঝরে পড়ছে রাশি রাশি সোনালী তারা, তাকে ঢেকে দিচ্ছে ঝকমকে ফুলকিতে।

উষা পৃথিবী জুড়ে প্রভাতী কুয়াসা ঢেলে দেওয়ার উদ্যোগ করছে।

'মেয়েরকান চাচী!'

'অ্যাঁ...'

সিস্টার ডাকছিল। মেয়েরকান ওকে কাজে সাহায্য করল। সিস্টারের বয়স কম, এই কিছুদিন হল পড়াশুনা শেষ করেছে। মাস তিনেক হল হাসপাতালে কাজ করছে। মেয়েরকান বুঝতে পারে যে গুরুতর অসুস্থদের নিয়ে তার ভয় ভয় করে। "অভ্যাস নেই," মেয়েটির আতঙ্ক ও আত্মবিশ্বাসের অভাব মনে মনে অনুভব করার সঙ্গে সঙ্গে সে ভাবল।

আইদার শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে ছিল। ওষুধ কাজ করেছে বলে মনে হল।

তার পাহাড়ও ঝুলছে যথাস্থানে।

মেয়েরকান ধুলো ঝাড়তে গিয়ে আইদারের নাইট টেবিলটা সামান্য সরাল। কতকগুলো কাগজ ছড়িয়ে পড়ল, প্রতিটিতে পাহাড়পর্বতের ছবি। ছোট ছোট পাহাড় ঝুরঝুর করে মাটিতে ঝরে পড়ল। 'এই ম'লো যা!..' পাহাড়গুলোকে একসঙ্গে জড় করতে করতে মেয়েরকান বিড়বিড় করে বলল। সেগুলোর মধ্যে ছিল এক মহিলার ছবি। বুকটা ধক্ করে উঠল। গতকালের সে-ই!

আইদারের দিকে তাকিয়ে দেখল। ও অল্প অল্প কাতরাতে শুরু করেছে। পাশেই অক্সিজেন। সূর্য আর পাহাড়ের বদলে — অক্সিজেন সিলিণ্ডার। করুণাজনক বদলী।

মহিলাটিকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। পাহাড় থেকে হাত নাড়াচ্ছে। হাসছে।

"কী হল আইদার, নিজের সমর্থনে কী বলবে?"

মেয়েরকানের হাতে মহিলার প্রতিকৃতি কাঁপতে থাকে।

"অমন মেয়েকে তুমি ভালোবাসলে কী করে? দেখছ, কেমন বাঁকা হাসি হাসছে! এর পক্ষে কি বোঝা সম্ভব কী ধন ছিল তার পাশটিতে? কিন্তু তুমি ত... হায় আল্লা!.."

মেয়েরকান ছবিটাকে কাগজের গাদার মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

আইদার মৃদু কাতরে উঠল।

মেয়েরকানের চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল বেরিয়ে এলো।

"বেচারি... তোমার সুখ নেই..." মেয়েরকান দীর্ঘশ্বাস ফেলল। "নিজের সুখ তুমি দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছ, লোককে বিলিয়ে দিয়েছ। আমিও তার ভাগ পেয়েছি... তুমি আমাকে দান করেছ পাহাড়... আমাকে সাহায্য করেছ পাহাড় খুঁজে পেতে... এখন তার সঙ্গে আমরণ আমার বিচ্ছেদ ঘটবে না। কেবল পাহাড়ের মধ্যেই আমি পেতে পারি আমার সারবাগিশকে... এ শিক্ষা আমাকে দিয়েছ তুমিই..."

সিস্টার বাক্তিগুল প্রবেশ করতে ওর ভাবসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল। উদ্বিগ্ন হয়ে সিস্টার আইদারের বেডের দিকে ছুটে গেল, তারপর ছুটে বেরিয়ে গেল করিডরে। মেয়েরকান -- তার পেছন পেছন!

'স্থির হ বাছা...'

'ডাক্তার দরকার!'

'ডাক ওঁকে।'

'উনি বাড়ি চলে গেছেন।'

'আমি যাচ্ছি ওঁকে ডেকে আনতে।'

মেয়েরকান গাছের গায়ে ধাক্কা খেতে খেতে অন্ধকারে ছুটতে থাকে। "আরে এই চাঁদটা... চাঁদটা গেল কোথায়?" হোঁচট খেয়ে হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে মাটিতে পড়ে গেল। লাফিয়ে উঠে সামনে ছুটল।

বড় ডাক্তারের কাঠের বাড়ির জানলায় দুমদাম ঘা মারল।

'আসানবাই!.'

ঘরের ভেতরে আলো জ্বলে উঠল।

'শিগ্‌গির চল... তৈরী হয়ে নাও... আইদার... ওর অবস্থা খারাপ... জলদি!..'

হাসপাতালে আবার ছুটোছুটি পড়ে গেল। মেয়েরকানের পা দুটো যেন বেড়িতে আটকানো, সে ওয়ার্ডের উল্টো দিকে করিডরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আতঙ্কে অপেক্ষা করতে লাগল কী হয়। "হয়ত খারাপ কিছুই নয়..."

অবশেষে বড় ডাক্তার ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে এলেন। তিনি চুপচাপ তাঁর কামরায় উধাও হয়ে গেলেন।

ফোঁপাতে ফোঁপাতে করিডর দিয়ে চলেছে বাক্‌তিগুল।

"তবে কী?.."

ঠোঁটজোড়া নীরবে নড়ে উঠল, বিস্ফারিত চোখে মেয়েরকান ওয়ার্ডে প্রবেশ করল।

আইদারের মুখ ঢাকা। পাশে অক্সিজেন সিলিন্ডার।

পাহাড়গুলো ঝুলছে — বিষণ্ণ, কালো কালো। সূর্যও যেন ম্লান।

মেয়েরকান আইদারের মুখের ঢাকা খুলল। তার হাত ধরে টানল। দুহাতে ওকে ঝাঁকাতে লাগল...

'আইদার, এই আইদার!.. তুমি মরতে পার না! পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে দেখ!.. ওঠো, দেখ! শুনতে পাচ্ছ?.. বরং আমি তোমার বদলে মরব!.. আইদার!.. সারবাগিশ!..'

তার বলিরেখা আঁকা মুখ বয়ে বড় বড় ফোঁটায় চোখের জল গড়িয়ে পড়ল।

'আইদার!.. ক্ষমা কর!.. সব মেয়ের হয়ে তোমার কাছ থেকে ক্ষমা ভিক্ষে করছি!..' তারপর কী হল মেয়েরকানের মনে নেই...

যখন ভোর হয়ে এলো, তখন সে দেয়াল থেকে আইদারের পাহাড় খুলে নিল, রুমালে মুড়ে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এলো।

ধীরে ধীরে পাহাড়ের দিকে পা বাড়াল...

চমৎকার সকাল। পাহাড়ের ঢালে দপ করে জ্বলে উঠল লাল টকটকে পপি ফুলের আভা। সূর্য কিরণমালার গালিচায় ঢেকে দিল পাহাড়পর্বত। মেয়েরকান চলছে ত চলছেই, সূর্যের কিরণমালা দিয়ে মালা গাঁথতে গাঁথতে চলেছে...

কুবাতবেক জ়ুসুবালিয়েভ

বসন্তের আগমন

মানুষ যখন পথে একা তখন কেন যেন সে স্মৃতিচারণে মগ্ন হয়ে পড়ে, স্মৃতিতে নিজের জীবনের নানা ঘটনা হাতড়ে বেড়ায়।

আর্গিনও প্রায়ই একা একা পথে বেরোয় কিন্তু স্মৃতি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে তার মোটেই মন চায় না — তার জীবনে উল্লেখযোগ্য এমনকিছুই ছিল না যা স্মরণ করতে ইচ্ছে হয়।

তাহলে আজ সদর থেকে ফেরার পথে সে তার ওর্লিকের পিঠে অমন চিন্তামগ্ন হয়ে বসে আছে কেন?

আমাদের নায়ক কিসের কথা ভাবছে?

দেখা যাচ্ছে আর্গিনেরও গভীর চিন্তায় পড়ার মতো কিছু আছে, তারও স্মরণ করার বিষয় আছে।

গোটা ব্যাপারটা শুরু হয় সেই দুর্ভাগ্যজনক দিনটি থেকে, যখন

তাদের গাঁয়ে এক-হাত-কাটা পশুপ্রযুক্তিবিদের আগমন ঘটল। কাসিমই তার মনকে বিকল করে দেয়। ঠিক এখানে, এই রাস্তার ওপরই তাদের প্রথম দেখা ও কথাবার্তা। কথাবার্তা কী থেকে শুরু হয় তা আর্গিনের মনে নেই, তবে কাসিম তাকে নিজের সম্পর্কে যা যা বলে সে সবই তার স্পষ্ট মনে আছে।

'আমি জন্মাই ডাকাতির বছরে।'

'ডাকাতির?'

'হ্যাঁ, আমার দাদী তা-ই বলতেন। একদিন রাতে আমাদের পাড়ায় বাসমাচ দস্যুদের হামলা হল। ওরা দোকান-পাট লুঠ করল, বাড়ি বাড়ি চড়াও হয়ে কমিউনিস্টদের খুন করতে লাগল। ঐ রাতে আমার মা-বাপ খুন হলেন।'

'মা-বাপ দুজনেই?'

'হ্যাঁ, বাসমাচরা আমাদের বাড়ি ঘেরাও করল। আমার মা-বাপের নাকি বন্দুক ছিল, তাঁরা অনেকক্ষণ ডাকাতদের ঠেকান, তারপর গুলি ফুরিয়ে যেতে নিজেরাই বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন, ক্ষিপ্ত জল্লাদেরা তৎক্ষণাৎ ওঁদের টুকরো টুকরো করে ফেলে।'

'আর ওরা, আপনার মা-বাবা কী ছিলেন?'

'বাবা ছিলেন অঞ্চল-কমিটির প্রধান সম্পাদক, আর মা — পার্টিকর্মী। কির্গিজিয়ার প্রথম কমিউনিস্টদের মধ্যে ওঁরা ছিলেন।'

'এ ঘটনা কবে ঘটেছিল?'

'ঘটেছিল বাইশ সনে। ঐ পোড়া বছরে আমরা যারা যারা জন্মেছিলাম তাদের অল্প কয়েকজনই রক্ষা পায়... যুদ্ধে আমাদের প্রায় সকলকে মেরে-কেটে ফেলে। তা আপনার বয়স কত?'

'উনত্রিশ।'

'আপনার বয়স দেখছি একেবারেই কম!'

আর্গিন অবাক হয়ে গেল। ওর বয়সটা কম হল কিসে? ও বহুকাল যাবৎই নিজেকে প্রায় বুড়ো বলে ধরে আসছে।

'আপনার হাতে কী হল?'

এই আকস্মিক প্রশ্নে আর্গিন তখন যেভাবে হতচকিত হয়ে পড়েছিল তা মনে হতে সে এখনও কাঁপুনি অনুভব করল।

'দৈবাৎ... কুড়ুল দিয়ে...'

'চেহারায় ত দেখছি অল্পবয়সী, এদিকে ডান হাতের আঙ্গুল নেই।'

'কাঠ কাটতে গিয়ে...'

'ফৌজে কাজ করেছেন?'

'না, না। এই ত, এই হাতের জন্যে।'

'বুঝলাম।'

ওঃ, আর্গিন তখন কী ভয়ই না পেয়ে গিয়েছিল! ওর দম পর্যন্ত আটকে আসছিল। কাসিম তাকে আরও জিজ্ঞেসবাদ করে বসে এই ভয়ে সে নিজেই তাকে জিজ্ঞেস করল:

'কিন্তু আপনি কী করে বেঁচে গেলেন?'

'যুদ্ধে?'

'না, না, ডাকাতির বছরে।'

'তখন আমাকে বাঁচান আমার দাদী। কম্বলে জড়িয়ে আমাকে নিজের বুকে চেপে খাটে শুয়ে থাকেন, খাট থেকে ওঠেন না। দস্যুরা আমাকে দেখতে পেল না, আর বুড়িকে ছুঁল না — ওর কাছ থেকে আর কী নেওয়ার আছে?..'

ওরা অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলছিল, এমন সময় কাসিম তার বাঁ হাত বাড়িয়ে দিল। হাতের আঙ্গুলগুলো সুন্দর, লম্বা লম্বা। সে হেসে বলল:

'আমি আমার গোটা বংশবৃত্তান্ত বললাম, অথচ এখনও পরিচিত হই নি,' এই বলে আর্গিনের শক্তসমর্থ, কদাকার হাতের কব্জিতে চাপ দিয়ে যোগ করল: 'এমন শক্ত হাতটা কিনা নষ্ট করে ফেললেন... একটু সাবধান হওয়া উচিত ছিল...'

শরতের শেষ। উত্তাল জাশোলু নদী রীতিমতো শুকিয়ে গেছে, এখন নালার মতো ধীরে ধীরে কুলুকুলু আওয়াজ তুলছে। জল

ছিল স্বচ্ছ, তার ভেতর দিয়ে রং-বেরংয়ের নুড়িপাথর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। পথের পাশে যে কচি বার্চ গাছটি বেড়ে উঠেছে তার সোনালী বসনের খসখস শব্দ অল্প কানে আসে। গাছের তলায় নিঃসঙ্গ কবরটির ওপর থেকে শুকনো পাতা খসে পড়ছে...

'শরৎকাল,' অন্যমনস্কভাবে কাসিম উচ্চারণ করল।

'শরৎকাল ত কী হল?'

'না, অমনিই...'

কাসিমের মুখটা হঠাৎই করুণ হয়ে এলো। সেদিকে তাকিয়ে আর্গিন আচমকা আপন মনে এই জায়গাটার বৃত্তান্ত ওকে দিল।

'বুড়োরা বলে, এই উত্তর পাড়টা আগে ঘন বনজঙ্গলে ঢাকা ছিল। সর্বত্র বাবলা আর বার্চ গাছ... কোন ষাঁড় পথ হারিয়ে একবার এখানে এসে পড়লে দশ দিন ধরে তার খোঁজাখুঁজি চলত। আর এখন পড়ে আছে কেবল গুঁড়ি...'

'কষ্ট হয়, তাই না?'

'কষ্ট হওয়ার কী আছে?'

'এই যে লোকে গাছপালা নষ্ট করে ফেলল।'

'বাঃ, তার জন্যে কষ্টের কী?'

'কী মানে?.. অমনি অমনিই ত আর বলা হয় না যে বন হল পৃথিবীর শ্রী! তাকিয়ে দেখুন ঐ বার্চ গাছ দুটোর দিকে! পাশাপাশি দাঁড়িয়ে, অথচ দুয়ের মধ্যে কত তফাৎ। একটা বাঁকা, কুঁজোর মতো দেখতে, অন্যটা ছিমছাম, সুন্দরী!'

আশ্চর্য ব্যাপার! কতবার আর্গিন এ পথে এখানে ওখানে পিঁপড়ের মতো হেঁটে গেছে, অথচ কখনও তার নজরেই পড়ে নি যে একটা বার্চ গাছ বাঁকা...

এখন প্রশস্ত নদীগর্ভ জুড়ে আছে নীলাভ জমাট বরফ। এখন তলায় রং-বেরংয়ের নুড়িপাথর চোখে পড়ে না। কেবল কোথাও কোথাও বরফের নীচ থেকে উঁকি মারছে বড় বড় পাথরের চাঁই। গুঁড়িও

দেখা যায় না। সেগ‌ুলো তুষারের নীচে। আর বরফও এই শীতে পড়েছে ঘোড়ার ব‌ুকসমান। বরফের নীচে চাপা পড়ে গেছে কাঁটাঝোপ আর ব‌ুনোফলের ঝোপঝাড়। কখনও এখানে কখনও বা ওখানে ঝলক দেয় পায়ের দাগ। এগ‌ুলো খরগোশের। শেষ কিছ‌ুদিনের মধ্যে যৌথখামারের ফার্ম থেকে অনেক পালিয়ে গেছে।

আচ্ছা, সত্যিই ত, আর্গিন এ সব দেখছে কেন, এ সব লক্ষ্য করছে কেন?

সে নিজেই অবাক। আস‌ুন, ওর মনের কথা না হয় আড়ি পেতে শোনাই যাক।

"কাসিম দেখানোর আগে এ সব আমার নজরে আসে নি কেন?" আর্গিন মনে মনে বলল। "কেন?.. এর কোন একটা উত্তর ত নিশ্চয়ই আছে!"

কোন অঙ্কের সমাধান খ‌ুঁজে না পেলে ছোট ছেলের যেমন অবস্থা হয়, তারও তেমনি মন খারাপ হয়ে গেল। এমন সময় ওর্লিক থমকে দাঁড়াল। ঘোড়া যেদিকে ঘাড় ফেরাল সেদিকে তাকাতে আর্গিন দেখতে পেল একটা বার্চ গাছ নেই। স‌ুন্দরীটাকে কে যেন কেটে নিয়ে গেছে... কাটা গ‌ুঁড়ি সাদা ধবধব করছে। আর চারদিকে কাঠের ছিলকে এবং ব‌ুড়ো মান‌ুষের চামড়ার মতো কোঁচকানো ছালবাকল। আর্গিনের মনে পড়ল, কাসিম সেদিন তাকে বন সম্পর্কে বলছিল: 'কষ্ট হয়, তাই না?'

ওর্লিক দাঁড়িয়ে ছিল কাটা গ‌ুঁড়ির দিকে একদ‌ৃষ্টিতে তাকিয়ে, যেন বলতে চাইছিল: 'না, লোকে বোঝে না কোনটা ভালো কোনটাই বা মন্দ।'

শরৎকালে যখন তারা সবে শীতকালের ভেড়ার খোঁয়াড় দেখাশোনার জন্য এখানে বদলি হয়ে আসে তখন আর্গিনের বৌ আনারখান সবার আগে জানতে পারল যে সিনেমা দেখানোর গাড়ি এসেছে। স্বামী রাগে বিড়বিড় করা সত্ত্বেও সেদিকে আমল না দিয়ে সে তাকে ছবি দেখার জন্য অন‌ুনয় বিনয় করে।

'আমরা একেবারে বুনো হয়ে গেছি.' আয়নায় মুখ দেখতে দেখতে কাঁদো কাঁদো স্বরে আনারখান বলল।

আর্গিন যখন বলল যে সারা জীবনে সে মোটে তিন বার সিনেমায় গেছে, তখন আসিলবেক মুগ্ধ দৃষ্টিতে বাবার দিকে তাকাল।

'বাপজান, তা হলে ত অনেক। আর আমি দেখেছি মোটে একবার,' এই বলে সে তর্জনী তুলে দেখাল।

'এখনও সময় যায় নি! বাচাল কোথাকার!' আর্গিন ওকে ধমক দিল।

আসলে কিন্তু পাঁচ বছরের ছেলের কথায় তার মানে লাগল। মোট কথা, ওরা যখন খোঁয়াড় বন্ধ করে একের পর এক তিনজনে ঘোড়ায় উঠল এবং অবশেষে সূর্যাস্ত নাগাদ গাঁয়ে গিয়ে পেঁছুল ততক্ষণ সিনেমা শুরু হয়ে গেছে। খোলা আকাশের নীচে, সোজা ক্লাবের কালো রংধরা দেয়ালের ওপর দেখানো হল ফিল্ম — 'পাহাড়ের চৌকি'। এইভাবে আগাগোড়া ঘোড়ার পিঠে বসে বসেই তারা ছবি দেখল।

বাড়িতে ফিরল মাঝরাতে।

'বরং ঘুমোলে কাজ দিত... আর সিনেমাই যদি হয় ত 'টার্জন'-এর মতো হলে বুঝি,' বিষণ্ণভাবে আর্গিন বলল।

'রোমিও-জুলিয়েট,' আনারখান আনমনে উচ্চারণ করল।

'ওর্লিক. কী চালাক ঘোড়া ওর্লিক,' দুরন্ত ছেলে আসিলবেক খুশি হয়ে বলল।

ওর্লিক চিঁহিঁহি ডেকে উঠেছিল।

"পশু হলে কী হয়, বোঝে," ওর্লিক সম্পর্কে আর্গিন তখন ভেবেছিল। আর এই এখনও ত ওর্লিক তার প্রভুর আগেই লক্ষ্য করেছে যে বার্চ গাছটা কেটে ফেলা হয়েছে।

আর্গিন যত বেশি করে তার ভাবনাচিন্তার হাত থেকে পলায়নের চেষ্টা করে ততই জোরে তারা ওকে আঁকড়ে ধরে। আর্গিন নিশ্বাসের

সঙ্গে ঠাণ্ডা বাতাস টানল. বেশ কিছুক্ষণ কাশল. বার কয়েক ওর্লিককে চাবুক মারল।

চোখের সামনে আবছা হয়ে দেখা দিল রক্তমাখা কুড়ুল, ছিটকে পড়ল আঙ্গুল। কুকুর কাবিলান ছুটে এলো, মাথাটা সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়েই পিছিয়ে গেল। ভয় পেয়ে গেছে। সাদা বরফের ওপর দুটো মাংসের টুকরো থেকে রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়ছে। হঠাৎ কাটা আঙ্গুল দুটো রূপ নিল তার ভাইদের, যারা যুদ্ধে মারা গেছে। তারা দাঁড়িয়ে আছে রক্তাক্ত অবস্থায়, হাতে তাদের ছুরি...

আর্গিন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ল। এই বিকট স্বপ্নটা তার মনে পড়ল কী করতে?

আর্গিন সর্বাঙ্গে দুর্বলতা অনুভব করল। নিজের ভাবনার কুয়াসার মধ্যে সে যেন আবার দেখতে পেল কাসিমকে।

একবার ও সরাসরি আর্গিনের চোখে চোখ রেখে বলল: 'আমাকে 'তুমি' বলো।' সে আরও বলে: 'মানুষকে চিরকাল নিজের সঙ্গে নিজে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকতে হয়। তবে এটা বোঝে কেবল সে-ই যে সব সময় নিজেকে পথযাত্রী বলে অনুভব করে।' এর দ্বারা কাসিম যে কী বলতে চায় আর্গিন তখন তা বোঝে নি। এখনও সে এটা বুঝতে পারে না। তবে কাসিমের চোখের পাতার দীর্ঘ ঘন রোমের আড়ালে চোখজোড়া ঝকঝক করতে দেখে সে যে কীভাবে সেখান থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছিল তা তার মনে আছে। তার মনে হচ্ছিল কাসিমের চোখ দুটো যেন পেঁচার চোখের মতো তীক্ষ্ন। লোকে বলে, পেঁচা অন্ধকারেও জলের ওপর সরু ডাল ভেসে থাকলে দেখতে পায়।

কাসিমের কথা আর ভাবতে সে চায় না, সে চায় না যে ওর তীক্ষ্ন দৃষ্টি সরাসরি তার বুকে এসে বেঁধে, তার গোপন রহস্য হাতড়ে বেড়ায়... না, না. এটা সে চায় না। এটা সে চায় না, যেমন সে চায় নি এক সময় সৈনিকের ওভারকোট গায়ে দিয়ে ব্যারাকে বাস করতে... আর এটা তার গোপন কথা. তার... বলাই বাহুল্য, কাসিমকে সে সত্যি কথা বলে নি!..

আর্গিন শিউরে উঠল, যেন ঘুম থেকে জেগে উঠল, আবার নিজের চিন্তায় সে ভীত হয়ে পড়ল।

'না! না! বলব না! কখনই না! কখনই না!' ও প্রায় চিৎকার করে বলল।

হাত থেকে চাবুক পড়ে গেল। কাসিম ওর দুচক্ষের বিষ, সে তার গোপনীয়তাকে স্পর্শ করেছে, তার শান্তি কেড়ে নিয়েছে। ওর কথা ভাবতে সে চায় নি।

আগে আর্গিন মনে মনে বলত: "কিছু নয়, আর দশজনের মতো জীবনটা কাটিয়ে দেব --- আর কী চাই?" কিন্তু এখন সে ওকথা বলতে পারে না, বলতে ভরসা করে না। সে যেন পাল থেকে পিছিয়ে পড়া পথহারা এক উটশাবক। এমন কি তার মনে হল উটশাবকের মরিয়া ডাক যেন সে শুনতে পাচ্ছে। বিষাদে তার মন ছেয়ে গেল। তার বড় ইচ্ছে হচ্ছিল কারও সঙ্গে কথা বলে, কারও ওপর বিশ্বাস রাখে, কাউকে তার গোপন কথা বলে। তা হলে হয়ত এই দুঃসহ বোঝা থেকে সে মুক্তি পেত।

আর্গিন চিরকাল নিঃসঙ্গ। তার মরহুম পিতারও পেশা ছিল রাখালী। তার চেহারা ছিল ছোটখাটো, রোদে পোড়া, কণ্ঠস্বর ছিল ভাঙাভাঙা। মা বেচারিকে সে ভয়ংকর পেটাত। আর্গিনের কপালেও জোটে, বিশেষ করে বড় ভাইয়েরা যখন যুদ্ধে মারা গেল। তারপর মা'ও মারা গেল বসন্তরোগে। বার্চ গাছের নীচে এই বিচ্ছিন্ন কবরটি তারই কবর। সেকেলে কির্গিজ প্রথা অনুযায়ী বসন্তরোগে কেউ মারা গেলে তাকে কবরখানায় কবর না দিয়ে আলাদা কবর দেওয়া হয়।

আর্গিন কোনক্রমে চার ক্লাস শেষ করেছে, আর পড়াশুনা করে নি। তারপর থেকে কত জলই না গড়িয়ে গেল... যুদ্ধ... দুঃখদুর্দশা... হানাহানি। অবশেষে বাপের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে আর্গিনের জুটল তার বেতের লাঠি। এখন তার নিজেরই ছেলে বড় হয়ে উঠেছে। আসিলবেকের অবধি বন্ধুবান্ধব আছে। আর ও সব সময় একা...

আগে কখনও, কখনই আর্গিন এ ব্যাপারে নিয়ে ভাবিত হয় নি।

অথচ এখন তার ইচ্ছে, তার দরকার কারও কাছে মনটা উজাড় করে দেওয়ার। সে কালা, বোবা, পাগল, রূপকথার মানুষখেকো রাক্ষস — যে খুশি হতে পারে। যে খুশি হোক, কিছু আসে যায় না, কিছু আসে যায় না! কিন্তু এমন প্রাণী নেই। ওর্লিক নেহাৎই ঘোড়া। সে অবশ্য তার প্রভুর মনোকষ্ট টের পায়। কিন্তু কীভাবে তাকে সাহায্য করতে পারে?

আর্গিন যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়ে। জিনের ওপর বসা অবস্থায় পেছনে হেলে সে আকাশের দিকে তাকাল।

'ও-হো-হো, ওগো মে-এ-ঘ!..' সে চেঁচিয়ে উঠল, হো হো করে হাসতে লাগল, তারপর নিজের কণ্ঠস্বরেই ভয় পেয়ে গেল।

অস্তগামী সূর্যের রক্তাভ হলুদ কিরণমালার মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছিল কালো মেঘের রাশি - যেন আগুনের শিখায় উজ্জ্বল ধোঁয়ার কুণ্ডলী।

আর্গিন গা ঝাড়া দিল। তার মনে হল কে যেন তার কাঁধ থেকে ভারী হাত সরিয়ে নিল। সঙ্গে সঙ্গে যেন হালকা লাগল। কিন্তু অদ্ভুত লোক এই আর্গিন! একা অন্ধকারের মধ্যে পড়লেই সে পেছন ফিরে তাকাতে ভয় পায়। তার মনে হয় কেউ বুঝি তার পিছু নিয়েছে। কখনও কখনও অদৃশ্য প্রাণীটির খনখনে গলা পর্যন্ত সে শুনতে পায়। তখন একটা দারুণ আতঙ্ক আর্গিনকে পেয়ে বসে। এমন ঘটনাও ঘটেছে যে চাঁদের আলোয় নিজের ছায়া দেখে সে চেঁচিয়ে উঠেছে।

আর্গিন ওর্লিকের পেটের দুপাশে লাথি ঝাড়ল, গালমন্দ করল।

'ওঃ, পশুদের মধ্যে তুই হলি মহা কুঁড়ে, আর মানুষের মধ্যে মহা কুঁড়ে হলাম আমি...'

কালো আঁধার চারপাশ ঢেকে দিল।

আর্গিনের এখন একমাত্র চিন্তা কত তাড়াতাড়ি বাড়ি পেঁছুনো যায়।

পশ্চিমে দেখা দিল এক ফালি চাঁদ। তারারা মিটমিট করতে লাগল।

কালো রংয়ের, এবড়োখেবড়ো শিলাখণ্ডের ওপর থেকে শোনা যাচ্ছে পেঁচার ভয়ার্ত ভুতুম-ভুতুম ডাক।

ঘেউ ঘেউ করতে করতে আর্গিনের মুখোমুখি ছুটে এলো কাবিলান। আনারখান মাথায় ওড়না দিয়ে দেউড়িতে দাঁড়িয়ে ছিল, তার গায়ে জড়ানো মখমলি লম্বা পোশাকের ভেতর দিয়ে তার ছিমছাম, তরুণী দেহরেখা আন্দাজ করা যাচ্ছিল।

'যাক, এসে গেছেন। এত দেরি কেন? আসিলবেক আপনাকে না দেখে হেদিয়ে যাচ্ছিল। আর আমি ত সেই কখন থেকে রাস্তার দিকে চেয়ে আছি!'

আর্গিন বরাবরের মতোই চুপ করে রইল। কেমন যেন এক বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে সে ঘোড়ার পিঠ থেকে ঝুড়ি খুলে মাটিতে নামাল।

'নাও, ঘরে নিয়ে যাও,' বৌয়ের দিকে ছুঁড়ে দিল, তারপর ঘোড়াটাকে নিয়ে চলল আস্তাবলে।

আনারখান যখন ঝুড়িটার দিকে হাত বাড়াল তখন চাঁদের আলোয় তার হাতের আঙটি চকচক করে উঠল। সে ঝট করে হাত সরিয়ে নিল, আবার হাত বাড়াল। আবার... বারবার... তিন বার। কিন্তু আঙটি আর চকচক করল না। নিজের এই নির্দোষ দুষ্টুমিতে মুচকি হেসে আনারখান ক্ষীণ চাঁদের রেখার দিকে তাকাল। তারপর আঙটিটা স্পর্শ করল। হয়ত নেহাৎই চোখের ভুলে সে দেখেছে যে আঙটি চকচক করছে। আঙটিটা ওকে নববর্ষ উপলক্ষে উপহার দিয়েছিল কাসিম।

দোর গোড়ায় আর্গিনের আবির্ভাব ঘটল।

'ওখানে কার ঘোড়া বাঁধা? কার ঘোড়া, শুনি?' সে পাথরে ঘা খাওয়া ভালুকের মতো গর্জে উঠল।

আনারখান কেঁপে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে আড়ষ্ট হয়ে জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল।

কাসিম অভ্যাসমতো ভেড়ার পাল পর্যবেক্ষণ করতে এসেছিল। সে দেখতে পেল যে আনারখান একা, একা একা পায়ে হেঁটে ভেড়ার পাল চরাচ্ছে: তার গায়ের পোশাক কাঁটাঝোপে ছিঁড়ে ফালা ফালা হয়ে গেছে, সে নিজেও অবসন্ন। তাই আর্গিন যতক্ষণ সদর থেকে না ফেরে

ততক্ষণের জন্য কাসিম নিজের ঘোড়াটা আনারখানকে দেয়। আর নিজে গেল আসিলবেকের গাধায় চেপে, ·· 'প্রায় ঘোড়াই বলা চলে', — সে বলল।

আনারখান স্বামীকে বলতে ভয় পাচ্ছিল ব্যাপারটা কী হয়েছিল। স্বামী অবশ্য উত্তরের ধারও ধারল না।

'ব্যাটা নিজে কোথায়? আমি নিজেই ওকে দেখে নেব! ওর যে হাতটা আস্ত আছে সেটাও ভেঙে দেব। আসে তখনই যখন আমি থাকি না... হ্যাঁ, তোরা দ্বজনেই টের পারি! তুই হলি আমার বৌ! কেবলই আমার! হাতকাটা নেকড়েটা গেল কোথায়?'

কৈফিয়ৎ দেওয়ার প্রবৃত্তি আনারখানের ছিল না। তার ত কোন দোষই ছিল না।

'কাসিম চাচা সম্পর্কে অমন কথা বললেন কী করে?..'

'বটে, কাসিম চাচা! চাচা? তুই হলি আমার বৌ! বৌ! শ্বনছিস? শ্বনছিস, আমি কী বলছি?'

কাবিলান কিঁউ কিঁউ আওয়াজ তুলল, প্রভুর আদর পাওয়ার মতলবে ছিল। কিন্তু আর্গিন তার মুখে লাথি কষিয়ে দিল। বেচারি কুকুর করুণ কণ্ঠে আর্তনাদ করতে করতে পাপ থেকে দূরে গা ঢাকা দিল।

'মাথা গরম করো না। আর্গিন। সুস্থ মাথায় ভেবে দেখ। ভালো করে বোঝার চেষ্টা কর, অমন ব্যবহার করা ঠিক না। আমাদের দ্বজনেরই যখন বয়স বাড়বে, যখন তুমি হবে উস্কোখুস্কো চেহারার এক বুড়ো আর আমি হব মোটাসোটা বুড়ি তখন নিজেদের যৌবনের কিছুই মনে করার মতো আমাদের থাকবে না! কী, কী-ই বা আমরা তখন মনে করতে পারব? তোমার খারাপ ব্যবহার!' আনারখান এই প্রথম স্বামীকে 'তুমি' বলল। সে বিষণ্ণ হয়ে আকাশের একফালি চাঁদের দিকে তাকাল, ওড়নার প্রান্ত দিয়ে চোখ ঢেকে কাঁদতে লাগল।

আর্গিন কী বলবে ভেবে পেল না। সে মনে মনে আহত হয়ে কুঁকড়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ওরা খেতে বসল।

'রেডিও ফ্রুঞ্জে। শেষ সংবাদ শুনুন।' ট্রানজিস্টার থেকে মহিলার মার্জিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল। আর্গিন বাচ্চাদের মতো হাঁ করে শুনছিল। ঘোড়ার পিঠ থেকে ঝুড়িটা যে সে অত সন্তর্পণে খোলে তা অকারণে নয়, ওতে এই ট্রানজিস্টারটা ছিল।

এবারে বাড়ি আর্গিনের কাছে সম্পূর্ণ অন্য রকম মনে হল। বিছানা, তাকের ওপর বাসনপত্র, এমন কি দেয়াল -- সব, সব হয়ে উঠল প্রাণবন্ত, যেন কথা বলে উঠল। আর ঘোষকের পরের কথাগুলো কানে যেতে আর্গিন থালা সরিয়ে না রেখে পারল না।

রেডিও খবর দিল যে তাদের উঁচু পাহাড়ী এলাকায় বিশিষ্ট পশুপালকদের সম্মেলন সমাপ্ত হয়েছে... যে সব সেরা রাখাল বিভিন্ন রকমের ট্রানজিস্টার পুরস্কার পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন তোওবায়েভ আর্গিন।

'খবরটা এত তাড়াতাড়ি ফ্রুঞ্জেতে পেঁছে গেছে!' আর্গিন অবাক হয়ে গেল।

'শুনছ, আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা,' আনারখান বলল।

'ও, এ হল সেই, যে শরৎকালে এসেছিল, আমাদের তিনজনের ছবি তুলেছিল। পাঠাবে বলে কথা দিয়েছিল, কিন্তু পাঠাল না,' আর্গিন সরলভাবে বলল। সে বুঝতে পারছিল না কীভাবে নিজের আনন্দ গোপন করা যায়।

সেই রাতে আসিলবেকের অনেকক্ষণ ধরে ঘুম এলো না। সে কখনও বাবাকে ডাকে, কখনও মা'কে। শেষকালে বাপের গলা শক্ত করে জড়িয়ে ধরে ছেলে বলল: 'আমি তোমাকে ভালোবাসি বাপজান।' এই বলতে বলতে সে ঘুমিয়ে পড়ল। চুল্লির আগুন নিভে গেছে। আর্গিন ছেলের নিশ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ শোনে, কেবল ভাবে আর ভাবে।

আনারখান অনেকক্ষণ এপাশ ওপাশ করে ঘুমিয়ে পড়ল। সে স্বপ্নে কাসিমকে দেখল। কাসিম আনাড়ির মতো আসিলবেকের গাধার পিঠে

বসে আছে, তার লম্বা লম্বা ঠ্যাং দুটো মাটিতে ঘষটাচ্ছে। আনারখান ঘুমের মধ্যে জোরে হেসে উঠল।

আর্গিন ঘুম থেকে উঠে জামাকাপড় পরে উঠোনে বেরিয়ে এলো। ভোর হয় হয়। খোঁয়াড়ের মাঝখানে, খুঁটির ওপর ধোঁয়ায় কালো লণ্ঠনটা সামান্য মিটমিট করছে। "নেকড়েরা আগুনকে ভয় পায় কেন?" আর্গিন ভাবল, সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ে গেল সেই মেয়েটির কথা, যাকে নেকড়েরা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলেছিল।

মেয়েটার নাম যেন কী?

আজার... আজার... আহা, বেচারি... বহুকাল আগের পড়া বই। আর কিছু তার মনে পড়ল না। কেবল শেষ পাতাটা! তার তখন বড় রাগ হচ্ছিল সেই লোকটার ওপর, যে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলেছিল: 'বিদায়, আমার আদরের আজার!' সে মনে মনে তাকে গালাগাল দিল, কাঁদল। "লোকটা ওকে বাঁচাল না কেন?"

আর্গিন তখনও ছোট। 'আজার' ছিল তার পড়া প্রথম ও শেষ বই। কে যে তার লেখক তাও ওর মনে নেই।

আর্গিনের বাড়িতে ফিরতে ইচ্ছে করছিল না। সে শুকনো ঘাসের গাদার ওপর গিয়ে শুয়ে পড়ল। ভোরের অপেক্ষা করতে লাগল।

সে নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে সময়ের আগে কেটে রাখা শুকনো ঘাসের ঘ্রাণ নিল, বসন্তের কথা ভাবতে লাগল। কাসিমের সঙ্গে এই কিছুদিন আগের কথাবার্তা তার মনে পড়ে গেল।

'ওঃ, বসন্ত! বসন্ত কী চমৎকার! আমি বসন্তকাল সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি। বিশেষ করে পাহাড়ে বসন্ত চমৎকার!'

'আমি বেশি ভালোবাসি শরৎকাল,' আর্গিন বলল।

'সে কি, বসন্ত ভালোবাস না? সব লোকেই ত তার অপেক্ষায় থাকে!' কাসিম অবাক।

'কিন্তু আমি অপেক্ষা করি না। এর মধ্যে খারাপ কিছু ত আমি দেখতে পাচ্ছি না,' আর্গিন মেজাজ দেখিয়ে বলল। তার মনে হচ্ছিল আনারখান কেমন যেন বিশেষভাবে কাসিমের দিকে তাকাচ্ছে আর

গোগ্রাসে তার প্রতিটি কথা গিলছে! ওর হাত থেকে পেয়ালা পড়ে গিয়ে যে চা চলকে পড়ল সেটা ত আর অমনি অমনি নয়। ও নিজেও লজ্জায় লাল হয়ে গেল। আর্গিন কি সাধেই রাগে জ্বলে উঠেছে?

কিঁচ কিঁচ করে ওর কানের পাশ দিয়ে দৌড়ে গেল একটা ইঁদুর। আর্গিন নাক কোঁচকাল। চোখ বুঁজল। জঘন্য, চিম্‌সে গন্ধ...

আবার তাকে পেয়ে বসল বসন্তের ভাবনা। অন্তত একটা বসন্তও কি তার মনে পড়ে? না। গতকাল কী কান্নাটাই না কাঁদল আনারখান, কী করুণ স্বরেই না সে বলল: 'নিজেদের যৌবনের কিছুই মনে করার মতো আমাদের থাকবে না...' আর স্মৃতিতে কেন যেন ভেসে উঠল কাটা বার্চ গাছের সাদা গুঁড়ি।

আচ্ছা, আনারখান হঠাৎ বার্ধক্যের কথা বলল কেন? অদ্ভুত ব্যাপার। আর্গিন এই প্রথম তার বৌয়ের কথা ভাবল। তার আর শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করছিল না। সে উঠে পড়ল, পুব আকাশের দিকে তাকাল। ফরসা হয়ে আসছে। নতুন দিন!

শুরু হল কষ্ট ও শ্রমে, আনন্দ ও বিষাদে পরিপূর্ণ, আলো ও ভালোবাসায় পরিপূর্ণ এক নতুন দিন।

কিন্তু আর্গিন দেখতে পাচ্ছিল কালো কালো পাহাড়। ওখানে প্রাণ হারিয়েছে ওর বাবা।

কে জানে ব্যাপারটা কীভাবে ঘটল? এটাও হয় বসন্তকালে। জায়গায় জায়গায় বরফ গলে গিয়ে কচি ঘাস তখন দেখা দিয়েছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে ভেড়ার পাল খোঁয়াড়ে ফিরে এলো, কিন্তু তাদের সঙ্গে বাবাকে দেখা গেল না। সকালবেলায় পাহাড়ের এই শিলাটার নীচে পাওয়া গেল বাবার পিষ্ট দেহ আর একটা ভেড়ার লাশ।

আর্গিনের সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল। সে কথা মনে না করাই ভালো। সকাল যে হয়েছে এটা ভালোই। ভেড়াগুলোও নড়েচড়ে উঠেছে। আর্গিন ওদের শুকনো ঘাস দিয়ে ঘোড়াগুলোর কাছে গেল। সকালের সাদাটে ছায়া তার সঙ্গে সঙ্গে চালাঘরে প্রবেশ করল, ওর্লিকের গায়ে

এসে পড়ল। ওর্লিক হলদে কাদামাটির ওপর শুয়েছিল, একটু একটু কাঁপছিল। পাশে দাঁড়িয়ে ছিল কাসিমের ঘোড়া।

'উঃ! গ-র্দ-ভ!' আর্গিন রেগে ওর্লিকের পাছায় হাই বুটের ঘা কষিয়ে দিল।

ওর্লিক মাথা ঘুরিয়ে কাতর দৃষ্টিতে প্রভুর দিকে তাকাল।

'হারামজাদা!' সে আরেক ঘা বসিয়ে দিল।

ওর্লিক ধীরে ধীরে উঠল। কাসিমের ঘোড়াটা যদি হলদে কাদার মধ্যে গড়াগড়ি যেত তা হলে আর্গিন কখনই তাকে ওঠাতে যেত না...

ঘোড়া দুটো চবর চবর করে শুকনো ঘাস চিবোতে লাগল। গামলা থেকে নাকে এসে লাগল ঘাসের ফুল-ফুল গন্ধ। এমন কি টাটকা নাদেও বসন্তের ঘ্রাণ।

অথচ বসন্ত এখান থেকে এখনও দূরে। অনেক দূরে... যেন এখন এখানে, এই পাহাড়ে আর আসবেই না। বসন্ত... উঁচু উঁচু ঘাস। শিশির। বুটজোড়া কাঁধে ফেলে রাখালেরা খালি পায়ে ভেড়ার পাল চরায়। নানা রকম ঘাসের ফলা পায়ের গোড়ালিতে সুড়সুড়ি দেয়।

বসন্ত... আর সন্ধ্যায় ছোট ছেলের মতো দুহাঁটু জড়িয়ে ধরে অনেক-ক্ষণ ধরে বসে থাকে টিলার ওপর।

ভোরের আলোয় পাহাড়... ক্রুদ্ধ, গম্ভীর, বিশাল! 'একে একে বেরিয়ে এসো!' পাহাড়গুলো যেন বলছে আর তোমার দিকে তাকিয়ে আছে।

এই হল বসন্ত।

আসিলবেক হাত মুঠো করে জানলার ওপর ঘা মারছে। আধা জমে যাওয়া কাচের ভেতর দিয়ে তার মুঠো দেখা যায় কি যায় না।

এই হল শীত।

আর্গিন যখন ঘরে প্রবেশ করল তখন রেডিওতে কে যেন গান গাইছিল। আসিলবেক কম্বলের ভেতর থেকে তার বিরাট মাথাটা বার করে শুনছিল। বাপের দিকে ও তাকালই না। আর্গিন বিষণ্ণ দৃষ্টিতে ঘরের ওপর নজর বুলিয়ে নিল। সবই যথাস্থানে। আনারখান

রোজকার মতো ময়দা মাখছে। ওর দেহ যখন ওপরে নীচে দোল খায় তখন মনে হয় ওর কালো সাটিন কাপড়ের পোশাকটির সেলাই এই বুঝি খুলে যাবে, বেরিয়ে পড়বে ওর আঁটসাঁট কাঁচা শরীর।

বহুকাল হল লোকশ্রুতি আছে: 'নোইগুতের মেয়ের মতো সুন্দরী'। আনারখানও নোইগুতের মেয়ে।

আর্গিন তার পুরুষ্টু কালো বিনুনির দিকে তাকাল। বিনুনি দুটো বুকের ওপর এসে পড়েছে, কাজে বাধা সৃষ্টি করছে।

'এ-ই কি আমার বৌ?' সে ভাবল, সঙ্গে সঙ্গে নিজের জন্য এবং ওর জন্যও সে অসহ্য কষ্ট অনুভব করল।

'চুল্লিটাকে আরও গরম করতে পারলে না বুঝি?' ইচ্ছে করেই রুক্ষ স্বরে খেঁকিয়ে উঠল সে।

টানা টানা বিষণ্ণ বিষণ্ণ চোখ মেলে সে তাকাল শরতের হলুদ স্তেপভূমির মতো আর্গিনের ক্রুদ্ধ চোখের দিকে। তারপর চোখের পলক নামাল। ময়দামাখা হাত ধুয়ে আনারখান বেরিয়ে গেল। আসিলবেক পেছন পেছন ওকে বলল:

'আগুন এত গনগন করে জ্বলছে, আর ওর কিনা কম হল। নিজে ত কোনকালে আঁচ দেয় না, সব সময় আঁচ দেয় মা।'

ছেলেটার মুখ থেকে অপ্রত্যাশিত কথাগুলো শুনে আর্গিনের কী খারাপই যে লাগল! গন্ধে আমোদিত কাঁটাঝোপের ডালপালা নিয়ে আনারখান আবার এসে ঢুকল, জিজ্ঞেস করল:

'কী বললি তুই এখন, আসিলজান? আমি শুনতে পাই নি।'

'শুনতে পাও নি, শুনে কাজ নেই। না শুনলেও কোন ক্ষতি হবে না। হাজার হলেও ছেলে ত!' এই বলে আর্গিন ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল।

'এসো না, তোমাকে ভয় পাই। তোমার হাত সরাও!'

আসিলবেক এই প্রথম 'র' স্পষ্ট উচ্চারণ করল।

আর্গিনের মাথায় রক্ত চড়ে গেল। সে দড়াম করে টেবিলের ওপর ঘুষি মারল।

আনারখানের হাত থেকে ডালপালাগুলো পড়ে গেল।

'আর্গিন, তুমি কি খেপে গেলে নাকি?..' সে চেঁচিয়ে উঠল, দৌড়ে গিয়ে আসিলবেককে আড়াল করে দাঁড়াল।

আর্গিন অবশ্য অমনিতেই ছেলেকে মারতে পারত না। অনেক, অনেককাল যাবৎ সে এ রকম একটা প্রতিঘাতের প্রত্যাশা করে আসছিল... তবে সেটা তার ঐ অতটুকুন আসিলবেকের কাছ থেকে নয়। সে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ তার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল জানলার ধারে রাখা সঙ্গীতবর্ষণরত ট্রানজিস্টারের ওপর। মাত্র এখুনি তার চোখে পড়ল ওর ওপর লেখা আছে 'জন্মভূমি', সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সকলের কাছে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি বলে তার মনে হল।

আনারখান এক লহমা তার কাটা আঙুলের ওপর নজর বুলাল। সত্যিই ভয় লাগে।

আর্গিন যেন ওর মনের কথা টের পেয়েই হাত পকেটে গুঁজে বেরিয়ে গেল।

আনারখান কখনই স্বামীর এ রকম মূর্তি দেখে নি। তার শরীর, ফেকাসে হয়ে যাওয়া মুখ পাথরের মতো কঠিন। আনারখান বুঝতে পারল না এই ধীরস্থির শান্ত লোকটা হঠাৎ কেন এমন কাঁপছে, যেন খেপে গেছে, আর চোখ দুটো এমন ধকধক করছে যে মনে হয় এই বুঝি কোটর থেকে ঠিকরে বেরিয়ে পড়বে। "কিছুই বোঝার জো নেই। ছয় বছর একসঙ্গে কাটালাম, কিন্তু মানুষটা শান্তশিষ্ট — এ ছাড়া ওর আর কিছুই লক্ষ্য করি নি," যেন কারও কাছে লজ্জা পেয়ে গিয়ে আনারখান মনে মনে ভাবল। আর আজকাল আর্গিন পালটে গেছে। সবেতেই বিরক্তি। কেউ হাসলে তার পছন্দ হয় না। মাঝে মাঝে আসিলবেকের ওপরও তর্জনগর্জন করে: 'অমন হিহি করছিস কেন? যথেষ্ট হয়েছে!'

চুল্লির ওপর কেটলি টগবগ করে ফুটতে শুরু করেছে, জল কানা বয়ে উপচে পড়ছে। আনারখান ভাবলেশশূন্য দৃষ্টিতে সে দিকে তাকিয়ে ছিল। শেষে হুঁশ হতে কেটলি উঠিয়ে মাটিতে রাখল।

'ওঠ, আসিলজান!' এই বলে সে উঠোনে বেরিয়ে এলো।

কাছের পাহাড়ের আড়াল থেকে সূর্য উঠছে। তার প্রথম উজ্জ্বল রশ্মিমালায় মুখোমুখি হল আনারখান। মনে পড়ল ছোটবেলায় সে সূর্যোদয় দেখতে ভালোবাসত, আর কেন যেন মনে পড়ে গেল কাসিমকে। ওদের নীরস জীবনে এই মানুষটা যে এসেছে তা ভালোই হয়েছে! অল্পবয়সে কিসের আনন্দে কে জানে, সে চোখ বড় বড় করে সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকত। আর্গিনও সূর্যের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু ওর চোখ বোধহয় ধাঁধিয়ে গেল, তাই ও কপালের ওপর টুপিটা অনেকখানি টেনে দিয়ে সূর্যের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

আনারখান স্বামীর দিকে দৃষ্টিপাত করল, ওর ওপরের ঠোঁটে রক্ত দেখতে পেল। ও বরাবরই ঠোঁট কামড়ায়। "এ কী করেছ?" আনারখান জিজ্ঞেস করতে চাইল। কিন্তু তার বদলে বলল অন্য কথা:

'এসো, খেয়ে যাও।'

'ইচ্ছে করছে না,' মিনমিন করে কাচুমাচু স্বরে আর্গিন উত্তর দিল, তারপর খালি খোঁয়াড়ের গেট বন্ধ করে দিয়ে চলে গেল। তার কণ্ঠস্বরে ঝরে পড়ছিল যেন শিশুর মিনতি: 'আর করব না!'

ডান হাতটা সে তার তুলোর মোটা কোর্তার পকেটে অনেকখানি পুরে দিল। স্বামীর জন্য আনারখানের করুণা হল, তবে সে এটাও অনুভব করল যে এমন জীবনে তার অসহ্য ক্লান্তি লাগছে।

কী শীত কী গ্রীষ্ম — পাহাড় আর আকাশ। চারপাশে কেউ নেই...

এমন সময় চেঁচাতে চেঁচাতে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো আসিলবেক।

'সূর্য উঠেছে, সূর্য উঠেছে, কটা ঘোড়ায় শয়তান ভর করেছে! মা, আমি নিজে জুতো পরেছি।'

'এই ত চাই, সাবাস! তা হলে ত বেটা আমার বাহাদুর হয়েছে দেখছি।'

'বাহাদুর কী মা?'

'ভালো, চালাকচতুর, সাহসী লোকদের বলা হয় বাহাদুর।'

'হাত-কাটা কাসিমের মতন, তাই না?'

'অমন বলতে হয় না বাছা, ছিঃ...'

আসিলবেক মা'র পা আঁকড়ে ধরল, তার সঙ্গে সেঁটে রইল, তারপর খানিকটা দৌড়ে গিয়ে বেড়ায় হেলান দিয়ে বসে পড়ল, মা'র দিকে পা বাড়িয়ে দিল।

'এই, জুতো খোল!' বয়স্কর ভাব দেখানোর চেষ্টায় সে চেঁচিয়ে বলল।

'আসিলজান! কত বার বলেছি না অমন করে না।'

'আর করব না মা, বাপজানের মতো করব না।'

'হয়েছে, হয়েছে! চল্ দেখি, বাপজান কোথায়।'

'চল।'

আর্গিন সম্ভবত চারণের জায়গা বদল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সে বরফ মাড়িয়ে চলেছে, পেছন পেছন নিয়ে চলেছে পালের ধাড়ি কালো ভেড়াটা -- গলায় তার ঘণ্টা বাঁধা। এই মৃদু ঢালটার নাম সারি-কুনগাই। পাহাড়ে কী বসন্ত কী শরৎ -- সবেরই শুরু এখান থেকে। ঢালটা যদিও তেমন গড়ানে নয়, কিন্তু এখানে সব সময় ধস নামে। "ও নিজেই ত ভালো জানে..." আনারখান উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। গত বছর সে নিজের চোখে দেখেছে। প্রথমে ওখানে ওপরে বিদ্যুতের মতো কী একটা চড়চড় করে উঠল। আর্গিন কোন রকমে পিছিয়ে যাওয়ার অবসর পেল, যখন তার পাশ দিয়ে প্রচণ্ড গুম্‌গুম্ আওয়াজ তুলে ছুটে চলল হিমানী-সম্প্রপাত, পালের গায়ে আঘাত করে তিনটি ভেড়া ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

'সূর্য উঠেছে, সূর্য উঠেছে, কটা ঘোড়ায় শয়তান ভর করেছে!'

আসিলবেক নিশ্চিন্তে খেলা করছে উঠোনে। আর্গিন যখন সারি-কুনগাইয়ের একেবারে মাঝামাঝি চলে এসেছে তখন আনারখান ভাবল: "খোদা না করুন, ধস নামলে ওকে আর বাঁচানো যাবে না!" নিজের

মনের এই চিন্তার সে ভয় পেয়ে গেল। "মাথাটাই বোধহয় গোলমাল হয়ে যাচ্ছে..."

'সূর্য উঠেছে, সূর্য উঠেছে, কটা ঘোড়ায় শয়তান ভর করেছে!' আসিলবেক সূর্যের দিকে তাকাল।

পাহাড়ে যে সব ছোট ছেলেমেয়ে থাকে, শীতকালে সূর্যের অভাবে তাদের মন বিশেষ করে খারাপ লাগে। শীতের নির্মম দিনগুলোতে বহুক্ষণ তার দেখা মেলে না।

এই সময় যৌথখামারের পশুপ্রযুক্তিবিদ কাসিম গাধার মুখের লাগাম ঢিলে করে দিয়ে পথ ধরে যাচ্ছিল। তার মুখে পাইপ, পাইপ থেকে ধোঁয়া উঠছে। সে রাস্তার দিকে তাকাচ্ছিল, কান পেতে শুনছিল আসিলবেকের গাধার খুরের খট্‌খট্‌ আওয়াজ। পথ এখনও শক্ত। জমাট ঘোড়ার নাদ। "ওর্লিকের কাজ। মনে হচ্ছে আর্গিন এসেছে।" ওর্লিক আর তার প্রভুর কথা মনে হতে কাসিম হাসি চাপতে পারল না।

"জুটি বটে। খুঁজতে হয় নি, আপনা আপনি একে অন্যের সন্ধান পেয়েছে। এমন অলস ঘোড়া খুঁজে পাওয়া ভার! অবশ্য লোকে বলে মানুষের উৎসাহ উদ্দীপনা নাকি ওর ভেতরে লুকিয়ে আছে," আর্গিন সম্পর্কে সে মনে মনে ভাবল। "কিন্তু ওর্লিকের তা নেই...' ওর্লিক কী রকম থপ্‌থপ্‌ করে কদম ফেলে তা মনে পড়তে সে হেসে উঠল। আবার গাধার খুরের মাপা খট্‌খট্‌ আওয়াজের তালে তালে চিন্তায় ডুবে গেল।

দশ মাস আগে সে পামির-আলাই পাহাড়ে অবস্থিত এই যৌথখামারে আসে। লরিতে চেপে সে যখন অতিথি ভবনে এসে পৌঁছুল ততক্ষণে দুপুর গড়িয়ে গেছে। বাচ্চারা সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি ঘিরে ফেলল। আর বড়রা কৌতূহলী দৃষ্টিতে জানলা থেকে অপরিচিত লোকটিকে দেখতে লাগল। সে যখন ড্রাইভারের সঙ্গে লরি

থেকে মালপত্র নামাতে শুরু করল কেবল তখনই ওদের সাহায্য করতে এগিয়ে এলো কয়েকজন মহিলা।

'কল্যাণ হোক বাবা,' মহিলারা বলল।

'ওগো, আমাদের নতুন পড়শী, একা কেন তুমি? আমার বৌমা কোথায়?' বুড়োটে হাসি হেসে ওকে জিজ্ঞেস করল এক বকবকে দাদু।

'ধন্যবাদ মা-মাসিরা,' কাসিম মহিলাদের উদ্দেশে মাথা নোয়াল, তারপর বুড়োর দিকে ফিরে বলল: 'আপনাদের নতুন পড়শী, বুড়ো কর্তা, পাহাড়ী ঈগলের মতো স্বাধীন।'

কিন্তু মজাদার বুড়ো ঘন ঘন চোখ পিটপিট করতে লাগল, কিছুতেই দমার পাত্র নয়:

'এঃ, বেচারি পড়শী আমার, মোটে ত তোমার পাঁচ-ছয়টা পোঁটলা দেখছি। ওগুলোয় নিশ্চয়ই সোনাদানা আছে — পাথরের মতো ভারী।'

'বই, বুড়ো কর্তা।'

'বই?'

'হ্যাঁ, বুড়ো কর্তা।'

বকবকে বুড়ো সর্বাঙ্গে ঝাঁকুনি তুলে হো হো করে হেসে উঠল।

'ওরাই তা হলে আমার বৌমা?' সে জিজ্ঞেস করল।

বুড়োর সঙ্গে সঙ্গে কাসিমও হাসতে লাগল।

এ হল তার আসার দিনের ঘটনা। তার প্রায়ই মনে পড়ত ঐ দিনটি। আশ্চর্যের কথা, নিজের কাছেই অপ্রত্যাশিত বলে মনে হয়, কী করে সে তখন একটা বাক্যে তার নিজের সমস্ত জীবনের কথা বলে! আসলে ত কাসিম পাহাড়ী ঈগলের মতোই স্বাধীন। এখনও তার সে কথা মনে হল। তবে এখন আর হাসি পেল না। বন্ধুরা যদি তাকে জিজ্ঞেস করে: 'বিয়ে কর নি কেন?' তার উত্তরে সে সর্বদাই বলে, ফুরসৎ নেই। ওঃ, কী করুণ মস্করা!...

যুদ্ধের আগে কাসিম কারিগরি কলেজে পড়ত। কিন্তু ডিপ্লোমার বদলে সে হাতে পেল বন্দুক।

কাসিম গুরুতর আহত হয়ে শুয়ে ছিল হাসপাতালে। তার ডান হাতটা কেটে বাদ দিতে হল। তারপর... কী কান্নাই না সে কাঁদল যখন জানতে পারল অন্য এক ভয়াবহ জখমের কথা... পাশের বেডে শুয়ে ছিল এক অল্পবয়সী মরণাপন্ন রোগী। তার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল সিস্টার। কাসিমের কাছে কেউ এলো না। তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার মতো সাহস ডাক্তার ও সিস্টারদের ছিল না। কিন্তু সেই মুমূর্ষু ছেলেটা কাসিমের দিকে তাকিয়ে আচমকা জোরে হো হো করে হেসে উঠল:

'হা-হা! লড়াই তোকে খাসী বানিয়েছে, যেমন বানায় কচি ষাঁড়কে! তোকে বানিয়েছে বলদ! এখন তোকে জুতবে গোরুর গাড়িতে আর...'

সিস্টার তৎক্ষণাৎ হাত দিয়ে ওর মুখ চেপে ধরল, কথাটা শেষ করতে দিল না। এটা ছিল শেষ কথা, শেষ হাসি। সে জানত যে মরতে চলেছে. তাই যে-জীবন থেকে বিদায় নিতে চলেছে তার ওপর হিংস্র প্রতিশোধ নিল।

এই ঘটনার পর কাসিম আর কাঁদে নি।

রোদ তেতে উঠেছে গ্রীষ্মকালের মতো। কাসিম তাপে আনন্দ বোধ করল। "এই সূর্যের জন্যেই ত সে সকলের ওপর প্রতিশোধ নিল," কাসিম সেই ছেলেটি সম্পর্কে ভাবল।

একটা বার্চ গাছ নেই দেখে কাসিম চমকে উঠল... ছাড়ানো সাদা বাকলের ওপর কালো কালো কোঁচকানো রেখাগুলো তাকে কেন যেন আনারখানের চোখের কথা মনে করিয়ে দেয়। সুন্দর, বিষাদ-মাখা চোখ। কাসিম সে চোখজোড়ার ভেতরে দেখতে পায় কোন এক বিরাট, উল্লেখযোগ্য কিছুর প্রত্যাশা। সেই বিরাট কিছুটা কি তার জীবনে আসবে?

কুকুর ডেকে উঠল।

আসিলবেক ছুটে এলো।

'সালাম আলেকুম, আসিলবেক!'

'আলেকুম সালাম!' আসিলবেক আনন্দে চে'চাতে চে'চাতে কাসিমের দিকে ছুটে গেল।

রাখালদের সব বাচ্চাই কাসিমকে ভালোবাসে। এমন কি তার কোন পকেটে তামাক আর রুমাল, কোনটাতে মিঠাই আর খেলনা তাও তাদের জানা আছে।

আসিলবেক কাসিমের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। বাঁ হাত দিয়ে অভ্যর্থনা করার ইচ্ছে কাসিমের ছিল না, তাই সে ঝুঁকে পড়ে ছেলেটাকে চুমো খেল। ওরা একসঙ্গে গাধাটাকে বে'ধে রাখল। আসিলবেক কাসিমের পকেট থেকে খালি ডান হাতা টেনে বার করল আর সেটা ধরে হিড়হিড় করে অতিথিকে নিয়ে চলল বাড়ির দিকে।

'ভয় পাস না?' কাসিম জিজ্ঞেস করল।

'না, ভয় পাই না! তোমার হাতে ভয় করে না,' এই বলে আসিলবেক জোরে জোরে নাক টানল, হাতার নাক মুছল।

'সাবাস আসিলবেক! 'র' বলতে শিখেছিস, তারিফ করার মতো! এই যে, তার পুরস্কার, বন্ধু!' এই বলে সে পকেট থেকে 'সোনার চাবি' মিঠাই বার করে ওর দিকে এগিয়ে দিল।

আসিলবেক মিঠাইসুদ্ধ হাতটা মাথার ওপর তুলে 'মা, মা-মণি!' বলে চে'চাতে চে'চাতে বাড়ির দিকে ছুট দিল।

পাহাড়ে মেঘ ডেকে উঠল। ঘূর্ণি বাতাস উঠল, পথে যাকিছু পড়ল ঝে'টিয়ে নিয়ে চলল। তুষার-ঝড় বয়ে গেল।

এ হল বসন্তের সর্বপ্রথম লক্ষণ।

এলো মধুমাস। আসিলবেক আদুল গায়ে দেউড়িতে দাঁড়িয়ে। তার পায়ে মায়ের জুতোজোড়া। বাপ রোজকার থেকে সকাল সকাল ফিরছে দেখে সে ডিগডিগে পেটটা ধরে সামলাতে সামলাতে ধাপের পর ধাপ ডিঙিয়ে তার দিকে ছুটে এলো।

'বাপজান, বাপজান,' আর্গিনকে হাসতে দেখে ও চে'চিয়ে বলল, 'জলদি এসো, রেডিওতে সুন্দর গান হচ্ছে!'

মার বাইজিয়েভ

হাসি

তিয়েন-শানের ফাটলের আড়ালে অদৃশ্য, গুঁড়ি গুঁড়ি তুষারে ঢাকা ছোট এক গাঁয়ে ছাইরঙা মাটির বাড়িতে মরতে চলেছে এক বৃদ্ধা। মরতে চলেছে সে বহুকাল হল। এতকাল আগেকার কথা যে তার নিজেরই মনে পড়ে না কবে থেকে মরতে শুরু করেছে। হতে পারে সেই দিন থেকে যখন ভূমিষ্ঠ হয় তার প্রথম সন্তান, হতে পারে সেই রাত থেকে যখন তার নারীত্ব আসে, কিংবা আরও আগে... কখনও কখনও তার মনে হয় সে অনেক কাল হল মারা গেছে, শুয়ে আছে মাটির তলার কোন এক ঘরে।

তার চৈতন্যে জট পাকিয়ে গেছে অতীত ও বর্তমান, শরৎ ও বসন্ত, দিন আর রাত। সে শুয়ে থাকে চোখ বন্ধ করে, চোখ খোলে একমাত্র তখনই যখন দূরাগত এক কণ্ঠস্বর তাকে চা কিংবা গরম দুধ পান করতে বলে।

বুড়ি মাথাটা সামান্য ওঠায়, মরুভূমির কাঁটা গাছের মতো শুকনো হাত দিয়ে গরম চায়ের পেয়ালা (হাতের তালুতে ঠাণ্ডা-গরমের কোন বোধ তার ছিল না) ধরে, পান করে, অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তার সামনে; যে ছোট মেয়েটি রুটির ভেতর থেকে নরম নরম টুকরো ছিঁড়ে ছিঁড়ে চায়ের মধ্যে ফেলে তাকে প্রায় দেখতেই পায় না।

রোগী চা পান করতে থাকে, লক্ষ্য করে না যে রুটি খাচ্ছে, তারপর সে শিরাওঠা হাত সামনের দিকে বাড়িয়ে দেয়। মেয়েটি বাড়িয়ে দেয় তার মাথা, বুড়ি তার হাতের খসখসে তালু দিয়ে তার চুলে হাত বুলাতে থাকে।

'তুই চা খেয়েছিস ত?' বুড়ি জিজ্ঞেস করল।

'খেয়েছি,' মেয়েটি উত্তর দিল।

'তোর বাপ এসেছিল?' বুড়ি জিজ্ঞেস করল।

'এসেছিল...'

'কী এনেছে?'

'মাংস আর মিষ্টি রুটি।'

'আবার পাহাড়ে চলে গেছে?'

'চলে গেছে। বলেছে ভেড়ার পাল নীচে নামিয়ে নিয়ে যাবে, সরকারী লোকজন আসবে গুনতে।'

'গুনতে? নেকড়ের উৎপাত হয় নি, ভেড়াদের ঘাসের অভাব হয় নি...'

এই কথার উত্তর না দিলেও চলত — দিদিমা ওটা আপন মনে বলছিল।

'আর তোর মা?'

এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া দরকার ছিল, কিন্তু মেয়েটি চুপ করে রইল।

'আর মা — বলছি কী?'

'শহরে...'

'শহরে। তুই লিখেছিস যে ও একটা হারামজাদী?'

'না...'

'লিখে দে! নেকড়ে মা'ও তার লাল চোখওয়ালা বাচ্চাদের ত্যাগ করে না... আর তোর মাটা হল হারামজাদী। সুন্দর জীবনের সাধ হয়েছে। যদি জানতাম যে পেটে কালসাপ ধরেছি তা হলে নিজেই নিজের পেট চিরে ফেলতাম...'

এখন আর উত্তর না দিলেও চলে। মেয়েটি পেয়ালা, কেটলি আর রুটি তুলে নিয়ে আলমারিতে রেখে দিল।

'শহরে যাওয়ার সাধ হয়েছে। দেখব ও ওর শহরে কেমন বাস করে। সেখানে জলের জন্যেও টাকা দিতে হয়... এঃ, হতভাগিনী। আমি মারা গেলে কার সঙ্গে থাকবি রে?' হঠাৎ বুড়ি জিজ্ঞেস করে বসল।

'বাপের সঙ্গে...'

'বাপের সঙ্গে... পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াবি, ভেড়া চরাবি?'

'চরাব...'

'চরাবি? পা হয়ে যাবে ফাটা ফাটা আর দাঁড়ার মতো বাঁকা। বে' থা হবে না,' বুড়ি সাবধান করে দিল।

'আমি বে' করবও না।'

'আলবৎ করবি! যারা বেঁচে থাকে তারা সব্বাই থাকে জোড়ায় জোড়ায়। বাচ্চা বিয়োয়... তোর বাপও এখন না হয় সহ্য করছে, কেন না মন ভার হয়ে আছে। ধাতস্থ হয়ে গেলে আরেক বৌ এনে ঘরে তুলবে। সে তোকে পেটাবে। ওঃ, বেচারি! কী কুক্ষণেই যে জন্মেছিলি!..'

মেয়েটি ঘর থেকে বেরিয়ে দুহাত ভরে জ্বালানি কাঠ আর ঘুঁটে নিয়ে এলো, চুল্লিতে ফেলে দিল।

'ঘর জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিতে চাস না কি?' আওয়াজ কানে যেতে সেদিকে মুখ ফিরিয়ে দিদিমা বলল।

'বরফ ঝড় হবে...'

'কোত্থেকে জানলি?'

'টেলিভিশনে বলেছে...'

'কে বলেছে?'

'এক সুন্দরী দিদি বলেছে গো...'

'সুন্দরী দিদি! সব সুন্দরী দিদিগুলো হল এক্কেকটি ঠক। পরপুরুষের সঙ্গে তাদের ভালোবাসা। তুইও, যতদিন ছোট — ভালো আছিস, বড় হলেই ঠকাবি...'

'ঠকাব না।'

'আলবৎ ঠকাবি... সব ছোট মেয়ে ভালো আর বড় হলেই হয়ে যায় বদ।'

আজ নানী অন্যান্য দিনের চেয়ে বেশি কথা বলছে, তার মানে ভালো বোধ করছে। এ রকম কথাবার্তা অবিরাম চলতে পারত, তাই নাতনি বুড়ির দিকে এগিয়ে এসে তার গায়ে কাপড় জড়িয়ে দিল, মাথা ঢেকে দিল গরম কাপড়ে।

'তুই আমার গায়ে কাপড় জড়াচ্ছিস কেন? আমি রাস্তায় যাব না!' নানী অভিমান করে বলল, ভাবটা এমন যেন রাস্তায় হাঁটা চলার ক্ষমতা ত তার আছেই।

'হাওয়া দরকার। চুল্লিতে বাতাস খেলছে না। ধোঁয়া। দরজা খুলব।'

'ঠাণ্ডা লেগে যাবে, হয়ত আগেভাগেই মরে যাব...'

কিন্তু মেয়েটি যখন দরজা হাট করে খুলে দিল তখন বুড়ি কম্বলের আড়ালে মাথা ঢেকে চুপ করে গেল। রাস্তা থেকে হুহু করে আসছে সিরসিরে হাওয়া, বাইরে তাড়িয়ে নিয়ে গেল ঘুঁটে পোড়া ধোঁয়ার কটু গন্ধ। বুড়ি কম্বলটা সামান্য খুলে মাথা বার করল যাতে একটু সহজে নিশ্বাস নেওয়া যায়। তাজা কনকনে হাওয়া নাকের ভেতরে সুড়সুড়ি দিল, কম্বলের ভেতরে গিয়ে ঢুকল। তাতে বুড়ির মাথায় মিষ্টি, আমেজে ঝিমঝিম করে উঠল। চোখে তার জল এলো। বুড়ি তন্দ্রায় ঢলে পড়ল...

মেয়েটির আবার মনে পড়ে গেল চালাঘরের ভেতরে লুকিয়ে রাখা বাক্সটার কথা। এক সপ্তাহ আগে ও যখন ঠিক এইভাবে হাওয়া খেলানোর জন্য দরজা হাট খুলে দেয় আর নানী যখন ঘুমিয়ে

পড়েছিল, তখন এক ঘোড়সওয়ার ওদের বাড়ির দিকে এগিয়ে এলো। লোকটা হল পোস্টম্যান বাতিরবেক চাচা।

'হ্যাঁ গো দিদি!' সে ডেকে বলল (এইভাবে কিশোরীদের ডাকা ওখানকার রীতি)। 'পার্সেল নাও না কেন গো? মা'র কাছ থেকে বোধহয়,' সে জানাল।

'নানী মানা করে দিয়েছে!' মেয়েটি উত্তর দিল।

'অমন নিষ্ঠুর হওয়া ঠিক নয়। হাজার হোক তোমার আপন মা। ফেরত পাঠানো ত আর ঠিক হবে না,' বাতিরবেক চাচা পার্সেল দিয়ে চলে গেল।

মেয়েটি বাক্সটা চালাঘরে বয়ে নিয়ে গেল। পার্সেল সত্যি সত্যিই মা'র কাছ থেকে এসেছে। কিন্তু নানীর হুকুম -- মা'র কাছ থেকে কিছু নেওয়া চলবে না। এই বাক্সটা তাই সারা সপ্তাহ চালাঘরেই লুকানো আছে...

মেয়েটি দরজা বন্ধ করল, চুল্লি ভালো করে জ্বালানোর উদ্দেশ্যে বড় একটা ছুরি নিয়ে কাঠ কুচি করে কাটতে লেগে গেল আর মনে মনে ভাবতে লাগল পার্সেলের কথা। ওটাতে কী থাকতে পারে? নিশ্চয়ই মিঠে কিছু, হয়ত সুন্দর পোশাক, হয়ত বা চামড়ার জুতো, আর সে জুতো হুবহু জাকেনের জুতোর মতো, সুন্দর: জুতোর তলি মোলায়েম, খয়েরি রংয়ের, হিলের ঠিক পাশটিতে চাপ দিয়ে লেখা আছে '৩০' সংখ্যাটি। আবার এও হতে পারে যে ওতে এমন জিনিস আছে যা সে ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারে না... কিন্তু নানীর মরার জন্য আর কতকাল অপেক্ষা করতে হবে? আর সে মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ত আত্মীয়স্বজনে বাড়ি ঘর ছেয়ে যাবে, কান্নাকাটি, হাঁকডাক পড়ে যাবে, বাড়িতে তাদের কর্তৃত্ব শুরু হবে, তারা ভেড়া জবাই করবে, লাল মাংসের চাকা চালাঘরে লটকাবে, পার্সেলের বাক্সটা নির্ঘাত ওদের চোখে পড়ে যাবে।

মা'ও হয়ত আসবে, অবশ্য নানী বলে দিয়েছে সে যেন তার শেষ কাজের সময় না আসে। মা সে সময় নানীর পায়ে মুখ ঠেকিয়ে বারবার

একটি কথাই বলে: 'আমাকে ক্ষমা কর... আমাকে ক্ষমা কর... আমাকে ক্ষমা কর...' নানী তার জীর্ণ হাত তুলে বলল: 'দূর হ!' মা যেন এরই অপেক্ষায় ছিল। সে ছোট ছেলেকে আঁকড়ে বুকে চেপে ধরে রাস্তার দিকে ছুট দিল, যে বড় কাপড়টায় তার জিনিসপত্র আর ছেলের জামাকাপড় জড়ানো ছিল সেটার কথা বেমালুম ভুলে গেল। মেয়েটি বেরিয়ে এসে মা'র পেছন পেছন ছুটল, কিন্তু মা ততক্ষণে ট্যাক্সিতে চেপে বসে দড়াম্ করে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। সে গাড়ির পিছু নিল, কিন্তু গাড়ি বাড়ির পাশ দিয়ে ঘুরে উধাও হয়ে গেল। তখন সে মরিয়া হয়ে বাড়ির চারপাশে ছুটতে লাগল। তার আপন মা তাকে ফেলে চলে যাবে তা-ও কি হয়! তারপর দেখতে পেল গাঁ থেকে দূরে ধুলোর রেখা। পালিশ করা পিঠ ঝকমক করতে করতে গাড়ি মা'কে নিয়ে চলে গেল। মেয়েটি মাটিতে আছড়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল, মাটি সে এমনভাবে জড়িয়ে ধরেছিল যে তাকে তখন আর শিশুর মতো দেখাচ্ছিল না। তার মনে হল পিশাচী যেমন নিজের সন্তানকে খেয়ে ফেলে মা'ও যেন তেমনি। কোন এক বইয়ে যেন সে অমন পিশাচী দেখেছে। তাদের ধড় ছিল প্রকাণ্ড, ভারী ভারী, ঘাড় লম্বা, মাথা ছোট, মুখের হাঁ বিশাল, দাঁতগুলো খুদে আর বিকট... গাঁয়ের পাড়াপড়শীরা ঝাঁক বেঁধে দেখতে এসেছিল সোনুনের শহরে যাওয়ার দৃশ্য। তারা মেয়েটিকে ঘিরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল· ভাবটা এই যে যত পারে কেঁদে নিক — মন হালকা হবে। পরে তারা ওকে তুলে কোলে করে বাড়ি নিয়ে এলো, আর পাল্লা দিয়ে গলা চড়িয়ে গালাগাল দিতে লাগল মা'কে, যে কিনা জীবন ভালো করে উপভোগের জন্য নিজের পেটের সন্তানকে ফেলে দেয়... বাপ ফিরে এলো গভীর রাতে, গাঁয়ের লোকে তখন ঘুমুচ্ছে। সে চুপচাপ বিরাট শক্ত তালু দিয়ে মেয়ের মাথায় হাত বুলাল, অনেকক্ষণ ধরে আগুনের দিকে তাকিয়ে রইল। নানী খাটে শুয়ে শুয়ে কাশছিল। মনে হচ্ছিল জামাইয়ের সামনে লজ্জা পেয়েই যেন কাশছিল।

"কীই বা আমি করতে পারতাম? আমি যে একেবারে বুড়োহাবড়া,

একেবারেই অথর্ব," তার কাশি যেন বলল। আর সেদিন রাতে মেয়েটির কেন যেন ভালো লাগছিল — বাপ তাকে কখনও আদর করে নি, ক্বচিৎ তার সঙ্গে কথা বলত, অথচ এখন তার মনে হচ্ছিল বাপের কাছে তার চেয়ে আপন ও প্রিয়জন আর কেউ নেই। এই শক্তিমান মানুষটি সমস্ত স্নেহ যে ওকে উজার করে দিচ্ছে তা ভাবতে ওর বেশ লাগছিল।

চুল্লি তেতে উঠল। কেটলি প্রায় জুড়িয়ে যাচ্ছিল, এখন সোঁ সোঁ করে উঠল। এই সময় মেয়েটির মাথায় একটা চালাকি খেলে গেল — আচ্ছা বাক্সটা খুলে দেখে আবার বন্ধ করে রাখলে কেমন হয়? নানী ঘুমুচ্ছিল, তার ঠোঁট দুটো একটু একটু কাঁপছিল, যেন ঘুমের ঘোরে তার মতিচ্ছন্ন মেয়েকে গালাগাল করে যাচ্ছিল। মেয়েটি নিঃশব্দে বেরিয়ে চলে এলো চালাঘরে, বাক্সটা বার করল, সাবধানে কুড়ুল দিয়ে ওটাকে খুলল। ওপরে খামের ভেতরে ছিল চিঠি। কিছুক্ষণ সে মনে মনে ভাবল, তারপর খামটা ছিঁড়ল: "আমার আদরের মেয়েটি, তোর কথা মনে পড়লেই আমার চোখ ফেটে রক্ত ঝরে। তোকে হয়ত বোঝানো হয়েছে যে শহরের জীবনের খাতিরে আমি তোকে ত্যাগ করেছি, হয়ত এমনও বলা হয় যে আমি তোর বাপকে এই জন্যেই ত্যাগ করেছি যে সে ইনস্টিটিউট শেষ করে নি। ব্যাপারটা তা নয় রে। আমার ইচ্ছে ছিল তোকেও ছোট তালাইবেকের নিয়ে যাই, কিন্তু তোর বাপের কথা ভেবে আমার মন খারাপ লাগল। একা পড়ে গিয়ে শোকে-দুঃখে ও হয়ত মারাই যেত। ও খুব ভালো লোক, ওর কাছ থেকে সবকিছু কেড়ে নেওয়া ঠিক নয়। তালাইবেকের মা'র বুকের দুধ না হলে চলবে না, কিন্তু তুই এখন বড়, বাপ আর নানীর সঙ্গে থাকতে পারবি। তা ছাড়া তোর নানীকেও একা ফেলে রেখে যেতে পারলাম না। তোর বাপ এখন ওর কাছে পর... এখন তুই বড় ছোট, যখন বড় হবি তখন বুঝতে পারবি যে মানুষের জীবন (তোর নানী যেমন তোকে বোঝায়) বেশ দীর্ঘ মনে হলে কী হবে, আসলে একেবারেই ছোট। জন্ম ও মৃত্যুর মাঝখানে সীমিত সময়ের সম্পূর্ণ টুকরোটাই জীবন নয়! জীবন — হয়ত বা মোটে একটি ঘণ্টা, একটি মুহূর্ত, যখন তুমি

হঠাৎ নিজেকে অনুভব কর পাখির মতো, সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে, কোন রকম ভাবনাচিন্তা না করে উড়ে যেতে চাও দুনিয়ার শেষ সীমানায়, যখন বর্তমান ছাড়া আর সবকিছু তোমার কাছে নেহাৎই নগণ্য ঠেকে। এই মুহূর্তটাই জীবন, তারই জন্যে বাঁচার সার্থকতা। এই মুহূর্তটি যদি তোমার জীবনে কখনও না আসে, তুমি যদি নিজে ঘাবড়ে গিয়ে তাকে হাতছাড়া কর, তোমার নিজের মন যা চায় সেই অনুযায়ী কাজ না কর, তা হলে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে দুনিয়ায় তুমি জীবন ধারণ করতে পার নি, কেন না মানুষের বাদবাকি গোটা জীবনটা হল তার ধীরে ধীরে মৃত্যুবরণ। তোর নানী -- আমার নিজের মা -- এটা কখনও বুঝতে পারল না, বুঝতে পারবেও না। সারা জীবন সে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কাজ করেছে। তার কাছে জীবন ছিল এক টুকরো রুটির জন্যে সংগ্রাম। সে নিজের ঝামেলার কথা কখনও ভুলতে পারল না, কখনও তার বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে, স্বামীর সঙ্গে প্রাণ খুলে হাসতে পারল না, ভুলতে পারল না যে এর পর তাকে পিঠে করে বয়ে আনতে হবে ঘুঁটের বস্তা, চুল্লিতে আঁচ দিতে হবে, কালিঝুলিমাখা ছেলেপিলেদের খাওয়াতে হবে, মাতলামির জন্যে স্বামীকে গালাগাল করতে হবে। সারাটা জীবন প্রতিটি মুঠো দানা, প্রতিটি রুবল সাশ্রয় করে এসেছে, সারা জীবন অভাব অনটনে কাটিয়েছে। সারা জীবন সে ডজনখানেক বিছানার চাদর পাওয়ার স্বপ্ন দেখেছে, কোনকালেই তিনটের বেশি পায় নি। চতুর্থটি কিনতে না কিনতে প্রথমটি ছিঁড়ে যায়। আর একসঙ্গে বারোটা কেনার মতো ভরসা হত না -- ভয় হত কাল আর রুটির পয়সা থাকবে না...”

চিঠিটা ছিল মস্ত বড় -- এক্সারসাইজ খাতার কয়েক পৃষ্ঠা জুড়ে। মা জানিয়েছে যে আপাতত অন্য লোকের বাড়িতে আছে, কেন না এখনও ফ্ল্যাট জোটে নি, আর কাজ করছে একটা ফ্যাক্টরিতে, যেখানে মিঠাই তৈরী হয়। মেয়েটি গোটা চিঠিই পড়ল, যদিও সবটা বুঝতে পারল না। মা'র লেখার ক্ষমতা ছিল। তার ছিল চকচকে মোলায়েম মলাট দেওয়া একটা মোটা খাতা, সেখানে সে কালি দিয়ে ছবি আঁকত,

গান লিখত। মেয়ে বহুবার ঐ খাতা খোলে। সব কথা আর বাক্য বোধগম্য হলেও সমস্তটা মিলিয়ে সেখানে যেন কোন এক গোপন রহস্য লুকিয়ে ছিল। চিঠিটার ক্ষেত্রেও তা-ই। সবই যেন বোধগম্য, সেই সঙ্গে সবটা যে বোধগম্য তা-ও নয়। একটা ব্যাপার অবশ্য স্পষ্ট: মা'র আচরণ — খামখেয়ালি নয়, বোকামিও নয়। এখানে অত্যন্ত জটিল কিছু একটা ছিল। অন্তত এই কারণে যে মা মেয়ের কাছে নিজের সাফাই গায় নি, সে ব্যাখ্যা করতে গিয়েছিল এমন একটা কিছুর যা স্পষ্টতই না নানী, না বাপ, না পাড়াপড়শী — কেউ বুঝতে পারে নি। তবে এমনও হতে পারে যে বাপ সব বুঝেও কিছু করতে পারে নি।

এটাও স্পষ্ট যে মা এমন কাজ করেছে যা লোকে করে থাকে ক্বচিৎ এবং বিশেষ কোন কারণে। তার লেখার মধ্যে এমন একটা সুর আছে যেন সে নিজের জীবনে বেশ তৃপ্ত, কিন্তু মেয়ে শিশুর সহজাত অনুভূতিতে বুঝতে পারল যে তেমন মধুর তার লাগছে না, যদিও কাজ করছে এমন জায়গায়, যেখানে তৈরী হয় মিঠাই।

মেয়েটি চিঠি সযত্নে ভাঁজ করে জামার ভেতরে বুকের কাছে লুকিয়ে রাখল। বাক্সে ছিল মিঠাই, গরম মোজা আর বোনা জামাকাপড়। সে মোড়ক খুলল — তাতে ছিল কয়েকটি সাদা তসরের চাদর। মা লিখেছে: "তোর জন্যে লাল টুপি কিনেছি, কিন্তু সেটা পাঠাব পরে, নয়ত তোর নানী দেখতে পেলে উনুনে ফেলে দেবে। জামা আর মোজা এমনভাবে পরবি যাতে ওর চোখে না পড়ে। টাকা হলে তোর জন্যে সাদার ওপর কালো বুটি দেওয়া পশুলোমের ওভারকোট কিনব। লোকে বলে, এমনই লোম যে ধোয়াকাচা করা যায়। চারটে বিছানার চাদর — নানীর জন্যে। বলবি যে পুরনো সিন্দুকের মধ্যে পেয়েছিলি..." মা জানত না যে নানী এখন প্রায় চোখেই দেখতে পায় না।

মেয়েটির মনে পড়ে গেল যে নানীর বিছানার চাদর পুরনো হয়ে ধোয়াকাচায় হলদেটে হয়ে গেছে। তাই ঠিক করল এখন যখন দাদী ঘুমুচ্ছে তা হলে এই ফাঁকে চাদর পালটানো যাক। এই ভেবে সে একটা চাদর বার করে নিল, পা টিপে টিপে বুড়ির কাছে এগিয়ে

গেল। সন্তর্পণে তার গা থেকে লেপ আর পুরনো চাদর তুলে নিল। নানী বিড়বিড় করে কী যেন বলল, হাত-পা গুটিয়ে নিল। তাকে তখন দেখাচ্ছিল ঠাণ্ডায় কুঁকড়ে যাওয়া এইটুকু একটা কুকুরের মতো। নতুন চাদরের গন্ধ পেয়ে বুড়ি চোখ খুলল, আঙ্গুল দিয়ে হাতড়াতে শুরু করল।

'অ্যাই!' নানী ডাক দিল।

মেয়েটা সাড়া দিল না।

'অ্যাই! আমি জানি, তুই এখানে! চাদর কোত্থেকে এনেছিস শুনি?'

'পুরনো সিন্দুক থেকে,' মেয়েটি উত্তর দিল।

'পুরনো সিন্দুক থেকে? আমি যে ওটা নিজের জন্যে তুলে রেখেছিলাম।'

'তাই ত আপনার বিছানায় পাতলাম...'

'নিয়ে যা! আমাকে কবরে শোয়ানোর সময় বিছিয়ে দিস!' চড়া গলায় বুড়ি বলল।

মেয়েটার চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেল। নানীকে দেখাচ্ছে বুড়ো ঝড়ো কাকের মতো: মুখটা হয় উঠেছে ছুঁচলো আর পাতলা, সাদা চুল এলোমেলো ছড়িয়ে আছে।

'থামের মতো দাঁড়িয়ে রইলি যে বড়? সিন্দুকে রাখ বলছি। সাদা থানটা কাটলি কেন?'

'কিছুই কাটি নি...'

নানী যত রাগে জ্বলে উঠছিল ততই বেশি করে তাকে দেখাচ্ছিল বুড়ো কাকের মতো।

'দশ মিটার ছিল... পনেরো বচ্ছর যত্ন করে তুলে রেখেছিলাম... অন্তত পরকালে গিয়ে পরিষ্কার বিছানায় ঘুমোব...'

নাতনীর মনে পড়ল যে পুরনো সিন্দুকে সাদা থানের একটা বাণ্ডিল রাখা আছে বটে। মা বলেছিল যে ওটা হল নানীর যৌতুক। একমাত্র এখনই সে বুঝতে পারল তার অর্থ। (বুড়ো বয়সের কির্গিজিরা আগে থাকতে নিজেদের কফিনের ব্যবস্থা করে রাখে)। নাতনি সিন্দুক

খুলে পাতলা কাপড়ে মোড়া, ফিতে দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা বাণ্ডিলটা নিয়ে এলো। বুড়ি বাণ্ডিলে হাত বুলিয়ে আশ্বস্ত হল যে 'যৌতুক' ঠিকই আছে। তার রাগ পড়ে গেল।

'গোটা আছে! তা-ই বল। তা নয় ত কাটি নি, কাটি নি। হাবাগোবা গোছের বৌ হবি দেখছি,' বিনা দোষে নাতনীকে গালাগাল দেওয়ায় বুড়ির অস্বস্তি লাগছিল, কিন্তু সেটা সে স্বীকার করতে চাইল না। তাই বলল, 'ফের থামের মতো দাঁড়িয়ে রইলি! জায়গায় রেখে এলি! আমাকে যখন ঐ কাপড়ে মোড়া হবে তখন মনের আশ মিটিয়ে দেখিস 'খন...'

মনে হচ্ছিল বুড়ি যে বহুকাল বেঁচে আছে, বুড়ো হয়েও এখন ধীরে ধীরে মরতে চলছে তার জন্য যেন সকলের ওপরই তার রাগ।

নাতনী বাণ্ডিলটা সিন্দুকে তুলে রাখল। এখন আর নানীর কথা না শুনলেও চলে, আপন কাজ করা যেতে পারে, যে মিঠাইটা ততক্ষণ গালে ফেলে রেখেছিল সেটাকে চোষা যেতে পারে। সে ব্যাগ থেকে রুলটানা খাতা আর পাটিগণিতের বই বার করে প্রশ্নমালা থেকে গুণ অঙ্ক কষতে লেগে গেল।

'ওটা আর কী বলল রে?' বুড়ি হঠাৎ জিজ্ঞেস করল।

নাতনী চমকে উঠল: তা হলে কি চিঠির কথা জানতে পেরেছে? নানী খাট থেকে ঠ্যাং ঝুলিয়ে বসে ছিল, তাকে দেখে মনে হচ্ছিল এক কুঁজী ডাইনী — লোকের মনের কথা সে আন্দাজ করতে পারে, ভাগ্য গুনে বলে দিতে পারে। সে রক্তশূন্য ঠোঁটজোড়া চেপে নাতনীর দিকে তাকাল, উত্তরের অপেক্ষা করতে লাগল।

'ঐ যে বলল না বরফ ঝড় হবে, ব্যস?'

নাতনী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল — তার মানে নানী জিজ্ঞেস করছে টেলিভিশনে যে খবর পড়ে তার কথা।

'বলেছে: 'বরফ পড়বে আর ঠাণ্ডা পড়বে...''

'খোদা নেই! খোদা নেই!' বুড়ি যেন কাউকে ভেঙিয়ে গা ঝাঁকি দিয়ে বলল। 'নিজেরাই আগে থেকে জল-হাওয়ার খবর বলে।'

'আবহাওয়া খোদার কাছ থেকে জানা যায় না।'

'খোদার কাছ থেকে নয়... তা হলে কে ওদের বলে? তোর মরহুম নানা তারা দেখে জল-হাওয়া আঁচ করতেন। অবশ্য তখনও মদ ধরেন নি। আর যেই মদ ধরলেন তখন আর কিছুই আঁচ করতে পারতেন না।'

এখন নানীকে দেখাচ্ছিল সাধারণ এক বৃদ্ধার মতো। যখন সে তার মরহুম স্বামীর কথা বলতে শুরু করে তখনই হয়ে দাঁড়ায় সাধারণ বৃদ্ধা মহিলা।

'বৃষ্টি-ফিস্টি কিস্সু হবে না! ওটা মিছে কথা বলছে! সব্বাই মিছে বলে...'

কথা আবার চলে গেল বিড়বিড়ানির পর্যায়ে। নানীকে আবার দেখাচ্ছে বুড়ো কাকের মতো। নাতনীও আবার পড়াশুনায় মন দিল।

'সুন্দরী। মাথার চুল ত চুড়ো করে তোলা! আর সুন্দরী মাগী— ওরা সব্বাই আকাট... এ দ্যাখ না তোর মা... ওঃ, হতচ্ছাড়া!.. সেও সুন্দরী ছিল। আর এখন শহরে ত বোধহয় শুকিয়ে হয়েছে কাঠের ছিলকে। ওখানে আগুনের জন্যেও ট্যাকা দিতে হয়,' নানী বকবক করে চলল। নাতনী গুণের প্রশ্নমালা থেকে অংক কষতে লাগল। চুল্লির চিমনির ভেতরে বাতাসের সন্সন্ আওয়াজ উঠল। আবহাওয়া যেন বিরাট একটা কিছুর জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, প্রবল শক্তি সংগ্রহের কাজে মেতে উঠেছে। বুড়ি বাতাসের হুহু আর্তনাদ শুনছিল আর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল নাতনীর দেহরেখা।

"...আপন মনে বসে বসে লিখছে। ঠিক ওর মা'র মতন। সে-ও এই টেবিলটার পাশে পা গুটিয়ে বসতে ভালোবাসত... আপন মনে বসে আছে, জানেও না যে কাল আমাকে কাঁদাবে। এখন ওকে বলেই দেখ না কিছু। শুনবে আর মিটিমিটি হাসবে: তোমার বলার কথা বলে যাও, আমি কিন্তু জানি যে ব্যাপারটা তা নয়। এই বই-পুথিগুলোই ওদের মাথা খেয়েছে..."

...বাতাসের বেগ বাড়ল। জামাইয়ের এখনও দেখা নেই। পথে ঝড়ের

মধ্যে পড়ে যাবে না ত? পারলে বুড়ি ওকে সব কথা বলত। ও নির্ঘাত বুঝত। আজ রাতে সে একটা স্বপ্ন দেখে। স্বপ্ন দেখল, সে আর তার স্বামী যেন বিস্তীর্ণ স্তেপভূমিতে বিশাল এক খড়ের গাদার ওপর শুয়ে আছে। তাদের বয়স অল্প, সুন্দর চেহারা। স্বামী তার শ্যামবর্ণের বুকের ওপর হাত রাখল, সদ্যকাটা ঘাসের গন্ধে ভুরভুর তার টানটান দেহ আলিঙ্গন করছে। তার কালো দীর্ঘ চুলের রাশি দুকাঁধে ছড়িয়ে পড়েছে। নিজের নগ্নতার জন্য তার বিন্দুমাত্র লজ্জা বোধ হচ্ছে না, স্বামীর দৃষ্টির সামনে সে সঙ্কুচিত হচ্ছে না। মাথার ওপর আকাশ। সে আকাশ গাঢ় নীল, বেজায় উঁচু। ঐ ত দিগন্তে দেখা দিল ছোট ছোট দুটি সাদা জ্বলজ্বলে তারা। এরা হল ওদের দুই যমজ ছেলে হাসান আর হোসেন (স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধে মারা গেছে) — ছুটোছুটি করছে। একেবারেই ছোট। ওরা সাদা চাদরের কোনা হাতে ধরে ছুটছে, মা-বাবাকে চাদরে ঢেকে দিয়ে ছুটে চলে যায়। বাচ্চাদের ফরসা পাছাগুলো ঝলক দিচ্ছে, তাদের পায়ের গোড়ালি — তাজা ঘাসের ঘষায় সবুজ। আর ও স্বামীর সঙ্গে আলিঙ্গনবদ্ধ হয়ে স্ফটিকের মতো জমাট বৃষ্টির ফোঁটার পাশ দিয়ে উড়ে চলেছে গাঢ় নীল আকাশের দিকে। এদিকে নীচে, পৃথিবীতে মেয়েরা গান গাইছে, তারা গাইছে জোর গলায়, একতানে... বুড়ির ঘুম ভেঙে গেল, সে অনেকক্ষণ শুয়ে ছাদের দিকে তাকিয়ে রইল, যদিও কিছুই দেখতে পেল না। সে বুঝতে পারল তার দিন ঘনিয়ে এসেছে। মনে করার চেষ্টা করল হাসান ও হোসেনের বড় বয়সের চেহারা, কিন্তু মনে করতে পারল না। ভুলে গেছে। তার দীর্ঘ জীবনে সে এত মৃত্যু দেখেছে — সময় সময় এমনই অপ্রত্যাশিত — যে সে বহুকাল হল মৃত্যুতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে, তাকে ধরে নিয়েছে অনিবার্য ও অপরিহার্য; সে যে কোন মুহূর্তে আসতে পারে, ভিখারীর মতো যে কারও দরজায় ঘা মারতে পারে। তার মনে হচ্ছিল মৃত্যু যেন এক অসীম নীরবতা, এক প্রশান্তি, ভবযন্ত্রণা থেকে মুক্তি। সূর্যের আলোকবিন্দু চোখে যাতনা দেবে না, মানুষের কান্না হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করবে না...

বুড়ি শুনতে পেল বাতাস দড়াম্ করে ফটকের ওপর ঘা মারছে, চালের ওপর তুষারকণার ঘূর্ণি তুলে শিস দিচ্ছে। ঝড় শুরু হল বলে। কিন্তু এখনও জামাইয়ের দেখা নেই। তা হলে কি নিজের মনের কথা সঙ্গে নিয়েই তাকে চলে যেতে হবে, কেউ কখনও তা জানতে পারবে না? অথচ তার বলার আছে অনেক। এই চার কুড়ি বয়সে কত কথাই না মনের মধ্যে এসে জমেছে! তার বলার ইচ্ছে ছিল যে মানুষ যিনি সৃষ্টি করেছেন সেই খোদাতাল্লা বড় নির্বোধ: অচেতন মাটি আর পাথর হল চিরকেলে, আর মানুষ মরতে শুরু করে তার জীবনের একেবারে শুরু থেকে -- তার দেহের, বুদ্ধির, হৃদয়ের স্পন্দনেরই একমাত্র উদ্দেশ্য হল মারা না যাওয়া, অথচ সে মারা যায়; মানুষের জীবন দীর্ঘ অথচ সংক্ষিপ্ত, শোচনীয়। তাই নয় কি? যখন ছোট মেয়েটি ছিল তখন স্বপ্ন ছিল মনের মানুষের দেখা পাবে, স্বপ্ন দেখত বিয়ের। দেখা পেল, বিয়েও হল, কিন্তু শিগ্‌গিরই জানতে পারল যে মানুষটার এক ধুমসো মাগীর কাছে যাতায়াত আছে, সে মাগী আবার এমনই যে জীবনেও জানে না সাদা চাদর কাকে বলে... ছেলে হওয়ার স্বপ্ন ছিল, দু-দুটো ছেলের জন্ম দিল, তাদের মানুষ করল --- স্তালিনগ্রাদের লড়াইয়ে ওরা মারা গেল... মেয়ের সাধ ছিল, ভালো একটা মেয়ের জন্ম দিল, মেয়েকে মানুষ করল, তার বিয়ে দিল, এক সপ্তাহের জন্য ফ্রুঞ্জেতে চাচীর কাছে গিয়েছিল, স্বামী, মেয়ে, অসুস্থ মা'কে ছেড়ে কচি ছেলেটাকে নিয়ে শহরে চলে গেল, সংসারটা ভাঙ্গল। ছুঁড়ির কী ঘোরই যে লাগল! কেউ ওকে তুক করল কিনা কে জানে?.. আর কী ছিল? ছিল স্বামী। সে মারা গেছে (বুড়োরা সচরাচর বুড়িদের থেকে আগে মরে)। লোকটা মদের নেশা ধরল। যেদিন ছেলেদের মারা যাওয়ার 'অলক্ষুণে কাগজটা' এলো তার পরদিন মদ খেল। তারপর জীবনের শেষ দিন অবধি তাকে আর সুস্থ মস্তিষ্কে দেখা গেল না। দিনের পর দিন অসুখে ভুগত... হলফ করে বলত, আর মুখে তুলবে না। এক সপ্তাহ বাদে আবার যে কে সেই। তা মারাও যায় মনে হয় ভোদ্‌কাতেই। সকালে বিচালি কাটতে গেল, আর

সন্ধেবেলায় লোকে নিয়ে এলো তার লাশ। লোকে বলে মাথায় রক্ত উঠে গিয়েছিল। হায় আল্লা! লোকে এই জংলা তরল পদার্থের মধ্যে পায়টা কী? শিশুর সোহাগের চেয়ে কি তা মধুর হল, নারী দেহের চেয়েও উষ্ণ হল? সে নিজে কখনও নেশার জিনিস চেখে দেখে নি। কুসংস্কার? ভয়? না। মেয়েদের মদ খাওয়া ঠিক নয়। যুদ্ধের সময় স্বামী যখন শ্রমিক-সৈন্যদের বাহিনীতে যোগ দেয় তখন সৈনিকদের স্ত্রীরা আর বিধবারা বুজা তৈরি করে, তাদের সঙ্গে যোগ দিতে ওকে ডাকে, তারা পান করে, গান গায়, তারপর কান্নাকাটি করে। কেউ কেউ, বলতে বাধা নেই, পরপুরুষের কাছে, এমন কি অল্পবয়সী ছেলেছোকরাদের কাছে যাতায়াত করে—তাদের নারীদেহের জ্বালা মেটায়। কিন্তু সে ও রকম দলের মধ্যে উপস্থিত থেকেও কঠোর সংযম বজায় রাখে — মেয়েদের একমাত্র ধ্যানজ্ঞান হওয়া উচিত স্বামী। স্বামীকে সে ভয় পেত, ভক্তিও করত। আলাপের প্রথম দিন থেকে শুরু করে শেষ দিন পর্যন্ত সে তাকে 'আপনি' (কির্গিজদের মধ্যে এমন সচরাচর দেখা যায় না) বলে সম্বোধন করত। ছেলেদের মারা যাওয়ার খবর যখন এলো তখন স্বামী গলা চড়িয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। সে অসামাজিক হয়ে পড়ল, মদ ধরল, মেয়েকে আদর করা ছেড়ে দিল। একদিন ভোদ্‌কা ঢেলে স্ত্রীর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল: 'খাও, মনটা হালকা লাগবে।' সে পেয়ালাটা ঠোঁটের সামনে আনল, ভাবল হয়ত সত্যি সত্যিই মন হালকা হবে। একটা ঝাঁজাল গন্ধ নাকে এসে ধরল। সে ভোদ্‌কার পেয়ালা টেবিলে নামিয়ে রাখল। জীবনে এই প্রথম সে স্বামীর ইচ্ছের বিরুদ্ধে গেল। স্বামী নিজেই সমস্তটা ভোদ্‌কা গিলে ফেলল, ঝট্ করে মাথা ঝাঁকাল।

'তেতো?' ও জিজ্ঞেস করল।

'তেতো,' স্বামী জবাব দিল।

'আচ্ছা, এ সব কে তোমাকে খেতে বলে?' ও জিজ্ঞেস করল।

'হিটলার,' জবাব দিয়ে স্বামী উঠে চলে গেল।

এর পর থেকে সে আর অমন প্রশ্ন করত না। এখন, মৃত্যুশয্যায়

বুড়ির কেন যেন এই কথোপকথন মনে পড়ে গেল। কেন ও তখন এ রকম বলল। এই তেতো তরল পদার্থটা কি সত্যি সত্যিই শোকের উপশম ঘটাতে পারে? যুদ্ধের পর ধর্মবিশ্বাসী বুড়োরা অবধি বীয়ার ধরে। এমন রবও ওঠে যে বীয়ার মাদকদ্রব্যের মধ্যে পড়ে না, তার মানে ওটা খাওয়া দোষের নয়। লোকে যতক্ষণ না মাতাল হতে পারে ততক্ষণ বীয়ার খেয়ে চলে...

এ সব স্মৃতিচারণের সঙ্গে সঙ্গে বুড়ি অনুভব করল তার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে -- তেষ্টার জন্য তার কষ্ট হতে লাগল। বহুকাল হল, বেশ কয়েক বছর হল তার তেষ্টার কষ্ট।

একদিন স্বামী ওকে বীয়ার কিনতে পাঠাল। সে পুরো এক কেঁড়ে কিনল। যখন মাঠের ওপর দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তখন বীয়ার ছলকে কানা বয়ে পড়তে লাগল... কোদালটা একপাশে ফেলে দিয়ে স্বামী দুপা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে ঢকঢক করে পান করে চলল। বীয়ার তার গোঁফ বয়ে গড়িয়ে পড়ল। সে রোদে চোখ কুঁচকে স্বামীর দিকে তাকাল, দেখতে পেল তার গলার সামনের উঁচু হাড়টা কীভাবে নড়ছে...

বুড়ির জিভে জল এলো, তার মনে হল এখন এক ঢোক এ রকম তরল পদার্থ একেবারে চিরকালের জন্য তার তৃষ্ণা মেটাতে পারত... স্বামী মারা যাওয়ার পর সে বেশ কয়েকবার বীয়ার পরখ করে দেখার চেষ্টা করেছে, কিন্তু মনস্থির করে উঠতে পারে নি -- মেয়ে, জামাই আর পাড়াপড়শীদের সামনে লজ্জা হত... কিন্তু এখন তার মনে হয় লজ্জার কোন মানেই নেই। যা-ই বল না কেন, দুনিয়ায় পবিত্র বলে কিছু নেই। এমন কি লোকে খোদাকেও গালমন্দ করে আস্ত রাখে না, নিত্যই তার খুনোখুনি করে, অথচ তার জন্য কারও কোন সাজা হয় না। যা-ই হোক না কেন, তোমার দেহ, তোমার ভাবনাচিন্তা, বিবেক, লজ্জা, ভয়, ভালোবাসা--তোমার গোটা সত্তাই ধুলো হয়ে যাবে...

নিশ্বাস নেওয়া ক্রমেই কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। মুখের ভেতরে, গলায়, বুকে জ্বালা জ্বালা ভাব। জলতেষ্টা পাচ্ছিল। চায়ের কথা

বললে হয় না? না, তাতে হবে না। এক ঢোক, এক ঢোক বীয়ার যদি পাওয়া যেত তা হলেই হত — সব তেষ্টা মিটে যেত!..

বুড়ি কাঁটাগাছের মতো শুকনো হাত ওঠালো (এইভাবে সে তেষ্টার জল চাইত)। নাতনী উঠে দাঁড়াল, চা ঢালল। নানী হাত নাড়ল। মেয়েটি পেয়ালা রেখে দিয়ে খাটের তলা থেকে গামলা বার করল। বুড়ি আবার হাত নাড়ল।

'কী হল?' নাতনী জিজ্ঞেস করল।

'বীয়ার...'

নাতনীর চোখ বড় বড় হয়ে গেল — নানী ভুল বকছে।

'পয়সা ওখানে আছে... মনিব্যাগে,' নানী বলল।

না, ভুল বকছে না। তাকে সাধারণ অসুস্থ বৃদ্ধার মতোই দেখাচ্ছে।

'বীয়ারে আপনার কী দরকার?'

'খাব।'

'খাবেন?'

'যা, নিয়ে আয়।'

নাতনীকে অগত্যা ওভারকোট গায়ে ফেলে দোকানীর কাছে যেতে হল। (দূর পল্লীতে দোকানীরা সচরাচর লোকের সুবিধার জন্য নিজেদের বাড়িতেই মদ রাখে। গাঁয়ের কোন পড়শীর বাড়িতে অতিথি এলে গৃহকর্তা দিনে রাতে যে কোন সময় দোকান খুলতে বাধ্য করতে পারে। না খুললে রাগ করবে। সকলেই সকলের আত্মীয় কিনা!..)

নাতনী যখন দু'বোতল বীয়ার নিয়ে এলো তখন নানী চোখ বুঁজে শুয়ে ছিল।

'এনেছিস?' চোখ না খুলেই সে জিজ্ঞেস করল।

'এনেছি।'

'দোকানী মাগী কী বলল?'

'আমি বললাম, বাপজানের জন্যে...'

'বুদ্ধি আছে দেখছি। ঠাণ্ডা না কি? গরম কর।'

নাতনী বোতল দুটো চুলির গায়ে রাখল, তারপর গোল টেবিলটার ধারে বসে পড়া-তৈরীতে মনোযোগ দিল। বোতল ঘেমে উঠল, বোতলের গা বয়ে চোখের জলের মতো ধারা গড়িয়ে পড়ল। নাতনী বোধহয় বোতলের কথা ভুলেই গেল। সে গুণ অংক করছিল: ছয় আটে আটচল্লিশ, যোগ সতেরো...

'গরম হল?' নানী জিজ্ঞেস করল। সে খাটে বসে ছিল, তাকে আবার দেখাচ্ছিল বুড়ো কাকের মতো।

'অ্যাঁ?'

'বোতলের গা যদি শুকিয়ে গিয়ে থাকে তার মানে গরম হয়েছে।'

নাতনী বোতলের দিকে তাকিয়ে দেখল তাদের গায়ের জল শুকিয়ে গেছে।

'কী অমন ইতি-উতি করছিস?'

'খুলতে পারছি না।'

'তোর দাদু দাঁত দিয়ে খুলতেন...'

নাতনী চেষ্টা করল আরেকটু হলেই দাঁত ভাঙত। খাঁজ খাঁজ কাটা ছিপি নিয়ে তাকে অনেকক্ষণ ঝামেলা পোহাতে হল, শেষে ছুরি দিয়ে খুলল, পেয়ালায় ঢালল।

বুড়ি ঠোঁট দুটো এমনভাবে টানল যেন পেয়ালায় গরম চা আছে। সে সন্তর্পণে ছোট এক ঢোক গিলল — বীয়ার মনে হল টক, বিস্বাদ। পেয়ালাটা একটুখানি হাতে ধরে রাখল, তারপর চোখ বুঁজে তলানি পর্যন্ত গলায় ঢেলে দিল। খালি পেয়ালাটা ফেরত দিয়ে বালিশে হেলান দিল। সে এমনভাবে তাকাচ্ছিল যেন নিজের সমস্ত যন্ত্রণার শোধ তোলার জন্য সারা জীবন ধরে যে কাজের প্রস্তুতি নিচ্ছিল মাত্র এখনই যেন সেটা সম্পন্ন করল।

'আরও ঢাল।'

নাতনী আধ পেয়ালা ঢেলে তার সামনে রাখল।

'অমন করে তাকাচ্ছিস কেন? যা, শুতে যা!' নানী যখন বীয়ার খাচ্ছিল তখন তাকে দেখাচ্ছিল বুড়ো কাকের মতো'

নাতনী বই খাতা গুছিয়ে রাখল, চটপট বিছানায় ঢুকে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল...

বুড়ি এমন একটা স্বস্তি বোধ করল যেন কখনও সে অসুস্থ ছিল না, কেবল হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর একটু শুয়ে জিরিয়ে নিচ্ছিল, যেন সে মোটেই বুড়ি নয়, পঞ্চাশ বছর আগে যেমন ছিল তেমনি তরুণী ও সুন্দরী।

মুখের ভেতরে তখনও পাওয়া যাচ্ছিল টক-টক স্বাদ। আর সারা দেহে ছড়িয়ে গেল একটা ঝিমধরা উষ্ণতা।

বাইরের গেটটা এদিক ওদিক নড়ছিল আর ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ তুলছিল। হাওয়ায় ধাক্কা খাচ্ছে। ওখানে অন্ধকার আর বরফ-ঝড়...

বুড়ি আরও দুই ঢোক খেল। এখন আর আগের সেই উষ্ণতা পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু তার সর্বাঙ্গে যেন বয়ে চলেছে যৌবনের শক্তি। মনে হতে লাগল যে এখনই সে স্তেপে চলে যেতে পারে, শুকতারা ওঠার আগে পর্যন্ত সেখানে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে পারে, যেতে পারে সেই জায়গায় যেখানে কল্লোলিত হচ্ছে নদী, ফুটছে হলুদ রঙের সুগন্ধী ফুল, যেখানে তারা হাঁটত আলিঙ্গনবদ্ধ অবস্থায় আর বাধ্য ঘোড়াটা চলত তাদের পেছন পেছন — সেখানে স্বামী ওকে চুমো দেয় আর ঘোড়াটা তার ঈষদুষ্ণ নরম ঠোঁট দিয়ে স্পর্শ করে ওর হাত, যে হাতে ধরা ছিল ফুল। তারপর তারা চলল আরও এগিয়ে, তীর বরাবর। ঘোড়া পায়ে পায়ে চলল তাদের পেছন পেছন, চকচক করছিল তার ঠিকরানো চোখজোড়া, শব্দ করে খুঁটে খুঁটে সে মুখে তুলছিল তীরের রসাল ঘাস... ফিরে আসে ওরা সকাল নাগাদ, কেউই জানত না এই রাতগুলোর কথা। আর ঐ ধুমসী মাগীটা? তার ছিল ভরা বয়স, সে ছিল পুরুষের সোহাগের কাঙাল। পুরুষ মানুষটি ওর কাছ থেকে আশ মিটিয়ে নিত। বৌ ছিল কচি মেয়ে। আর সে ছিল পুরুষ... রাতগুলো ছিল রূপকথার মতো। এই রাতগুলোর কথা আগে তার মনে হয় নি কেন? এমনও হতে পারে যে তার রোজকার জীবন ঐ রূপকথা থেকে এত অন্য রকম ছিল যে তুলনা

করতে প্রবৃত্তি হয় নি, যদি করত তা হলে হয়ত পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়ার ইচ্ছে হত। আর সে? সে কি খারাপ স্বামী ছিল, কিংবা বাপ হিশেবে খারাপ ছিল? মদ খেত? কিন্তু সে ত আর কোন ব্যতিক্রম নয়। খেত দুঃখে। তার মানে না খেয়ে পারত না। অপমান করত? তাতে কী হয়েছে? কেবল মধুই যদি খাও ত গা বমি বমি করবে... ওখানে, নদীর ধারে এখন চমৎকার! সরসর করছে দেবদারু গাছ। হলুদ রঙের সুগন্ধী ফুল ফুটেছে। তারা মানুষের পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ছে। সূর্য চকচক করছে। আর দুভাগ হয়ে গেছে যে বিরাট দেবদারু গাছটা, যার ওপর অনে-ক, অনে-ক ক্ষণ বসে থাকা যায়, কোনকিছুর কথা না ভেবে নীচে পাক খাওয়া জলের স্রোতের দিকে তাকিয়ে থাকা যায়! গাছটার গায়ে তার স্বামী ছুরি দিয়ে যে চিহ্ন করেছিল তা আছে কি? পরদিন সেখানে হালকা হলুদ রঙের কষ চকচক করতে লাগল। সে বলল, দেবদারু কাঁদছে। পথের পাশের কোন গাছ থেকে পাতা ছিঁড়ে সেখানে লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দেওয়া হল। জখম... শুকিয়ে যায়...

বুড়ি সাবধানে বিছানা ছেড়ে উঠল। জোর না থাকায় পা দুটো ঠকঠক করে কাঁপছিল (দুবছর বিছানা ছেড়ে ওঠে নি)। সে হাতড়ে হাতড়ে নিজের জামাকাপড় বার করল, মাথায় রুমাল বাঁধল, জামাকাপড় পরল, সাবধানে দরজা খুলে অন্ধকারের মধ্যে বেরিয়ে এলো...

গাঁয়ের শেষে, যৌথখামারের অফিসের সামনে একটা লণ্ঠন দুলছিল। রাস্তা বরফে ছেয়ে গেছে। বাড়িগুলো বরফের সাদা চাদরে আপাদমস্তক জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোথায় যেন একটা কুকুর শীতে কিঁউ কিঁউ করছে।

...বুড়ি চলল ফুটন্ত ঘাসফুলের ওপর দিয়ে। মৌমাছিরা গুন্‌গুন্ করছে! স্বামী যে পথে সচরাচর বাড়ি ফিরত তার দুধারে ফুটত ত্রিপত্র ঘাসের ফুল। মেয়ে এই ফুলের গোলাপী গর্ভকেশর থেকে মিষ্টি রস চুষে খেতে ভালোবাসত। ওরা মায়ে-ঝিয়ে তার জন্য অপেক্ষা করত, চারটে পাতাসুদ্ধ ডাঁটা খুঁজে খুঁজে বার করত — এইভাবে ওরা আন্দাজ

করত ও শিগ্‌গিরই আসবে কিনা। দূর থেকে বাপের মূর্তি দেখতে পেয়ে মেয়ে তার দিকে ছুটে যেত, চেঁচিয়ে বলত: 'বাপজান, পয়া ঘাসটা কিন্তু আমিই খুঁজে বার করেছি!' সে মেয়েকে জিনের ওপর উঠিয়ে নিত। গালের দুপাশে হাড় ওঠা, সামান্য বসন্তের দাগওয়ালা মুখে বিমূঢ় হাসি খেলে যেত, সে ঘোড়ার চাবুক দিয়ে স্ত্রীকে মৃদু স্পর্শ করে বলত: 'কী খবর গো?' – 'কিছু না...' সে উত্তর দেয়, তারপর লাগাম ধরে ঘোড়াটাকে বাড়ির দিকে নিয়ে চলে, ঘোড়ার পিঠ থেকে ঝুড়ি খোলে। সেখানে ঝলমলে পোশাক, মাথায় বাঁধার সুন্দর রুমাল – এক কথায় খুব ঝলমলে কিছু না কিছু তার জন্য থাকতই। এইভাবে সে তার ভালোবাসা প্রকাশ করত। সে মেয়েকে চুমো খেত, তাতে স্ত্রী যেন গালে তার চুমোর স্পর্শ পেত। মেয়ে! বেচারি শহরে কেমনভাবে আছে কে জানে? শহরে ত সবকিছুর জন্যই পয়সা দিতে হয়। আর ও পয়সাকড়ি হাতে রাখতে পারে না। শেষ কড়ি পর্যন্ত দিয়ে দেবে, নিজে উপোস করবে...

সেই যুদ্ধের সময়, লোকে যখন অনাহারে হাত-পা ফুলে মারা যাচ্ছিল, তখন ও বীজের জন্য রাখা কাউন পাড়াপড়শীকে বিলিয়ে দেয়। জীবনটা কি ওর এখন মধুর? হয়ত মাতাল মর্দারা তার কাছে আসে, নাছোড়বান্দার মতো লেগে থাকে। ওর নিজের ত আর নেই।

...মৌমাছি গুন্‌গুন্‌ করছে। ফুটন্ত ঘাসফুলের ঘ্রাণ। ওখানে, গাঁয়ের প্রান্তে সূর্য আলো দিচ্ছে, দোল খাচ্ছে। ঘাসফুল এত উঁচু আর ঘন যে পা ফেলতে বেশ অসুবিধা হয়...

ত্যাগ করল! হয়ত এমনই দরকার ছিল? ও ত বুদ্ধিমতী, শিক্ষিত। হয়ত কেতাবে লেখা আছে যে এমন করা উচিত। জামাই... তার বয়স এখনও কম। নিজের ভাগ্য খুঁজে নেওয়ার সময় এখনও তার আছে...

সূর্য চোখে লাগছে। সে চলল পাহাড়ী নদীর দিকে। পাহাড়ী নদীটা যেন মানুষের হাতের ফোলা ফোলা শিরার মতো বিস্তৃত উপত্যকার ওপর দিয়ে শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে চলে গেছে, তৃষ্ণার্ত মাটিকে জল পান করাচ্ছে। সেখানে ছিল দুভাগে বিভক্ত সেই

দেবদারু গাছ, যার গায়ে পঞ্চাশ বছর আগে এক প্রেমিক যুবক চিহ্ন এঁকে দিয়েছিল। বুড়ি সূর্যের পাশ কাটিয়ে গেল। দুলন্ত সূর্য পেছনে পড়ে রইল। হাত, মুখ, ঘাড় পুড়ে যাচ্ছে, মাজা টনটন করছে, যেন সারাটা দিন সে মাথা না ঢেকে বিচালি কেটেছে। মহিলা জিরিয়ে নেবে বলে ঠিক করল, সে মাটিতে বসে পড়ল। ঘাসফুল পায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিল। মৌমাছি গুন্‌গুন্‌ করছে। ঘুম-ঘুম পাচ্ছে। সে চিত হয়ে শুয়ে পড়ে দুহাত ছড়িয়ে দিল। আকাশে মেঘের দল ভাসছে। আকাশ গাঢ় নীল, মেঘ ধবধবে সাদা। মেঘরাশি ক্রমাগত নীচে নেমে আসছে, ছোট ছোট খণ্ডে ভাগ হয়ে গিয়ে সাদা লিফ্‌লেটের আকার নিচ্ছে, মাটিতে উড়ে পড়ছে। ঠিক যেন বহুবছর আগেকার বিজয় দিনের মতো – সেদিন গাঁয়ের ওপর দিয়ে এরোপ্লেন উড়ে যেতে যেতে মাটিতে লিফ্‌লেট ছড়িয়ে দেয়। বাচ্চারা স্তেপময় ছুটোছুটি করতে করতে সেগুলো ধরতে থাকে। লিফ্‌লেটে লিফ্‌লেটে মাটি ঢেকে যায়..

বুড়ি হাইবুটের খটখট শব্দ শুনতে পেল। দুই ছেলে হাসান ও হোসেন ফৌজী বুট পায়ে মার্চ করে চলেছে। তাদের হাতে ধরা আছে একটা বিরাট লিফ্‌লেটের দুটি প্রান্ত। লিফ্‌লেটটা দেখতে দেখতে হয়ে দাঁড়াল সাদা চাদর। ছেলেরা বুড়ির গা ঢেকে দিল, চলল আরও এগিয়ে। 'বেঁচে থাক আমার বাছারা!' তাদের পেছন পেছন চলেছে আরও দুজন সৈন্য, তারাও বয়ে নিয়ে চলেছে সাদা চাদর, তার গা ঢেকে দিয়ে তারাও চলল এগিয়ে। তাদের পেছন পেছন আরও এবং আরও, আর তারা সকলেই দেখতে হাসান আর হোসেনের মতো... 'বেঁচে থাক আমার বাছারা!' কী গরমের আমেজ আর ভালোই না লাগছে! যেন কারও জোরাল ও স্নেহময় হাত তাকে দুলিয়ে দুলিয়ে ঘুম পাড়াচ্ছে! হে জীবন!.. তার গাল বয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে বাধা পেল ঘাড়ে এসে, মুক্তার আকার পেল. .

* * *

সকালে বরফ-ঝড় শান্ত হয়ে গেলে গাঁয়ের শেষ প্রান্তে, অফিসের অদূরে, রাস্তার পাশে তুষারকণায় ঢাকা এক বর্ষীয়সী মহিলার মৃতদেহ পাওয়া গেল। সে পড়ে ছিল দুহাত ছড়িয়ে। তার হিমকঠিন মুখে বজায় ছিল বিজ্ঞের হাসি... আর ছিল চিরন্তনতা...

শুকুরবেক বেইশেনালিয়েভ

বসন্তের পাখি

খুব ভোরে, সূর্য ওঠার কিছু আগে আগে শেওলা ও ছাতাধরা গভীর গিরিখাত থেকে বেরিয়ে এলো এক ঘোড়সওয়ার।

সরু সরু ঠ্যাংওয়ালা কটা রঙের যে দৌড়বাজ ঘোড়াটার পিঠে সে বসে ছিল তার সারা শরীরে ঘামের ফেলা জমে গেছে। বোঝাই যাচ্ছে, ঘোড়সওয়ার সারা রাত ঘোড়ার জিনেব ওপর কাটিয়েছে। তাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। তার তাড়া ছিল। আচমকা ঘোড়া উত্তেজিত হয়ে পড়ল, দুকান খাড়া করে উপত্যকা জুড়ে গলা ফাটিয়ে হ্রেষাধ্বনি করে উঠল।

সে ধ্বনি পাহাড়পর্বতে গড়িয়ে পড়ে যেন মুখর জলস্রোতের বেগ থামিয়ে দিল, ঘাসের বুকে কাঁপন ধরাল, নির্মেঘ সাদা আকাশে উড়ন্ত সোনালী ঈগলের গতিপথ বাঁকিয়ে দিল। সব যেন সতর্ক হয়ে

পড়ল, কান খাড়া করে নিথর হয়ে রইল। প্রতিধ্বনি দূরে মিলিয়ে যেতে উপত্যকার বুকে এসে নামল আগেকার নীরবতা।

ঘোড়সওয়ার মুখ গোমড়া করে ব্রোঞ্জের রেকাব দিয়ে ঘোড়ার তলপেটে লাথি কষাল, কিন্তু ঘোড়া জায়গা থেকে নড়ল না। সে মাথা গোঁজ করে দাঁড়িয়ে রইল, ভারী নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তার বুকের দুপাশের ঘর্মাক্ত পাঁজর ওঠানামা করতে লাগল। ঘোড়সওয়ার ধৈর্য হারিয়ে ঘোড়ার দুকানের মাঝামাঝি জায়গায় পাকানো চাবুক দিয়ে জোরে আঘাত করে জ্বালা ধরিয়ে দিল। ঘোড়া পেছনের দুপায়ে ভর দিয়ে লাফিয়ে উঠল, পাথুরে রাস্তার ওপর ফুলকি তুলে পিছিয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে দ্রুততালে কদম ছুটিয়ে দিল। কিন্তু শ'খানেক পা ছুটে এগিয়ে যেতে না যেতে দৌড়বাজ ঘোড়া হোঁচট খেতে লাগল, শেষে কাত হয়ে পড়ে গেল। লাগাম খুলে দিয়ে ঘোড়ার সামনের দুপা চুলের পাকানো দড়িতে একত্রে বেঁধে তাকে চরার জন্য ঘাসের ওপর ছেড়ে দেওয়া ছাড়া ঘোড়সওয়ারের গত্যন্তর রইল না।

উঁচু উঁচু পাহাড়, তাদের তুষারাচ্ছন্ন দুর্লঙ্ঘ্য চূড়া। নীরবতা। ঝিরঝিরে তাজা বাতাস, বাতাসে ভুরভুর করছে ঘাসপাতার মধু-মধু গন্ধ। নির্মল আকাশ, দিগন্তে শেষ তারাটি এখনও নেভে নি। উটের কুঁজের মতো দেখতে টিলাগুলো, ঝাঁকড়া ফার গাছে ঢাকা থাকায় মনে হচ্ছে তারা যেন লোম খাড়া করে আছে; গড়িয়ে গড়িয়ে চলে গেছে তাদের ঢাল। নির্মল আকাশে মৃদুমন্দ ভাসমান মেঘের রাশি আর সূর্যোদয় ধীরে ধীরে পথিকের পথশ্রমে হারানো উৎফুল্ল মেজাজ ফিরিয়ে আনল। সে চিত হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল, চোখ বুজে ঝিমোতে লাগল।

তার ঘুম ভাঙল বহুক্ষণ বাদে। সূর্য ততক্ষণে পাহাড়ের সারির অনেক ওপরে উঠে গেছে। আড়মোড়া ভেঙে হাই তুলতে তুলতে পথিক তার দৌড়বাজ ঘোড়ার পিঠে উঠতে গেল। কিন্তু তাকে সামনে আসতে দেখে ঘোড়া মাথা তুলে হ্রেষাধ্বনি করে উঠল; বুদ্ধিদীপ্ত, ধড়িবাজ-ধড়িবাজ চোখ দুটো তেরছা করে প্রভুর দিকে তাকাল, আলগা বাঁধন

সঙ্গে সঙ্গে হিঁচড়ে টানতে টানতে কেমন যেন আনাড়ির মতো কাত হয়ে ঘাসের ওপর দিয়ে ছুটল। প্রভুকে কিছুতেই সে কাছে ঘেঁষতে দিল না, তার সঙ্গে ববাবর একই রকম দূরত্ব বজায় রাখল। প্রভু থামতে সে-ও থামে, শান্তভাবে ঘাস খুঁটে খেতে থাকে।

'আর কত আমাকে জ্বালাবি রে কটা?' লোকটা চেঁচিয়ে উঠল। 'দাঁড়া, ধড়িবাজ বদমাশ, মজা দেখাচ্ছি!'

সে হাতের থলিটা দোলাতে দোলাতে প্রাণপণে দৌড়বাজের পিছু ধাওয়া করল। অয়েলক্লথের যে বর্ষাতিটা তার গায়ে ছিল তা হাওয়ায় ফুলে উঠল, বর্ষাতির প্রান্ত হাই বুটের ওপর ঝাপটা মারতে লাগল।

কিন্তু ঘোড়াও সতর্ক হয়ে ছিল। উটের কুঁজের মতো যে টিলাগুলো দেখা যাচ্ছিল সে সেদিকে ছুট দিল, ছুটতে ছুটতে ঘাড়ের কেশর আর লেজ নাড়াতে লাগল। সে তার পেছন পেছন যে দড়িটা হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছিল সময় সময় তাতে পা বেধে হোঁচট খাচ্ছিল আর রাগে নাক দিয়ে ঘড়ঘড় আওয়াজ করছিল।

মোটা মোটা মেঠো ইঁদুরের দল থামের মতো তাদের গর্তের পাশের মাটির ঢিবির ওপর দাঁড়িয়েছিল. ভয় পেয়ে তারা সুরসুর করে গর্তের ভেতর ঢুকে পড়ল। ওদের মধ্যে যাদের সাহস একটু বেশি তারা পেছনের দুপায়ে ভর দিয়ে যার যার জায়গায় আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে কিচকিচ করে আওয়াজ তুলে যেন হতভাগ্য ঘোড়সওয়ারকে নিয়ে মজা করতে লাগল।

'পাহাড়ের খাতে নয়ত শুকনো মরুভূমিতে মরে পড়ে থাক!' ঘোড়াটাকে পালাতে দেখে তার যাত্রাপথের দিকে তাকাতে তাকাতে পথিক আক্ষেপ করে গালগাল দিল। সে ভেড়ার পালের পায়ে পায়ে মাড়ানো পাথুরে পথ ধরে টিলার ওপরে উঠল. ঘোড়াটাকে শাপশাপান্ত করতে বাকি রাখল না।

সামনেই দেখা গেল ভেড়ার পাল চরছে। ভেড়ার পালের পাশে রাখালিয়া লাঠির ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক অল্পবয়সী ছেলে। তার দুগালে গোলাপী রঙের ছোপ ধরা, কচি ভেড়ার চামড়ার

টুপিটা নীচু করে চোখের ওপর টেনে দেওয়া, গায়ে গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা, ঢিলে পোশাক।

'এই রাখাল, আমার পাগলা ঘোড়াটাকে পাকড়াও কর ত!' থমকে দাঁড়িয়ে ঘন ঘন নিশ্বাস নিতে নিতে লোকটা বলল। তার মুখ বয়ে দরদর ধারে ঘাম ঝরছিল।

ছেলেটা ঝট করে ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ল, ঘোড়া যখন পাশ দিয়ে ছুটতে লাগল তখন সে কৌশলে তার পায়ের সঙ্গে বাঁধা দড়িটা ধরে ফেলল।

'সাবাস! বখশিস মিলবে!'

"যা-ই বল না কেন, আমাদের পাহাড়ী ছেলেছোকরাগুলো কিন্তু বেশ চালাকচতুর হয়ে থাকে," এই ভাবতে ভাবতে সে গড়ানে ঢাল বয়ে ওপরে উঠতে লাগল। রাখাল সেখানে ঘোড়াটা ধরে দাঁড়িয়েছিল। "লেজ ধরে ঘোড়া পাকড়াও করাও ওদের কাছে ছেলেখেলা! ওকে কিছু একটা উপহার না দিলে নয়, আর এমন ভাব করতে হবে যেন ঘোড়াটা ছুটে গেছে দৈবাৎ, তার আনাড়িপনার জন্য নয়।"

সে পকেট হাতড়ে ছুরি আর পেন বার করল। কী দেওয়া যায়? পাহাড়ে দুটোর কোনটা ছাড়াই তার চলে না, কিন্তু কথা না রাখলেও চলে না! অথচ পকেটে রুমাল ছাড়া আর কিছুই নেই। নতুন কলমটায় কেবল যাত্রার আগেই কালি ভরেছে, তা দিয়ে এক ছত্রও সে এখন অবধি লেখে নি। আর ছুরিটার ছিল অসংখ্য ফলা, কাঁটা ও কাঁচি। ছুরিটা সম্ভবত বেশি কাজে লাগতে পারে — ও ছাড়া একটা লাঠিও কেটে বার করা যায় না, অতিথিপরায়ণ তাঁবুতে চর্বিওয়ালা ভেড়ার মাংসের টুকরো তোমার দিকে বাড়িয়ে দিলে তা-ও কায়দা করতে পারবে না। আর যদি মাংসের কিমা কুচোতে হয়? আরে কিমাই বা কেন? — ছুরি না হলে একটা সাধারণ পেনসিলও ত কাটা যাবে না!

মাংসের কথা মনে পড়তে পথিকের খিদে পেয়ে গেল, তার জিভে জল এলো। সে মনে মনে স্থির সংকল্প করল যে কলমটা উপহার দেবে। এই ভেবে ছুরিটা ফের পকেটে লুকিয়ে ফেলল। পথিক

ক্লান্তভাবে রাখাল ছেলেটির পাশে সাদা শিলাখণ্ডের ওপর ধপ্ করে বসে পড়ল, তার ফৌজী সার্টের কলারের বোতাম খুলল, লাল টকটকে ঘর্মাক্ত মুখ বাতাসের দিকে বাড়িয়ে দিল, তারপর ক্লান্ত স্বরে বলল:

'যদি কিছু মনে না করিস, এই কটা শয়তানটাকে আমার কাছে নিয়ে আয় -- ওর ঠ্যাংগুলো হেজে শুকিয়েও যায় না! ওর পাল্লায় পড়ে আমি জেরবার হয়ে গেলাম, ও যেন খেপেই গেছে।'

ছেলেটার কালো চোখের দিকে তাকিয়ে পথিক তার দিকে পেন আর নোটবই বাড়িয়ে দিল।

'লোকে বলে যে রাখালেরা গান ভালোবাসে,' ও বলল। 'আমার কাছ থেকে স্মৃতিচিহ্ন হিশেবে এটা নে, যা ভালো লাগে তা-ই লিখে রাখবি।'

ছেলেটা নড়াচড়ার কোন লক্ষণ দেখাল না। সে লাঠিতে ভর দিয়ে চুপচাপ পথিকের দিকে তাকিয়েই রইল, যেন তার ভাষা বুঝতে পারছে না। পথিক বিমূঢ় হয়ে পড়ল। সে উপহার দুটো পাথরের ওপর রেখে দিল, ঘোড়ার মুখে লাগাম লাগিয়ে লাফিয়ে জিনের ওপর উঠে পড়ল। অবাঞ্ছিত প্রশ্নের ভয়ে সে ঘোড়াটাকে দাবড়ে টিলার ঢাল বয়ে নীচে ছুটিয়ে দিল।

* * *

নুড়িপাথরে ঘেরা পাহাড়ী ঝরণার ধারে বিচ্ছিন্নভাবে দাঁড়িয়ে ছিল নিঃসঙ্গ একটি তাঁবু। তারই কাছে ঘোড়সওয়ার ঘোড়া থেকে নামল।

তাঁবুর মালিক – বুড়ো-বুড়িতে --- অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল কটা দৌড়বাজটাকে। সচরাচর ওটাতে চেপে আসতেন যৌথখামারের সভাপতিমশাই। ওরা তাই অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে এ ওর দিকে তাকাল। তাঁবু থেকে যে ছায়া পড়ছিল সেখানে দল বেঁধে ছিল ক্রুদ্ধ অ্যালসেশিয়ান কুকুরেরা। তারা অশান্ত হয়ে উঠে আগন্তুকের দিকে

ধেয়ে গেল। বুড়ো তাদের খেদিয়ে দিয়ে দৌড়বাজ ঘোড়াটাকে ঘোড়া বাঁধার খুঁটিতে বাঁধল, তার ম্লান মিটমিটে চোখজোড়া রোদে কুঁচকে বলল:

'আমাদের এখানে পেঁছুনো ত চাট্টিখানি কথা নয়! পথও গেছে ছাই পাহাড় আর বনজঙ্গলের ভেতর দিয়ে! তুমি বেশ তাড়াতাড়ি এসেছ, কেন না তুমি এসেছ পাকা দৌড়বাজের পিঠে চেপে। এই কটা দৌড়বাজটার — চুলোয় যাক ও — কেবল দুটো ডানা নেই, এই যা! পথে নিশ্চয়ই ধকল গেছে, ঘোড়ার দুধ চলবে ত? ওরা সঙ্গে একজন লোকও দিতে পারল না ছাই — পথ-টথ হারাও নি ত একবারও?'

'বলি হ্যাঁ গো বুড়ো, আর কতক্ষণ বকবক করে অতিথিকে যন্ত্রণা দেবে?' তাঁবু থেকে বুড়ি গজগজ করে বলল। 'অতিথিকে আগে জল দিতে হয়, খাওয়াতে হয়, তারপর যা জিজ্ঞেসবাদ করার থাকে কর — তাও ভুলে গেলে না কি? ওঁকে ভেতরে নিয়ে এসো দেখি।'

তাঁবুর ভেতরে মাটির মেঝে আগাগোড়া নরম কোঁকড়ানো পশমওয়ালা ভেড়ার চামড়ায় ঢাকা — এমন ধবধবে ও পরিচ্ছন্ন যে দেখে মনে হয় সবে কচি ভেড়ার গা থেকে ছাড়ানো। সেগুলোর ওপর ধুলোমাখা জুতোর পা ফেলতেও মন খুঁতখুঁত করে। দেয়ালের পাশে স্তূপাকার করে রাখা আছে বিচিত্র বর্ণের লেপ আর বালিশ; তার ডান দিকে ভেড়ার চামড়ার চাদরের একাংশ ঢাকা আছে প্রাচ্যদেশীয় কারুকাজে খচিত কম্বলে। তাঁবুর ঠিক মাঝখানে অগ্নিকুণ্ড, তার ওপর ঝুলছে কালিঝুলিমাখা কালো একটা কড়াই।

বুড়ি পর্দার আড়ালে অন্দরমহলে চলে গেল। সেখান থেকে বাসনপত্রের ঝনঝন শব্দ ও জলের ছলকানি কানে আসতে লাগল, এদিকে বুড়ো ঝোপড়া ভুরুজোড়া নাচাতে নাচাতে ব্যস্তসমস্তভাবে একটা কাঠি দিয়ে উটের মোটা চামড়ায় তৈরী থলের ভেতরে দুধ ঘাঁটতে শুরু করল। সেখান থেকে কল্‌কল্ ও সোঁ সোঁ আওয়াজ উঠল। অতিথি ভেড়ার চামড়ার চাদরের ওপর বসে পড়ল এবং কিছুই করার না থাকায় তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল তাঁবুর জাফরির আড়ালে

গোঁজা বইখাতা, ছাতা, প্রবেশপথের কাছে ঝোলানো বন্দ্বক, বন্দ্বকের গায়ের র্বপোলি অলঙ্করণ, তাঁব্বর অর্ধেক জ্বড়ে ঝোলানো স্বন্দর গালিচার গায়ে ফিল্ড-গ্লাস, সত্বর্ণিগুর ওপর সামোভার ও তারই পাশে গ্রামোফোন।

যে সব জিনিস অতিথির মনোযোগ আকর্ষণ করল তার অনেকগ্বলো এই সাক্ষ্যই দিচ্ছিল যে ব্বড়ো-ব্বড়ি ছাড়া তাঁব্বতে আরও একজন আছে, আর এগ্বলো তারই জিনিস। কিন্তু এই অপরিচিত লোকটা যে কে তা আন্দাজ করা অত সহজ নয়।

জলখাবারের সময় কর্তা-গিন্নি অতিথির দ্বপাশে বসে পাল্লা দিয়ে তাকে নানা রকম খাবারদাবারে আপ্যায়ন করে চলল।

'ঘোড়ার দ্বধটা একেবারেই খাচ্ছ না কেন বেটা?' ব্বড়ো বলল। 'আমাদের ভাজা পিঠে খেয়ে দেখ, আমার গিন্নির মতো খাসা আর কেউ বানায় না। আমাদের সরভাজা খাও, ভেড়ার পনির নিচ্ছ না কেন, ছাই? অতিথিকে জিজ্ঞেসবাদ করে ব্যতিব্যস্ত করার আগে তাকে ভালোমতো খাওয়ানো দরকার। ঠিক বললাম কিনা গো গিন্নি?'

'ওঁর দিকে চিনির পেয়ালাটা এগিয়ে দাও, চুপ করে থাক। কী করতে হবে ওঁর নিজেরই জানা আছে,' ব্বড়ি ব্বড়োকে হ্বকুম দিল। তার বলিরেখা আঁকা ম্বখে হাসি ফুটে উঠল। অতিথির দিকে ফিরে সে বলল, 'সরভাজা খান, ভেড়ার দ্বধের পনির নিন, আমাদের পরটা খেয়ে দেখ্বন, লজ্জা করবেন না। ভালো করে খান, আমি ততক্ষণে খাবারটা রান্না করি।'

এই অতিথিপরায়ণ কর্তা-গিন্নির জীবন সম্পর্কে কিছ্ব জানার জন্য অতিথির আর ত্বর সইছিল না -- তার কারণ এমন হতে পারে যে ওর বয়স একেবারেই কম, আবার এ-ও হতে পারে যে পড়াশ্বনার পর এই প্রথম গাঁয়ে এসেছে বলে। তবে সে জানত যে প্রথা অন্বযায়ী ছোটরা জিজ্ঞেসবাদ করে আলোচনা শ্বর্ব করতে পারে না।

চপচপে ভাজা পরটার সঙ্গে কয়েক পেয়ালা ঘোড়ার দ্বধ খাওয়ার পর ব্বড়ো গামছা দিয়ে ম্বখ ম্বছল, দ্বিষ্ট এফোঁড়-ওফোঁড় করা পাতলা

দাড়িগাছা থেকে খাবারের গুঁড়ো ঝেড়ে ঝেড়ে ফেলল, তারপর পুরনো, শতচ্ছিন্ন জুতোজোড়ার গোড়ালি টেনে পরল এবং সতরঞ্চিতে সটান শুয়ে পড়ল। সম্ভবত অনেকক্ষণ বসে থাকার ফলে তার পায়ে ঝিন্ ধরে গিয়েছিল, সে তাই থেকে থেকে রোদে-পোড়া বলিরেখা-আঁকা হাত দিয়ে পা ঘষছিল।

ঝাঁকড়া ভুরুজোড়ার আড়াল থেকে চোখ কুঁচকে অতিথির দিকে তাকাতে তাকাতে সে বলল, 'লোকে ছাই বলে যে মানুষ মানুষকে জানতে পারে না যতক্ষণ কথাবার্তা না হচ্ছে, ঘোড়া ঘোড়াকে জানতে পারে না যতক্ষণ চিঁহি না করছে। তোমাকে সাবাস বলতে হয়, বিশেষ কথাবার্তা বলা তোমার ধাত নয়। আমাদের তাঁবুতে এক বছরে যে কত অতিথি এলো গেল তার ইয়ত্তা নেই, কিন্তু তোমার মতো এমন অল্প কথার মানুষ এলো এই প্রথম। তুমি দেখছি আমারই মতো, গলায় ফাঁস দিলেও বাড়তি কথাটি বেরোবে না।'

'নজির দেওয়ার আর লোক পেলে না!' হাত নাড়িয়ে বুড়ি বলল। 'তোমার চেয়ে বেশি বক্কেশ্বর দুনিয়ায় আর কে আছে শুনি?'

'তাতে কী হয়েছে? আমি ঠিক কথাটা বলছি! দেখে শুনে মনে হয় আমাদের অতিথি শহুরে মানুষ, আর আমাদের গাঁয়ে বহু দিন ধরে যে কথা জানা আছে তা যদি মানতে হয় তা হলে আমাদের কাছে যে এসেছে সে যৌথখামারের নতুন পশুপ্রযুক্তিবিদ ছাড়া আর কেউ নয়। আমি ঠিক বলছি কিনা?'

'ওঃ, গণকঠাকুর আমার!' বুড়ি উপহাস করে বলল। 'দেখো, নাম ডুবিও না।'

'না, ঠিকই বলেছেন!' অতিথি বলল। 'আমি সত্যি সত্যিই ইনস্টিটিউট শেষ করার পর আপনাদের খামারে পশুপ্রযুক্তিবিদ হয়ে এসেছি। আমার নাম এরগেশ্, আমি মেদেরের ছেলে।'

'হুঃ হুঃ বলি ছাই, আমাকে ফাঁকি দেওয়া!' বুড়ো হাতে হাত ঘষতে ঘষতে উৎসাহিত হয়ে বলল। 'আমি চালাক লোক, আমার সব দিকে নজর আছে! আমার নাম নুরমাত, আর আমার আদরের

গিন্নিটির নাম হল তেপকেদেই। আমাদের বয়স যে কী করে বেড়ে গেল তা আমরা খেয়ালই করতে পারি নি — এখন অল্পবয়সীদের জন্যে পথ ছেড়ে দেওয়া দরকার। পনেরোটি বছর ভেড়ার পালের পেছনে দিয়েছি, কার এটা ভালো লাগে বল? রাখাল হিশেবে ছিলাম সকলের ভক্তিশ্রদ্ধার পাত্র, আর এখন সকলেই আমাকে শেখানোর চেষ্টা করে! নিজের মেয়ে পর্যন্ত...'

সে সখেদে মাথা নাড়ল, দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে গেল। তেপকেদেইয়ের কাঁধে ছিল ফুলকাটা ক্রীম রঙের ওড়না। সে ফোঁপাতে ফোঁপাতে ওড়নার আঁচল দিয়ে চোখ মুছল, তারপর চুপচাপ উঠে পর্দার আড়ালে চলে গেল।

'যুদ্ধে আমাদের একমাত্র ছেলে মারা গেছে,' বুড়ো মৃদু স্বরে বলল। 'এখন মেয়েটি আমাদের কম জ্বালাচ্ছে না...'

সে উঠে দাঁড়াল, দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে বাইরে উঁকি মারল। ভুরুজোড়া নড়ে উঠল, নাকের গভীর খাঁজের ওপর দুটো ঝোপ এসে জুড়ে গেল।

'মেঘ করেছে,' গম্ভীরভাবে সে বলল। 'তেপকেদেই, তাঁবুর ওপরের ঢাকনাটা ফেলে দাও, ভেড়ার পালের কাছে চলে যাও... ওর জন্যে ছাতা নিয়ে যাবে কিনা দেখ। আমি যদি নিয়ে যাই ও আবার ঠোঁট ওল্টাবে।'

এরগেশ অবাক হয়ে চোখ তুলে বুড়োর দিকে তাকাল। গিরিখাতের ওপার থেকে আকাশের বুকে এসে জমছিল কালো কালো মেঘ। বুড়ো সে দিকেই তাকিয়ে ছিল, তাই ওর দৃষ্টি দেখতে পেল না। তাঁবুতে একেবারে অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। বুড়ি পোশাক পরে নিল, মাথায় রুমাল জড়িয়ে, ছাতা নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

'দেখো, বকবক করে অতিথিকে যন্ত্রণা দিও না... বরং খাবারের মাংসটার একটা ব্যবস্থা কর,' বেরোবার সময় কম্বলের পর্দাটা টেনে দিতে দিতে সে বলল।

রাস্তায় আবার ঘোড়ার খুরের আওয়াজ হল, তারপর আবার সব

শান্ত। কিন্তু মিনিটখানেক যেতে না যেতেই তাঁবুর ছাউনির ওপর বৃষ্টির প্রথম ফোঁটাগুলো টপটপ করে পড়তে লাগল, দেখতে দেখতে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। বাতাসের বেগে গোটা তাঁবু কাঁপতে লাগল।

এরগেশ উঠে দাঁড়াল, কম্বলের পর্দা খানিকটা ফাঁক করতে মুখের ওপর এসে লাগল কনকনে ঠাণ্ডা ঝাপ্‌টা। শিলাবৃষ্টি হচ্ছে। তাঁবুর চারপাশের মাটি সাদা হয়ে গেছে, পাহাড়ের ঢাল বয়ে লাফাতে লাফাতে গড়িয়ে পড়ছে পায়রার ডিমের মতো বড় বড় শিলা, তারা একে অন্যকে পিছে ফেলে ছুটছে। এই কিছু দিন আগেও তৃণভূমির যে সব উজ্জ্বল ফুলের সে তারিফ করে এসেছে সেগুলো মিইয়ে গেছে, তাদের ছিন্নভিন্ন পাপড়িদল ছিটের টুকরোর মতো নিষ্প্রাণ, বাতাসে মৃদু মৃদু কাঁপছে, নুইয়ে পড়া ঘাসের ওপর বিচিত্রবর্ণের নক্সিকাঁথা বিছিয়ে দিয়েছে।

"আমার রক্ষাকর্তা সেই রাখাল ছেলেটা এখন কেমন আছে?" এরগেশ মনে মনে ভাবল। "এমন আবহাওয়ায় ভেড়ার পাল নিয়ে একা একা সহজ নয়।"

ভয়ংকর কান ফাটানো আওয়াজ করে বাজ পড়ল। এরগেশের মনে হল যেন আকাশ চিরে দু টুকরো হয়ে পাহাড়পর্বতের ছুঁচালো মাথার ওপর ভেঙে পড়ল। চোখ ধাঁধানো বিদ্যুৎ খেলে গেল। তারপর এলো অন্ধকার, যেন পাহাড়ের ওপর রাত নেমে এলো।

বুড়ো সতরঞ্চির ওপর বসে নিঃশব্দে ঠোঁট নাড়াচ্ছিল — সে প্রার্থনা করছিল। তরুণ পশুপ্রযুক্তিবিদের উৎকণ্ঠাপূর্ণ চোখে চোখ পড়তে বসার ভঙ্গি না পাল্‌টেই সে শান্ত কণ্ঠে বলল:

'আমাদের পাহাড়ী গাঁয়ে আরও অনেক কিছু দেখতে পাবে — ছাই... শিলাবৃষ্টি ত বেশিক্ষণের নয়, কিন্তু এতেই নিস্তার নেই...'

আর সত্যিই তাই। শিগ্‌গিরই এরগেশ শুনতে পেল পাহাড়ে বরফঝড় ক্রুদ্ধ হয়ে হুঙ্কার তুলছে, হুহু আর্তনাদ করছে। তাঁবু হেলে পড়ল, বাতাসের ঝাপ্‌টায় মড়মড় করে উঠল, তার নীচ থেকে সর্বত্র ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকতে লাগল...

ঘুম ভাঙতে এরগেশ চাঙ্গা বোধ করল, দূর পথযাত্রায় যে শক্তি সে হারিয়েছিল তা আবার ফিরে পেল। গতকালের ক্লান্তির আর কোন চিহ্ন ছিল না।

নরম গদির ওপর, সাটিন কাপড়ের গরম লেপের ভেতরে শুয়ে শুয়ে সে কান পেতে শুনতে লাগল দূরাগত বাতাসের শিস। দুর্যোগের দিনে পালকহীন পাখির ছানা তার নরম বাসায় যেমন আরাম বোধ করে, ওরও তেমনি আরাম লাগছিল।

'না, না... পাহাড়ী গাঁয়ের মতো আর কোথাও বোধহয় এত গভীর ঘুম হয় না! পাহাড়ী চারণভূমিতে ঘুম গভীর আর নিশ্চিন্ত। এ মোটেই তোমার শহর নয় - শহরে গ্রীষ্মকালের গরমে ইচ্ছে হলেও সারা রাত ঘুমানোর উপায় নেই, গুমোট গরমে এপাশ ওপাশ ছটফট করে কাটে, পাতলা ফিনফিনে চাদরও তখন অসহ্য ভারী আর গরম বলে মনে হয়। কিন্তু পাহাড়ী গাঁয়ে ব্যাপারই অন্য! রাতের ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা তোমার ঘুমকে গাঢ় করে তোলে, সেই সঙ্গে নীরবতা আর এমন এক বোধ যে তুমি আছ পাহাড়ের বুকে, অনেক অনেক ওপরে, এমন কি আকাশের অধিপতি যে সোনালী ঈগলরা, তারাও তোমার নীচে।

এরগেশ বিছানায় শুয়ে শুয়ে আরাম উপভোগ করতে লাগল। মনে পড়ে গেল তাঁবুর কর্তার সঙ্গে তার গতকালের আলাপ।

'মেয়েটা ছাই পড়াশুনায় বেশ চটপটে ছিল, ওর জুড়ি ছিল না,' বুড়ো নুরমাত বলল। 'সাত ক্লাসের পর স্কুলের পড়া শেষ করার জন্যে ও সদরে গেল। ছুটির সময় যখন আসত তখন কেবলই তার মুখে টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটে পড়ার কথা। স্বপ্নে এমনই বিভোর যে থামায় সাধ্য কার! ভাবছ, কী হল? শেষটায় কী দাঁড়াল? কিছুই হল না ছাই!' সে বিষণ্নভাবে এরগেশের দিকে তাকাল, অন্যমনস্কভাবে দাড়িগোঁফ খুঁটল। 'ভালো ফল করে দশ ক্লাসের পড়াশুনা শেষ করল,

চলে এলো — ভাবছ, কোথায়? কোথায় আর — যৌথখামারে! স্কুল পাসের সার্টিফিকেট নিয়ে কিনা খামারে! ইনস্টিটিউটের কথা কানেই তুলল না। বলল, 'কাজের জীবন শুরু করতে চাই!' আর ছাই আমাদের সভাপতিমশাই -- বাজপাখির মতো ওর ওপর ছোঁ মেরে বসলেন, বললেন: 'সাবাস, এই ত চাই, ঠিক করেছ! তোমার মতো শিক্ষিত মেয়েদের বড় বেশি দরকার আমাদের এখানে!' এই বলে আমি যে ভেড়ার পাল চরাতাম তার রাখাল করলেন আমারই মেয়েকে। আমাকে বলা হল: 'তুমি অনেক কাজ করেছ, এবারে বিশ্রাম নাও!' বলি, এর থেকে বড় লজ্জার কথা আর কী হতে পারে?'

বুড়ো ম্লান চোখজোড়া নামিয়ে দুঃখের সঙ্গে মাথা নেড়ে বলে চলল:

'লোকে সত্যি-মিথ্যে কিছু জানল না, দোষ দিতে লাগল আমাকে। সারা গাঁয়ে ছাই রটে গেল যে আমি, বুড়ো নুরমাত নিজের মেয়ের ওপর কোন দয়ামায়া না দেখিয়ে তাকে জোর করে আমার বদলে রাখালের কাজে দিয়েছি। এমন কথা কারই বা কানে মধুর লাগে? আমি আর গিন্নিতে মিলে কি ওকে ইনস্টিটিউটে পড়তে যাওয়ার জন্যে কম সাধ্য সাধনা করেছি? কিন্তু কিসের কী? ও আমার রাখালের লাঠি হাতে তুলে নিল, পাহাড়ের ঘেসো জমিতে ভেড়ার পাল নিয়ে গেল। আর এখন আমি হলাম দোষী, এই লজ্জাও আমাকে সহ্য করতে হবে। তা যাক গে, আমরা বুড়ো-বুড়িতে ওর পাখনা কাটব এখন! এই তাঁবুতে যা কিছু দেখছ সে সব হল ওর যৌতুক। আমরা আমাদের দেশের বাড়ি থেকে ওগুলো এই পাহাড়ী গাঁয়ে নিয়ে এসেছি। একমাত্র মেয়ের সঙ্গে আমাদের ছাড়াছাড়ি হওয়াটা যদিও কষ্টের, তবু সেটাই দরকার... ওর বিয়ে দেব...'

'অতিথি এখনও সুস্থ আছেন? না কি ওঁর মতন ঝিমধরা মানুষ দুনিয়ায় আর দুটি নেই?' তাঁবুর বাইরে বেজে উঠল এক কিশোরীর সুরেলা কণ্ঠস্বর।

এরগেশ স্মৃতিচারণে ডুবে ছিল। সে বিছানা ছেড়ে এমন ভাবে লাফিয়ে উঠল যেন তার গায়ে হুল ফুটেছে। তার দুটো গাল জ্বলতে

শুরু করল। তাড়াহুড়ো করে জামাকাপড় পরে নিয়ে তাঁবুর ছাউনির ছাদের ফাঁক দিয়ে সে পরিষ্কার আকাশের দিকে তাকাল। ছাউনির ছাদের ফাঁক দিয়ে তাঁবুতে রোদ এসে পড়ছে, মেঝেতে বিছানো কচি ভেড়ার চামড়ার ওপর সোনালী রং ধরিয়ে দিয়েছে।

তাঁবুর পাশ দিয়ে কে যেন ভেড়ার পাল খেদিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। এরগেশের কানে আসছিল পাথুরে রাস্তায় ভেড়ার খুরের দ্রুত খটখট আওয়াজ আর কুকুরের ডাক।

এরগেশের ভাসা ভাসা মনে পড়ল গতকাল সন্ধ্যায় অনেকক্ষণ তাকে নিদ্রাবেশের সঙ্গে যুঝতে হয়েছে, অনেক কষ্টে ঘুমজড়ানো চোখের পাতা আলগা করে রাখতে হয়েছে, তারপর তুষারঝঞ্ঝার করুণ শিস আর বুড়ো নুরমাতের দীর্ঘ কাহিনীর তালে তালে ঘুমে ঢলে পড়ে। বুড়ো যখন ওর কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে রাতের খাবারের জন্য ডাক দিল তখন সীসের মতো ভারী চোখের পাতা অতি কষ্টে তার পক্ষে তোলা সম্ভব হয়। চুল্লিতে ঘুঁটে জ্বালানো আগুন থেকে লকলকে জিভের মতো শিখা নাচছিল। এরগেশ সে আলোয় চোখ কোঁচকাল, আধা ঘুমন্ত অবস্থায় হাত ধুল, বড় বাটি থেকে গরম ভাপে আচ্ছন্ন চর্বিওয়ালা ভেড়ার মাংসের টুকরো তুলে নিল, হাড় থেকে সুস্বাদু রসাল মজ্জা চুষতে লাগল। তার চোখ থেকে থেকে আপনা-আপনিই জুড়ে আসছিল। শেষে ওর জন্য বিছানা পাতা হতে গরম লেপের ভেতর ঢুকতে পেরে ও সুখ পেল।

ঠান্ডায় জড়সড় হয়ে এরগেশ তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলো। ঘাসের ওপরে কুয়াসা ছড়িয়ে পড়েছে; সে কুয়াসা চোখের সামনে ওপরে উঠে গিয়ে প্রভাতী সূর্যের কিরণে গলে গেল।

তাঁবুর পেছনে এরগেশের অদেখা লোকদের মধ্যে তুমুল তর্কাতর্কি চলছে:

'আমার পেছন পেছন যাওয়ার কী আছে? আমি কচি খুকী না কি? তোমাদের খালি ভয় বুঝি রোদে পুড়েই গেলাম, বরফঝড়ে জমে গেলাম, বৃষ্টিতে ভিজে গেলাম! তোমরা বরাবরই অমন,

বরাবরই...' এ হল সেই কণ্ঠস্বর যা এরগেশের গভীর চিন্তার সূত্র ছিন্ন করে ফেলেছিল।

"ওঃ বাপ-মা'র সঙ্গে কথা বলার ছিরি দেখ!" সে মনে মনে ভাবল। "কির্গিজ মেয়েরা সব ব্যাপারে চিরকালই বড়দের কথা শোনে, আর এ মেয়েটা কিনা ওদের কথাই বলতে দিচ্ছে না! এ কী স্বভাব!"

'তুই একবার নিজের দিকে চেয়ে দ্যাখ, তোর চেহারার কী হাল হয়েছে,' তেপকেদেই সস্নেহে বলল। 'অন্তত আমাদের, বুড়ো-বুড়িকে তোর সঙ্গে ভেড়া চরাতে দে। তোর বাপ কি ভেড়াগুলোকে না খাইয়ে রেখে দেবে, না কি সময় মতো ওদের জল খেতে দেবে না? আরে অমন থ মেরে দাঁড়িয়ে রইলে কেন?' এবারে সে স্বামীর ওপর ঝাঁঝিয়ে উঠল। 'ওর হাত থেকে রাখালের লাঠি কেড়ে নিয়ে ভেড়া চরাতে যাও! তোমরা আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারলে...'

'আমার পথে যদি তোমরা বাধা দাও তা হলে আমি আমাকে অন্য ভেড়ার পাল দেওয়ার কথা বলব, পাশের মাঠে চলে যাব,' মেয়ে গোঁ ধরে রইল। 'যাক গে আর দেরি করলে আমার চলবে না। চলি!'

এরগেশ তাঁবুর পাশে দাঁড়িয়েছিল, সে শুধু তার পেছনটা দেখতে পেল। ভেড়ার দল গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে চলছিল। মেয়েটি কাঁধে লাঠি ফেলে হনহন করে তাদের পেছন পেছন চলল।

বুড়ো নুরমাতের মেয়ে তোতু যে দিন থেকে ভেড়া চরাতে শুরু করে তারপর থেকেই বুড়া লোকজনের নজর এড়িয়ে চলে। এমন কি নিজের তাঁবুও নতুন জায়গায় সরিয়ে নিয়ে আসে, তাঁবু বাঁধে গাঁয়ের বাইরে।

নিষ্ক্রিয়তা অনেক দিন যাবতই রাখালের অসহ্য হয়ে উঠছিল। তাই যুবক পশুপ্রযুক্তিবিদ যখন যৌথখামারের চারণভূমিগুলো ঘুরে ঘুরে

দেখার সময় নুরমাতকে তার সঙ্গী হতে বলল তখন সে খুশিই হল। কিন্তু খুশির ভাবটা কাউকে দেখানো তার ইচ্ছে ছিল না। সে গম্ভীরভাবে, ব্যস্তসমস্ত হয়ে যাত্রার তোড়জোড় করতে লেগে গেল। কিন্তু তার মতো একজন সরল, ভালো মনের আর সহজে তুষ্ট মানুষের পক্ষে কি আর নিজের স্ত্রীকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব? আর কারও চোখে না পড়ুক, সে তার বুড়োর হাড়হদ্দ দেখতে পেল। অমন উৎসাহের সঙ্গে ঘোড়ার গা সাফ করা কেন? কড়া বুরুশ দিয়ে অত যত্ন করে ঘোড়ার লেজ আর কেশর আঁচড়ানো কেন? কেনই বা বেশ কয়েকবার জিন পরখ করে দেখা? কিন্তু তেপকেদেই এমন ভাব করল যেন কিছুই লক্ষ্য করে নি। কেবল ওরা দুজন যখন পথে বেরোবার জন্য তৈরী হয়েছে তখন সে তাঁবুর ভেতর থেকে জিনের নীচে পাতার কম্বল নিয়ে এলো আর বুড়োর দিকে চাবুকটা বাড়িয়ে দিল।

ঘোড়সওয়ার দুজন আক-তাশের তুষারাচ্ছন্ন চূড়ার দিকে চলে গেল। দূরে অনেকক্ষণ ধরে রোদে সাদা ঝকঝক করতে লাগল তাদের ভেড়ার চামড়ার খাটো ওভারকোট -- যেন মহাবীরের বর্ম। তেপকেদেই সেখান থেকে আর চোখ ফেরাতে পারে না। কেবল ঘোড়সওয়াররা যখন গিরিখাতের ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল তখন সে দৃষ্টি সরিয়ে আনল, দেখতে পেল টিলার ঢালে চরছে ভেড়ার পাল।

ভেড়াগুলো শান্তভাবে ঘাস খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে, আর তোতু লাঠিতে ভর দিয়ে তাঁবুর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে লাল রঙের মাথার রুমাল নাড়াচ্ছে। রুমালটা তার হাতে শিখার মতো মৃদু মৃদু কাঁপছে।

তেপকেদেই তাড়াতাড়ি মেয়ের দিকে পা চালাল। হাতকাটা জামার কলার তুলে, দুটো হাত পেছনে রেখে সে অল্পবয়সীর মতো তরতর করে পাহাড়ের ওপর উঠতে থাকল।

হঠাৎ তেপকেদেইয়ের বুক হিম হয়ে গেল। একটা কালো ষাঁড়ের পিঠে চেপে তোতুর কাছে এগিয়ে এলো রাখাল হাসিম। আচ্ছা, একেই তা হলে তোতু রুমাল নাড়াচ্ছিল! দেখা যাচ্ছে টিলায় ও মোটেই

মা'র জন্য অপেক্ষা করছিল না, করছিল এই হাসিমের জন্য। হাসিমের বয়স কম হয় নি, তার বিরাট পরিবার। তবে জীবনে কী-ই না ঘটতে পারে!

তেপকেদেই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল, হাতের তালু দিয়ে কপাল থেকে ঘাম মুছল। "তবে রে! আমার মেয়ের কাছে আসার রাস্তা আমি তোর বন্ধ করে ছাড়ব!"

'ও কি তোর যুগ্যি হল!' সে চিৎকার করে বলল, কিন্তু তার কণ্ঠস্বর টিলার চূড়া পর্যন্ত পৌঁছুল বলে মনে হয় না।

হাসিম ষাঁড়ের ঘাড়ে একটা রদ্দা মেরে পিছু ফিরল, তোতু পাশে পাশে চলতে লাগল।

* * *

পাহাড়ী গাঁয়ে সূর্যাস্ত চমৎকার।

পরিষ্কার দিনটিতে, যখন আকাশে ছিটেফোঁটা মেঘ নেই, তখন দাঁতাল পাহাড়ের সারির মাথায় ঝুলতে থাকে সূর্য -- দেখে মনে হয় যেন গনগনে সাদা আলোর এক বিশাল বাতি। তার আলো এমনই চোখ ধাঁধানো যে সূর্যাস্তের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকলে চোখ খোলা প্রায় অসম্ভব। আশেপাশের সবকিছু বদলাতে থাকে, রং গাঢ় হয়ে আসে, রীতিমতো উজ্জ্বল হতে থাকে, আর গিরিখাতের পড়ন্ত ছায়া হতে থাকে দীর্ঘ, ফিকে নীলের ছোঁয়া লাগা।

হে আমার জন্মভূমি কির্গিজিয়া! তুমি আমার আপন, চিরকালের ভালোবাসার পাত্রী। তুমি চিরযৌবনা, সূর্যকিরণে তাপিত, তোমার বাতাস পাহাড়ী হাওয়ায় স্নিগ্ধ। আমার দেহ, আত্মা, জ্ঞানবুদ্ধি সমস্ত নিয়ে আমি পুরোপুরি তোমারই। একমাত্র তোমারই আছে আমার ওপর একচ্ছত্র অধিকার!..

নুরমাত মজবুত করে জিনের ওপর বসে আছে, থেকে থেকে দৌড়বাজ ঘোড়াটাকে মৃদু চাবুক মারছে। গম্ভীর হয়ে সে কোন এক গভীর চিন্তায় মগ্ন।

অন্ধকার হয়ে এলো। আকাশে ছড়িয়ে পড়ল উজ্জ্বল তারাদল। দূরে আর নীচে দেখা গেল তাঁবুতে জ্বালানো অগ্নিকুণ্ড। গাঁ থেকে ভেসে আসছে পাহারাদার কুকুরদের তারস্বরে চিৎকার।

ঘোড়সওয়ার দুজন মাঝারি কদমে পাশাপাশি চলেছে। ঘোড়া ঘেমে উঠেছে, সন্ধ্যার ভিজে বাতাসে তাদের গা থেকে ভাপ বেরোচ্ছে। খুরের আঘাতে ঘাস খসখস করছে, পাথরে ঠকঠক আওয়াজ হচ্ছে।

ঘোড়সওয়াররা গ্রামের যত কাছাকাছি আসতে থাকে আলসেশিয়ান কুকুরগুলোর হাঁকডাক তত প্রবল হয়ে ওঠে। তাঁবুর কাছে তারা দল বেঁধে ঘোড়াগুলোর পায়ের নীচে ঝাঁপিয়ে পড়ল, কিন্তু প্রভুকে চিনতে পেরে অপরাধীর মতো লেজ নাড়তে লাগল।

তাঁবুতে ল্যাম্পের ঝাপসা আলো মিটমিট করছিল। তোতু ঘুমিয়ে ছিল। ভেড়ার পাল পাহারা দিচ্ছিল তেপকেদেই। বুড়ো তাঁবুর ভেতরে উঁকি মারল, স্ত্রীর কাছে ফিরে এলো, তার গম্ভীর মুখে হাসি খেলে গেল।

'তোমার মেজাজটা খুশি খুশি দেখছি,' তেপকেদেই মন্তব্য করল। 'মনে হচ্ছে এরগেশ তোমার মনের ভার হাল্‌কা করে দিয়েছে...'

'ঠিক, ঠিক গো গিন্নি, ঠিকই বলেছে,' মোলায়েম করে বুড়ো বলল। 'তাঁবুতে গিয়ে শুয়ে পড়, আমি নিজে ভেড়ার পালের কাছে থাকব।'

এরগেশ তাঁবুর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল, সে তাকিয়ে দেখল ঘুমন্ত মেয়েটিকে। তার কালো কুচকুচে ঢেউ-খেলানো চুল বালিশের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে, তার রোদে পোড়া মুখ আর ঘুমের ঘোরে শিশুর মতো ফোলানো ঠোঁট শান্ত ও সুন্দর দেখাচ্ছিল। শ্যামবর্ণের চিবুকের ওপর চোখের পাতার রোম থেকে এসে পড়েছে গাঢ় ছায়া।

এরগেশ ভাবছিল, কেন মেয়েটি তাকে স্বাগত জানানোর ব্যাপারে নিস্পৃহ, এমন কি তার সঙ্গে আলাপের জন্যও কোন গরজ দেখাল না। "ও রাখাল, আমি পশুপ্রযুক্তিবিদ। আমাদের যে একসঙ্গে কাজ করতে হবে..."

'গাঁয়ে আমাকে একটা স্থায়ী বাসের ব্যবস্থা করে নিতে হবে,' ঘুমন্ত মেয়েটার দিকে শেষবারের মতো দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, বুড়ো-বুড়ির দিকে এগিয়ে যেতে যেতে ও বলল। 'আমাকে থাকার জায়গা খুঁজে বার করার ব্যাপারে সাহায্য করুন।'

বুড়ো নুরমাত তার ঝুপসি ভুরুজোড়া কোঁচকাল।

'থাকার বন্দোবস্ত মানে? কার কাছে থাকতে যাবে? আমাদের এখানে কি তোমার খারাপ লাগছে?' সে জিজ্ঞেস করল।

এরগেশ লজ্জায় লাল হয়ে গেল। রাত বলে বাঁচোয়া, বুড়ো-বুড়ির তাই নজরে পড়ল না যে ওর গালের দুপাশের উঁচু হাড়ের ওপর গোলাপী রঙের ছোপ পড়েছে।

'আমি আপনাদের অসুবিধা করতে চাই না...'

বুড়ো মাটিতে বসে পড়ল, পা দুটো গুটিয়ে সে অন্যমনস্ক ভাবে পাতলা দাড়িতে হাত বুলাতে লাগল। তেপকেদেই পাশে বসল।

'তা তুমি কী রকম থাকার ব্যবস্থা করতে চাও?' বুড়ি জিজ্ঞেস করল। 'তোমার বাপ-মা'কে এখানে আনতে চাও?'

'মা-বাবা কাজ করেন শহরে। যৌথখামারে চলে আসার ব্যাপারে আমি ওঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলি নি,' এরগেশ উত্তর দিল।

'তোমার বৌ আছে?'

এরগেশ আরও বেশি লজ্জা পেল।

'না... আমার ভাবী বৌ আছে... সে অপেক্ষা করছে... মানে, আমি মনে করি ও মন ঠিক করে চলে আসবে,' আনাড়ির মতো একটু চুপ করে থেকে সে বলল।

'যাও দেখি, গিন্নি, ঘুমানো দরকার,' বুড়ো নুরমাত বলল। 'অতিথিকে শান্তিতে থাকতে দেওয়া দরকার এখন...'

হিমবাহ থেকে ভেসে আসা তাজা বাতাস, নক্ষত্রখচিত আকাশের নীরবতা, ক্বচিৎ রাখালদের ফাঁকা গুলির আওয়াজ ও চিৎকারে সেই নীরবতায় ভাঙ্গন, ঝিমন্ত ভেড়ার দঙ্গল—এখানকার সবই এরগেশের ভালো লাগছিল। সবই পূর্ণ ছিল এক অজানা, নতুন ও উত্তেজনাকর

অনুভূতিতে। সে অবিরাম শুনতে রাজী ছিল পাহাড়ী গাঁয়ে পশুপালকদের জীবন ও মেহনত সম্পর্কে বুড়ো নুরমাতের বিবরণ— রীতিমতো অসাধারণ অ্যাডভেঞ্চার ও ঘটনায় পরিপূর্ণ বিবরণ।

পাহারাদার কুকুরগুলো থেকে থেকে গায়ের লোম খাড়া করে ভিজে নাক দিয়ে বাতাস টানছিল। সময় সময় তারা সঙ্গে সঙ্গে পায়ের থাবার ওপর মাথা রাখছিল, সময় সময় রাগে গরগর করছিল—তখন আবার ভীতু ভেড়াগুলো খোঁয়াড়ে নড়েচড়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল।

এই রকম মুহূর্তে নুরমাত ও এরগেশ তাদের দেহের উত্তাপে তপ্ত জায়গা ছেড়ে উঠে পড়ে এবং তুমুল চিৎকারে চারপাশে সাড়া জাগিয়ে ভেড়ার পাল ঘুরে ঘুরে দেখে।

মৃদু ভোরের আলো দেখা দিল। সকালের স্যাঁতসেঁতে হাওয়া গায়ে লাগতে এরগেশ তার বর্ষাতির সবগুলো বোতাম আঁটল। বুড়োর কিন্তু ঠাণ্ডাতে কিছু আসে-যায় বলে মনে হল না। সে চাপকানটা মাথার নীচে রেখে মাটির ওপর নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে।

ভোরবেলায় ভেড়াগুলো একটার পর একটা ঘাস খাওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়ল। খুরের খটখট আওয়াজ তুলে তারা খোঁয়াড় ছেড়ে ক্রমেই দূরে চলে যেতে লাগল। এরগেশ ঘুমন্ত বুড়োর দিকে তাকাল, তার পর পা টিপে টিপে ভেড়ার পালের অনুসরণ করল। টিলার ওপরে তার কানে এসে পেঁছুল নুরমাতের উৎফুল্ল কণ্ঠস্বর:

'ভেড়ার পাল পেছনে ফেরাও বলছি ছাই!'

এরগেশ এমন ভাব করল যেন ডাক শুনতে পায় নি। সে আগের মতোই এগিয়ে চলল। বুড়ো কঁকিয়ে উঠে দাঁড়াল, মন্থর গতিতে এরগেশের পিছু নিল।

'ভেড়াগুলো যদি দিনের বেলায় পেট পুরে খেতে পেত তা হলে সকাল অবধি জায়গা ছেড়ে যেত না,' এরগেশ বলল। 'তার মানে, ওদের খিদে পেয়েছে।'

'ওদের ছাই এ রকম কখনই হয় নি।'

'আপনার মেয়ের এখনও অভিজ্ঞতা হয় নি, গতকাল ভেড়াগুলোকে

ভালোমতো চরায় নি। খালি পেটে কখনও কারও ঘুম আসে না। সাধে কি আর বলে যে-লোক সবে বাপকে কবর দিয়ে এসেছে তার ঘুম এলেও আসতে পারে, কিন্তু খালি পেটে ঘুম আসার কোন উপায় নেই...'

বুড়ো মাথা নেড়ে সায় দিল, দাড়িতে হাত বুলাল। "তুমি হলে গিয়ে কর্তা, তুমিই হুকুম দাও যাতে আমি আর তেপকেদেই ভেড়ার পাল চরাতে পারি।"

* * *

সূর্যের প্রথম কিরণ দেখা দিতে না দিতে এরগেশ ভেড়ার পাল তাঁবুর দিকে ফিরিয়ে নিয়ে এলো।

দূর থেকেই সে দেখতে পেল তোতু উঠে তার দিকে এগিয়ে আসছে।

"প্রথম মেয়ে-রাখাল, প্রথম বসন্তের পাখি," এরগেশ স্নেহভরে মনে মনে ওর সম্পর্কে ভাবল। "তোমার ডানা এখনও শক্তসমর্থ হয়ে ওঠে নি, ওড়ার অভিজ্ঞতাও তোমার এখনও নেই, তা হোক, তুমি তবু সাহস করে পথে নেমেছ..."

'আমাকে এড়িয়ে চলেন কেন?' মেয়েটা ওপরে উঠে তার কাছে আসতে সে জিজ্ঞেস করল।

তোতু ভ্রূকুটি করে তার দিকে তাকাল। চোখে বিদ্রূপ খেলে গেল।

'বলি আপনি কি এখানে ভেড়া চরাতে এসেছেন?' এবারে সে পাল্টা প্রশ্ন করল। 'আজকাল কি পশুপ্রযুক্তিবিদদের আর কোন কাজ নেই?'

ওর কথায় এরগেশ অপমান বোধ করল না। সে অমায়িক হাসি হাসল, কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল:

'এর মধ্যে অসম্মানের কিছু ত দেখি না, যদিও আরও গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্ম আমার আছে...'

'তবে আমার মতে, আপনি যে হেতু পশুপ্রযুক্তিবিদ, সেই হেতু আমার রাখালির লাঠি ধরা আপনার পক্ষে ঠিক নয়!' ভুরু কুঁচকে তোতু বলল। 'আচ্ছা আসি...'

সে অহঙ্কৃত ভঙ্গিতে থুতনিটা ওপরের দিকে তুলল, ভেড়ার পাল ঘুরিয়ে নিয়ে চলল। এরগেশ তাঁবুতে ফিরে এলো। বুড়ো-বুড়ি ঘরের কাজকর্মে ব্যস্ত ছিল, তারা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছিল।

'তুমি শুনলে ওর সঙ্গে কী রকম ব্যবহারটা করল?' তেপকেদেই বলল। 'নুরমাত, তুমি অন্তত একবার যদি মেয়েটার সঙ্গে কথা বলতে। অমন করা কি উচিত? তুমি তার বাপ ত বটে, না কি?'

নুরমাত কোন কথা না বলে যে কুড়ুলটা দিয়ে ঘরের চুল্লীর জন্য শুকনো ডালপালা কাটছিল তা একপাশে ছুঁড়ে ফেলে দিল, হেলে-দুলে পশুপ্রযুক্তিবিদের দিকে এগিয়ে গেল।

'আমাদের মেয়ের ওপর রাগ করো না, ওর চোপা হল ওর শত্তুর...' সে বলল।

'মোটেই রাগ করি নি!' এরগেশ উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠল। 'পাহাড়ী গাঁয়ের প্রথম বসন্তের পাখির ওপর কি রাগ করা যায়? আমার পক্ষে যেমন সহজ নয়, তেমনি ওরও!'

'তুমি আমাদের মেয়েকে বসন্তের পাখি নাম দিয়েছ, কিন্তু বসন্তের পাখি কার্লিগাচের কথা শুনেছ কি? রূপকথায় বলে যে কোন এক কালে কার্লিগাচ নামে এক মহাযোদ্ধা মেয়ে ছিল। সে ছিল সাহসী, বীর। একদিন যুদ্ধে এক মহাবীরের মুখোমুখি হতে কার্লিগাচ তাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে ঘোড়া থেকে টেনে নামায়! কিন্তু তার মনটা ছিল উদার, সে মহাবীরকে আবার ঘোড়ার ওপর বসিয়ে দেয়। আমাদের মেয়ে যদি কার্লিগাচ হয় তা হলে তোমাকে ত মহাবীর বলতে হয়, কী বল? ও কথার প্যাঁচে তোমাকে জিন থেকে টেনে নামাল...' বলেই বুড়ো চালাকির ভঙ্গিতে এরগেশকে চোখ টিপল, হো-হো করে হেসে উঠল।

টিলার চূড়া থেকে শুরু করে পাদদেশ পর্যন্ত ছায়াপ্রধান গোটা ঢাল জুড়ে যেখানে যেখানে উঁচু উঁচু রসাল ঘাসের ঝোপ গজিয়ে উঠেছে সে সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে ভেড়ার পাল।

তোতু চূড়ার ওপর দাঁড়িয়ে ছিল, লাঠির ওপর ভর দিয়ে সে স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো দূরের দিকে তাকাচ্ছিল। উঁচু পাহাড়ের ওপরকার চারণভূমি যেন উঠতে উঠতে একেবারে আকাশের নীচে এসে ঠেকেছে। এই মাটির বুকে যেমন, তেমনি তার গায়েও নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে মেঘের সাদা সাদা ফুঁয়োফুঁয়ো ভেড়ার পাল।

পাহাড়পর্বতের মাঝখানে মেয়েটির নিজেকে মনে হচ্ছিল এক ডানা মেলা পাখি। সে সুখ অনুভব করছিল এই ভেবে যে সে পৃথিবীতে বাস করছে, সে একা এই টিলার ওপর, আর তার গোটা জীবন এখনও সামনে পড়ে রয়েছে।

"তুমি সুখী, তোমার জীবনের লক্ষ্য আছে... তুমি সুখী..." সুগন্ধবহ পাহাড়ী বাতাস যেন তার কানে ফিসফিস করে বলল। বলল, "তুমি অমনিতেই সুখী, কেন না তোমার বয়স কম, তুমি চলেছ নিজের পথে।"

এমনও ত হতে পারে বাতাসে মাথা দোলাতে দোলাতে ফুলের দল ফিসফিসিয়ে এই কথাগুলো বলল? মেয়েটি কান পাতল। কিন্তু না বাতাস, না আকাশে দীপ্তিমান সূর্য, না গম্ভীর শৈলমালা, না বিভিন্ন বর্ণের আভায় ঝলমলে ধরণী, না জলস্রোতের কলকলধ্বনি, না উঁচু উঁচু ঘাস—কোনটাই তাকে ব্যাখ্যা করে বলতে পারল না কোথা থেকে জন্ম নিল সুখের এই আশ্চর্য অনুভূতি।

'ঘুমে ঢুলু ঢুলু পাহাড়পর্বত, উপত্যকা, ফুল আর তার ওপর চঞ্চল পাখনায় উড়ু উড়ু প্রজাপতিরা, গলাবাজ পাখিরা, হৃষ্টপুষ্ট অলস মেঠো ইঁদুর, আকাশে ডানা মেলা চিল—তোমাদের সকলকে সাক্ষী মেনে বলছি আমি সুখী!' ওড়ার ভঙ্গিতে দুহাত ছড়িয়ে তোতু চেঁচিয়ে বলল।

দুপুরের অসহ্য গরমে ভেড়াগুলো এ-ওর গায়ে গায়ে লেগে দঙ্গল বেঁধে রইল। তোতু নরম ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ল, গান ধরল। তার সুরেলা কণ্ঠস্বর পাহাড়ী গাঁয়ের ওপর অনেক দূরে ভেসে চলল।

* * *

এই কয়েক দিন ধরে সকাল থেকে গভীর রাত অবধি এরগেশ চারণভূমিগুলো ঘুরে ঘুরে বেড়াল।

সন্ধ্যার দিকে পাহাড় থেকে নামার সময় টিলার চূড়া থেকে গানের সুর ভেসে আসতে শুনে সে তার কটা দৌড়বাজের গতি সংযত করল। মাথায় লাল রুমাল দেখে এরগেশ তোতুকে চিনতে পারল।

ঘাস মাড়িয়ে যাওয়ার ফলে সদ্য যে পথটা তৈরী হয়েছে, সে অনেকক্ষণ মনোযোগ দিয়ে তা নিরীক্ষণ করতে করতে অসম্মতিসূচক মাথা নাড়ল। তারপর তোতুর কাছে উঠে গেল।

'এ রকম করলে ত চলবে না,' সে বলল। 'ভেড়াগুলো কয়েক দিনে যে খাবার খেতে পারত তার চেয়ে বেশি নষ্ট করেছে।'

এরগেশ মেয়েটির কাছ থেকে পাল্টা খোঁচার প্রত্যাশা করেছিল এবং তার জন্য কঠোর ভ্রূভঙ্গি করে আগে থাকতেই প্রস্তুত হয়ে ছিল। কিন্তু তোতু হঠাৎই সরল চোখজোড়া বড় বড় করে তার দিকে চোখ মেলে তাকাল, কাঁধ ঝাঁকিয়ে জিজ্ঞেস করল:

'পাহাড়ী গাঁয়ে চরার জায়গার কি এতই অভাব যে প্রত্যেকটা ঘাসের জন্যে আক্ষেপ করতে হবে?'

এরগেশ ঘোড়া থেকে নামল, মুখের লাগাম ধরে ঘোড়াটাকে টানতে টানতে সে তোতুর দিকে এগিয়ে গেল।

'যে সব ঢালে ছায়া আছে সেখানে রোদ-পড়া ঢালের চেয়ে ঘাস অনেক বেশি দিন থাকে, তাই সে ঘাস বাঁচিয়ে রাখতে হয়,' সে বলল। 'তোতু, তোমার পক্ষে ভালো হয় যদি তুমি হাসিমের ভেড়ার পালের সঙ্গে ভেড়া চরাও। সে অভিজ্ঞ রাখাল, যৌথখামারে ওর ভেড়া

সবচেয়ে ভালো, যদিও সে মাসের পর মাস একই জায়গায় ভেড়া চরায়।'

তোতু লাঠির ডগায় চোখ নামিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লাঠি দিয়ে পাথর ঠুকতে লাগল।

'আমি সব সময়ই ওর সঙ্গে পরামর্শ করি,' সে শান্তস্বরে বলল।

'ওর কাছ থেকে শেখার মতো কিছু আছে,' এরগেশ মৃদু হাসল।

তোতু আড়চোখে পশুপ্রযুক্তিবিদের দিকে তাকাল এবং আগের মতোই বিনীত স্বরে অনুরোধ করল:

'রোদ-পড়া ঢালটার দিকে পাল খেদিয়ে নিয়ে যেতে আমাকে সাহায্য কর...'

ওরা যখন পালের চারপাশ ঘুরে গিয়ে শুকিয়ে যাওয়া নদীর পাথুরে খাতে নামল তখন কটা দৌড়বাজের ওপর তোতুর চোখ আটকে গেল, ধূর্তের মতো কেবল চোখজোড়া নাচিয়ে সে হেসে বলল:

'ঘোড়সওয়ারের জিনের ওপর থাকাই ভালো. নইলে ঘোড়া আবার ছুটে পালিয়ে যেতে পারে...'

কিছুদিন আগে উপত্যকায় যে ঘটনা ঘটেছিল তা মনে পড়ে যেতে এরগেশ ঘোড়ার মুখের লাগাম জোর করে মুঠিতে চেপে ধরল।

'পালিয়ে যাবে না, আমাদের ভাব হয়ে গেছে।'

'দেখবেন, বলা যায় না,' তোতু বলল।

* * *

অন্যান্য দিনের মতো আজও এরগেশ বুড়ো-বুড়িকে গেরস্থালি নিয়ে ব্যস্ত দেখতে পেল।

নুরমাত একটা গোল পাথর নিয়ে সৈন্ধব লবণের টুকরো ভাঙছিল, আর তেপকেদেই কাঠের গামলায় কী যেন মাখছিল।

পশুপ্রযুক্তিবিদকে তাঁবুর দিকে আসতে দেখে লাগাম ধরে ঘোড়াটাকে খুঁটির সঙ্গে বাঁধার উদ্দেশ্যে বুড়ো উঠে সে দিকে এগিয়ে

গেল। কিন্তু এরগেশ তাঁবু থেকে তফাতে থাকতেই লাফিয়ে মাটিতে নামল, নিজেই ঘোড়াকে খুঁটির কাছে টেনে নিয়ে গেল।

'ফ্রুঞ্জে থেকে আজ দুটো চিঠি পেয়েছি,' ও বলল। 'মা-বাবার কাছ থেকে আর আমি যাকে ভালোবাসি, সেই মেয়েটির কাছ থেকে... মা-বাবা আপনাদের বার বার করে সালাম জানিয়েছেন...'

বুড়ো নুরমাত জিভ দিয়ে টুসকি মারল, নুনের গুঁড়োয় সাদা ঠোঁটজোড়া হাসিতে টেনে সে মাথা নাড়ল:

'ওঁদের মঙ্গল হোক, সালামের জন্যে ধন্যবাদ। ওঁদের কাছে চিঠি লেখার সময় আমাদের সালামও জানাতে ভুলো না। বেশ ভালো করে আমাদের পাহাড়ী গাঁয়ের কথা লিখবে, ওঁরা আমাদের এখানে বেড়াতে আসুন। তা তোমার হবু বৌ কী লিখছে?'

এরগেশ বিষণ্ন হয়ে পড়ল, তার চোখের দীপ্তি ম্লান হয়ে গেল।

'এই আর কি... ভালো কিছুই নয়,' চাবুকটা হাতে ঘোরাতে ঘোরাতে ও বলল। 'ওর ধারণা, আমি এমন এক অজ জায়গায় থাকি যেখানে কথা বলার লোক অবধি নেই! ও কিছুই বোঝে না।'

'তুমি ওকে এখানে, গাঁয়ে নিয়েই এসো না ছাই, আমরা ওকে দেখাব কেমন অজ জায়গা!' বুড়ো বলল। 'আমি তোমাদের জন্যে টিলার ওপরে তাঁবু খাটিয়ে দেব, তোমরা সেখানে থাকবে। পরে আর ওকে এখান থেকে গায়ের জোরেও তাড়ানো যাবে না।'

এরগেশ কোন উত্তর না দিয়ে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে নুরমাতের চোখের দিকে তাকাল। কটা দৌড়বাজটা অস্থিরভাবে খুঁটির কাছে মাটি খুঁড়ছিল। এরগেশ ধীরে ধীরে তার দিকে এগিয়ে গেল। ঘোড়ার পিঠ থেকে জিন খুলে নিয়ে সে তাব দুপা একসঙ্গে বেঁধে দিয়ে ঘাসের ওপর ছেড়ে দিল আর নিজে চলে গেল পাহাড়ে, নিজের প্রিয় শিলাখণ্ডের উদ্দেশে।

"আমরা কি তা হলে সত্যি সত্যিই একে অন্যকে বুঝতে পারব না? চিরকালের জন্যে আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে?" রোদে তেতে

ওঠা পাথরের ওপর বসতে বসতে সে ভাবল। "বুড়ো ঠিকই বলেছে: এখানে যদি অন্তত এক দিনের জন্যেও আসতে, তাহলে পাহাড়ী গাঁ সম্পর্কে এমন কথা বলতে পারতে না। কোথায় গেল তোমার ভালোবাসা? এখানে পাহাড়। এখানে উজ্জ্বল সূর্যকে বর্ষার মেঘ ঢেকে দিতে পারে। শীতকালে এখানে কনকনে হিম আর রাতে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে নেকড়ের ডাক। কিন্তু পাহাড়ে থাকে সাহসী লোকজন, আর আমি তাদেরই সঙ্গে খাটি।"

ভাবনা এরগেশকে নিয়ে গেল দূরের শহরে। পুরনো পপলার গাছের ছায়াঘন বীথিকায় সে দেখতে পেল তার প্রেয়সীকে। তার গায়ে ছিল হালকা পোশাক, পোশাকের ওপরে প্রজাপতির মতো ফুল করা বিরাট ফিতে। তার রোদে-পোড়া কাঁধের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে ঢেউ খেলানো চুলের রাশি। সে স্যাণ্ডেলের হিলে খটখট আওয়াজ তুলে অ্যাসফল্ট বাঁধানো রাস্তা ধরে দ্রুত পায়ে চলেছে ইনস্টিটিউটের দিকে। তার এক হাতে ছাতা, অন্য হাতে—এক গাদা বইখাতা। ওঃ, এরগেশের কী ইচ্ছেই না হচ্ছিল এখন তার পথের সামনে এসে দাঁড়ানোর, তার চোখের দিকে তাকিয়ে দেখার, তার কণ্ঠস্বর শোনার।

এরগেশ আরক্তিম মুখটাকে করতলে ঢাকল, কিন্তু মেয়েটার চেহারা ত মিলিয়ে গেলই না বরং তা আরও উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিল। কী হল তোমার এরগেশ? তোমার হৃদয়টাকে মুক্ত কর—তাহলে হয়ত স্বস্তি পাবে! তোমার লজ্জা পাওয়ার মতো কেউ নেই, পাহাড়ে তুমি একা, কেউ তোমার মনোবেদনা দেখতে আসছে না, কেউ না।

এরগেশের চিন্তাসূত্র ছিন্ন করল ভারুই পাখির অস্থির, কাতর শিস। এরগেশ মাথা তুলল। ছোট্ট ছাইরঙা পাখিটা নরম ঘাসের ওপর এসে পড়ল, আটি আঁকড়ে ধরল, তার ঠোঁটজোড়া হাঁ হয়ে গেছে, গায়ের পালকরাশি ফুলে উঠেছে। তার ওপর ঢিলের মতো এসে পড়ছিল এক হিংস্র পাখি।

ভারুই পাখিটা ঝট করে এরগেশের দুপায়ের ফাঁকে এসে আশ্রয় নিল, শিকারী পাখি এবারে প্রচণ্ড শব্দে ডানা ঝাপটে মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এরগেশ পাথরের ওপর থেকে তার বর্ষাতি তুলে নিয়ে নিজের মুখ ঢেকে ফেলতে না ফেলতে সে এরগেশের বুকের ওপর আছড়ে পড়ল, নখ দিয়ে তার কোটের কলারের ভাঁজ ছিঁড়ে ফেলল। এরগেশ ঝটকা মেরে বর্ষাতি নিজের বুকের ওপর চেপে ধরল— হিংস্র পাখিটা ফাঁদে পড়ল।

ছাইরঙা ছোট্ট ভারুই পাখি ঘাস থেকে উঠে ফুড়ুৎ করে আকাশে উড়ে গেল।

'বর্ষাতির মোড়কটা খোল দেখি,' এরগেশ বাড়ি আসতে বুড়ো বলল। 'দেখি ছাই, কোন্ শত্তুর তোমার হাতে এসে পড়েছে! তোমার নতুন পোশাক ত বেশ ছিঁড়ে ফেলেছে।'

বুড়ো পাখির ডানা দুটো চেপে ধরে তাকে শূন্যে মাথার ওপর ওঠাল। শিকারী পাখিটা চোখজোড়া ড্যাবড্যাব করে নখগুলো আলগা করল, বাঁকানো ঠোঁট সামান্য খুলল।

'এটা ছাই মামুলি বাজপাখি,' বুড়ো হতাশ হয়ে বলল। 'শিকারী পাখিদের মধ্যে এ পাখি সবচেয়ে চতুর আর চটপটে বটে, কিন্তু শিকারের জন্যে ওকে পোষ মানানো যায় না। ওর যেখানে প্রাণ চায় উড়ে যাক গে!'

এই বলে বুড়ো পাখির ঠোঁটের ওপর থুতু ফেলে তাকে শূন্যে ছুঁড়ে দিল।

বাজপাখি ঝট করে অনেক ওপরে উঠে গেল। এরগেশ তাকিয়ে দেখল বাজপাখি তেরছাভাবে উড়ে চলছে, তার মনে পড়ে গেল লোকগীতির সেই কথাগুলো:

বাজপাখি সে শিকার ধরা পাখি!
পড়ল ধরা, সাধ্যি কোথায় পোষ মানিয়ে রাখি?
সুজন নাহি পাশে, কারে মনের কথা বলি?..

সকালবেলা এরগেশ অনেক সময় নিয়ে সযত্নে তার কটা দৌড়বাজের পরিচর্যা করত। শেষের দিকে সে যখন পরিদর্শনের জন্য পাহাড়ী গাঁয়ে আসত, সেই রকম এক সময় পশুখাদ্য মজুতের ব্যাপারে ভালো উদ্যোগের জন্য পুরস্কার হিশেবে সভাপতিমশাই তার ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য ঘোড়াটা ওকে দেন।

ঘোড়ার পায়ে যে কাদা লেগে ছিল এরগেশ চাঁচুনি দিয়ে তা চেঁছে চেঁছে পরিষ্কার করল, তারপর কড়া বুরুশ দিয়ে ঘামে চটচটে, এলোমেলো লোম থেকে ধুলো ঝাড়তে লাগল। ঘোড়া ঠায় এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল, কেবল মাঝে মাঝে সতর্ক হয়ে ঠিকরে পড়া বেগনী রঙের চোখ টেরিয়ে প্রভুর দিকে তাকায়। উদীয়মান সূর্যের প্রথম কিরণে তার ভরাট তলপেট চকচক করতে থাকে, চিরুনীতে আঁচড়ানো কেশর আর লেজ মৃদু শিস তুলে বাতাসে কাঁপতে থাকে।

পশুপ্রযুক্তিবিদকে পথে এগিয়ে দেওয়ার জন্য তাঁবু থেকে রোজ সকালে একই সময় বেরিয়ে আসে বুড়ো নুরমাত। ঘুম জড়ানো চোখে উসকোখুসকো চেহারা নিয়ে বিরস বদনে বুড়ো ঘোড়া বাঁধার খুঁটি থেকে সামান্য দূরে আলগোছে বসে থাকে আর নীরবে দেখতে থাকে এরগেশের ঘোড়া সাফ করা। যুবক যেই মুহূর্তে ঘোড়ার পিঠে কম্বল ফেলে জিনের দিকে হাত বাড়ায়, অমনি বুড়ো চঞ্চল হয়ে ওঠে, আশা নিয়ে জিজ্ঞেস করে,

'নতুন কোন খবর আছে কি ছাই, এরগেশ?'

এরগেশ হতাশভাবে মাথা নেড়ে বলে:

'আপাতত নেই।'

এই সংক্ষিপ্ত কথাবার্তা কেবল ওদের দুজনের কাছেই বোধগম্য ছিল। ব্যাপারটা হল এই যে আজ বেশ কয়েকদিন হল নুরমাত ও এরগেশ দুজনে তাঁবুতে বাস করছে। একদিন রাতারাতি ঝরণার ওপারে ছোটখাটো একটা কুঁড়েঘর গড়ে উঠল, তোতু নিজের যাবতীয় জিনিসপত্র নিয়ে ওখানে উঠে গেল। দেখতে দেখতে তেপকেদেইও মেয়ের কাছে উঠে এলো। তাঁবু খালি হয়ে গেল। বুড়া নুরমাত

অমনিতেই মেয়ের সঙ্গে মন কষাকষির জন্য বড় দুঃখে ছিল, এখন সে শোকে একেবারেই মুহ্যমান। ঘন ঘন মাথা নাড়িয়ে আর অভ্যাসমতো দাড়ি খুঁটতে খুঁটতে সে একবার অনুযোগের সুরে এরগেশকে বলল:

'আমাদের সংসারে পুরো মতের মিল ছিল··· অথচ সবই ওলটপালট হয়ে গেল!'

সন্ধের দিকে হাসিমের ভেড়ার পাল থেকে ফেরার পথে এরগেশ টিলার ওপরে তোতুর কাছে উঠে এলো, ঘোড়া থেকে নেমে, ঘোড়ার মুখের লাগাম ধরে বলল:

'আমার ঘোড়াটায় চড়ে বস, দুই টিলার মাঝখানে ঐ যে ঢালু জায়গাটা দেখতে পাচ্ছ ওটা পেরিয়ে চলে যাও। ওখানে হাসিমের ভেড়ার পাল চরছে, দেখে এসো।'

'কিছু বিপদ-আপদ হয়েছে না কি? ভেড়াগুলোর ওপর রাতে নেকড়ের হামলা হয়েছে না কি?' বিদ্রূপের ভঙ্গিতে চোখ কুঁচকে তোতু জিজ্ঞেস করল।

মেয়েটার বেয়াড়াপনা এরগেশের খারাপই লাগল, কিন্তু সে ঠিকই করে রেখেছিল যে বিবাদের মধ্যে যাবে না, তাই সে নিজেকে সামলে নিল, কোন কটু কথা বলল না।

'আমি পশুপ্রযুক্তিবিদ হিশেবে তোমাকে অনুরোধ করছি,' সে বলল। 'আমার মনে হয় ওখানে তোমার দেখার মতো অনেক জিনিস আছে, অন্য রাখালদের অভিজ্ঞতা হেলাফেলা করা ঠিক নয়। ভেড়াগুলোকে আপাতত আমি দেখছি।'

তার সহজ সরল কথায় মেয়েটি হঠাৎ থতমত খেয়ে গেল। তোতু তার আদেশ মেনে নিয়ে ঘোড়ার দিকে এগিয়ে গেল, ঘোড়ার কাঁধ আঁকড়ে ধরে অশ্বচর্মের লাল হাই বুটের ডগা রেকাবের ভেতর গলিয়ে দিয়ে কৌশলে, যেন হাওয়ায় ভেসে জিনের ওপর লাফিয়ে উঠল।

দৌড়বাজ ঘোড়ার পিঠের ওপর বসে লাগাম ঠিক করে নিতে নিতে তোতু সরাসরি এরগেশের চোখে চোখ রাখল। 'আর কোন হুকুম হবে

কি? আর কী দিয়ে আমি তোমাকে খুশি করতে পারি?' তার খোলাখুলি দৃষ্টি যেন এই কথাই বলছিল।

এরগেশ কিছুই বলল না। মেয়েটি তখন ঝটকা মেরে দৌড়বাজ ঘোড়াটাকে ঘুরিয়ে দিল, সরু পায়ে-চলা-পথ ধরে মাঝারি কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে টিলা থেকে চলল।

এরগেশ তখনও ভেড়ার পালকে ঘুরে ঘুরে দেখে উঠতে পারে নি, ইতিমধ্যে মেয়েটিকে আবার ফিরে আসতে দেখা গেল। মাথার পেছনে কষে গিঁট বাঁধা, আগুনের মতো লাল টকটকে রুমালের প্রান্ত বাতাসে উড়ছিল। দৌড়বাজ ঘোড়ার ওপর সে যে ভাবে দৃপ্ত ভঙ্গিতে মাথা পেছনে হেলিয়ে বসে ছিল, যেভাবে ঘোড়ার জোর কদমের তালে তালে এপাশে ওপাশে দুলছিল তাতে বোঝা যাচ্ছিল যেন পশুপ্রযুক্তিবিদকে দেখানোর ইচ্ছে কীভাবে ঘোড়ার পিঠে চেপে পাহাড়ে চলতে হয়, যেন বড়াই করতে চায় নিজের সাহস আর ঝানু ঘোড়সওয়ারের মতো বসার ভঙ্গি নিয়ে।

এরগেশের কাছে এসে ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে এবং মিশকালো পুরুষ্টু দীর্ঘ বিনুনি পিঠের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে মেয়েটি সোৎসাহে চেঁচিয়ে বলল·

'গিয়েছিলাম, দেখে এলাম, আর কী হুকুম হয়?'

এরগেশ তোতুর হাত থেকে লাগাম নিয়ে তাকে মাটিতে নামতে সাহায্য করল, সরাসরি তার চোখের দিকে তাকিয়ে জবাব দিল:

'আমার কিন্তু তোমাকে অনেক কথা বলার ছিল... ধর না কেন, অন্তত পক্ষে এই ব্যাপারটি যে হাসিম কেমন ওর বৌয়ের সঙ্গে মিলে ভেড়া চরায়। ওর বৌ ওকে সাহায্য করে, আর কাজও ওর নিজের চেয়ে খারাপ জানে না। আর তুমি কিনা নিজের বাপেরও পরামর্শ নিতে চাও না, তাকে পালের কাছে ভিড়তেই দাও না।'

'আপনাদের পরামর্শের ঠেলায় আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত,' তোতু অসহিষ্ণু হয়ে কাঁধ ঝাঁকাল, চট করে মুখ ফিরিয়ে নিল। 'আপনারা সকলে আমার কাছ থেকে কী চান বলুন ত?'

গোটা ঢাল জুড়ে ভেড়াগুলো ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছিল। মাটি থেকে লাঠিটা তুলে নিয়ে মেয়েটি তা নাড়াল এবং তাড়াতাড়ি ভেড়াগুলোর দিকে পা চালাল। কিন্তু হঠাৎই আবার ঘুরে দাঁড়াল।

'আপনি কি আমার আর আমার বাবার মাঝখানে মধ্যস্থ হবেন বলে ঠিক করেছেন?' সে জিজ্ঞেস করল। 'মিছিমিছি শক্তিক্ষয় করছেন। বাবা যথেষ্ট কাজ করেছেন, এবারে বিশ্রাম করুন। যতক্ষণ পর্যন্ত না রাখালের কাজ সম্পূর্ণ আয়ত্তে আনতে পারছি, ততক্ষণ নিজের লাঠি ছাড়ব না!' সে শেষকালে গোঁ ধরে বলল।

'কিন্তু অমন করা কি ঠিক? অন্যের অভিজ্ঞতা থেকে ত শিক্ষা নিতে হয়,' এরগেশ আর কোন জবাব খুঁজে পেল না।

'এটা সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার। হাসিমের ভেড়ার পালে আর অন্যান্য ভেড়ার পালে কী হচ্ছে না হচ্ছে আমি আপনাদের চেয়ে কম জানি না।'

এরগেশ অপমানিত হয়ে চুপ করে গেল। সে তার দৌড়বাজ ঘোড়ায় উঠে বসে টিলা ছেড়ে চলে গেল। সে দেখল বুড়ো তাঁবুর কাছে দাঁড়িয়ে ওদের লক্ষ্য করছিল। এখন অবশ্যই অধীর আগ্রহে ওর জন্য অপেক্ষা করছে, জানতে চায় ওদের মধ্যে কী কথাবার্তা হল। এরগেশ ঠিক করল দূরের চারণভূমিগুলো দেখতে যাবে, তাই সে ঘোড়ার মুখ ঘোরাল।

যৌথখামারে একমাত্র একটি গাঁয়ে -- যেখানে এরগেশের ভাগে পশুপ্রযুক্তিবিদের কাজ জুটেছে — একমাত্র সেখানেই চরত চল্লিশটি অবধি ভেড়ার পাল, কয়েক দল মাদী ঘোড়া আর গোরুর পাল।

কাজের আর কূলকিনারা ছিল না। তবু এক সপ্তাহেরও বেশি কাল বুড়ো নুরমাতের তাঁবু থেকে দূরে দূরে কাটিয়ে, এক চারণভূমি থেকে অন্য চারণভূমিতে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েও তোতুর চিন্তা সে

ছাড়তে পারল না। দেমাকি বসন্তের পাখির চিন্তা তার মাথা থেকে গেল না।

এরগেশ লোকপরম্পরায় শুনতে পেল যে নুরমাত তার তাঁবু উঠিয়ে নতুন জায়গায়, দূরে পাহাড়ের চারণভূমির কাছাকাছি কোন এক জায়গায় চলে এসেছে, সে না কি এখন আবার ভেড়া চরাচ্ছে, আর সে যে একাধিকবার যাতায়াতকারী লোকজনের কাছে পশুপ্রযুক্তিবিদের খোঁজখবরও নিয়েছে এতে এরগেশ খুশি হল। পালিয়ে যাওয়ার জন্য ওর লজ্জা হল, ঠিক করল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বুড়োর সঙ্গে দেখা করবে।

কেবল দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষেই এটা তার পক্ষে সম্ভব হল।

দুরু দুরু বুকে এরগেশ তার পরিচিত সাদা তাঁবুর দিকে এগোতে লাগল। কিন্তু দূর থেকেই ভেড়ার পালের কাছে তোতুর মাথার লাল টকটকে রুমাল দেখতে পেয়ে সে দুঃখের সঙ্গে বুঝতে পারল যে গুজবের পেছনে কোন সত্যি নেই।

এরগেশ হাসিমের ভেড়ার পালের দিকে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে দিল। হাসিমের তাঁবুর কাছে যখন সে এসে পেঁছুল ততক্ষণে অন্ধকার নেমেছে। পাহাড়ের শ্রেণীর ওপর উজ্জ্বল চাঁদ উঠে অনড় হয়ে আছে। হাসিমের স্ত্রী বলল যে স্বামী খাতে ভেড়া চরাচ্ছে, এরগেশও তাই ঢাল ধরে নামতে লাগল।

মামুলি সম্ভাষণ ও কুশল প্রশ্নাদি বিনিময়ের পর এরগেশ দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাসিমকে বলল:

'তোতুকে নিয়ে কী করা যায় সে পরামর্শ আপনি যদিও আমাকে দিয়েছিলেন...'

চাঁদের ম্লান আলোয় ওরা ভেড়ার পালের চারধারে ঘোড়ার চড়ে ঘুরতে লাগল। ওদের ঘোড়া দুটো পাশাপাশি চলছিল, থেকে থেকে রেকাবে রেকাবে ঠোকাঠুকি লাগার শব্দে সন্ধ্যার নীরবতা ভঙ্গ হয়ে যাচ্ছিল।

'এই দেমাকিটাকে নিয়ে পেরে ওঠা চাট্টিখানি কথা নয়। যে একটু

দরদ দেখিয়ে ওর কাছে ঘেঁষতে আসবে তারই ওপর একহাত নেবে...' অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে শেষকালে হাসিম বলল।

'না, আমি সে কথা বলছি না...' বিরক্তির সঙ্গে তাকে বাধা দিয়ে এরগেশ বলল। 'ও আমার কোন পরামর্শই শুনতে চায় না, বয়স্ক রাখালদের অভিজ্ঞতাও নিতে চায় না।'

'কথাটা তুমি ঠিক বললে না,' হাসিম আপত্তি করে বলল। 'আমায় ত জেরবার করে দিয়েছে! আর ভেড়া পালনের ওপর যে কত বই পড়ে ফেলেছে তার গোনাগুনতি নেই। তুমি যদি মনে কর যে ও তোমাকে অসম্মান করছে তা হলে গাঁয়ের সব পশুপালকের একটা সাধারণ সভা ডাক না কেন—আমরা ওর আচরণের বিচার করব।'

'আমার সম্মান-অসম্মানের ব্যাপার নয়, তবে সভা একটা ডাকা বোধহয় উচিত হবে,' এরগেশ বলল।

ঘোড়সওয়ার দুজন চুপ করে গেল, অনেকক্ষণ তারা একটি কথাও উচ্চারণ না করে উপত্যকার সান্ধ্য নীরবতায় কান পেতে কী যেন শুনতে শুনতে চলল।

এমন সময় পাহাড়ের সামনে থেকে স্নিগ্ধ বাতাস বইল, বাতাস বয়ে আনল কিশোরী কণ্ঠস্বর। ঘোড়সওয়াররা ঘোড়া থামিয়ে কান পাতল।

'তোতু গাইছে,' হাসিম বলল। 'কোথা থেকে যে ও এত শক্তি পায় বাপু--দিনরাত নিজের ভেড়ার পালের কাছে পড়ে আছে, আবার গানও আসে! চল একটু কাছে এগিয়ে যাওয়া যাক, ওর গান শুনতে আমি ভালোবাসি।'

ওরা দুজনে টিলার পায়ের কাছাকাছি এসে ঘোড়া থেকে নামল, ঘোড়া দুটোকে ঘাসের ওপর ছেড়ে দিয়ে সাদা শিলাখন্ডগুলোর ওপর গিয়ে বসল।

এরগেশ নিশ্বাস বন্ধ করে ওপর থেকে ঝরে পড়া কণ্ঠের প্রতিটি আওয়াজ লুফে নিতে লাগল। এই চাঁদনি সন্ধ্যা, এই নীরবতা, এই আশ্চর্য সুর তাকে মনে করিয়ে দিল শহরের কথা, থিয়েটার আর

'আইচুরেক' অপেরার কথা। সেই অপেরায় সহিসেরা বাঁশি বাজিয়ে রাতের রহস্যময় গরিমার জয়গান করে আর রাখালেরা তাদের গানে রাতের গৌরব ঘোষণা করে।

যে দিন এরগেশ থিয়েটারে এই অপেরা শুনতে যায়, সেই দিন থেকেই সে রাখালিয়া গান বেকবেকেইয়ের সুরে মুগ্ধ হয়। পাহাড় আর পাহাড়ী গাঁ তাকে টানে। কিন্তু আজ, গ্রীষ্মের ওই সন্ধ্যায়, পাহাড়পর্বতের মাঝখানে, ঝকঝকে বাঁকা শিঙের মতো চাঁদ আর তারায় খচিত আকাশের নীচে সে যা শুনল তা তার আগের সমস্ত অনুভূতিকে ছাড়িয়ে গেল। সে বসে রইল মন্ত্রমুগ্ধের মতো, নড়তে তার সাহস হচ্ছিল না।

"তুমি গান গাইছ বসন্তের পাখি, তুমি হয়ত আমার অনুপস্থিতি লক্ষ্যও কর নি। তোমার কিছু আসে-যায় না। কিন্তু আমার?.." ও ভাবল।

গান হঠাৎ থেমে গেল। পাহাড় থেকে চাপা ঘর্ঘর আওয়াজ তুলে একটা নুড়িপাথর গড়িয়ে পড়ল--আবার সব চুপচাপ। এরগেশ ও হাসিম ফিরতি পথ ধরবে এমন সময় আবার তোতুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল। গান অনেকক্ষণ ধরে পাহাড়ে পাহাড়ে বেজে চলল।

তোতু যখন গান থামাল তখন হাসিম আবিষ্টের মতো বলল:

'সভা ডেকে কাজ নেই, এরগেশ। লোকে সমানে সমানে যেভাবে কথা বলে, তোতুর সঙ্গেও সেইভাবে কথা বলতে হবে, ও সব বুঝবে।'

* * *

কোন রকম পূর্বাভাস ছাড়া হঠাৎই পাহাড়ী গাঁয়ে দেখা দিল বিপদ।

দূরের বনজঙ্গল আর উপত্যকা থেকে হানা দিল ক্ষুধার্ত নেকড়ের দল। রাখালদের উৎকণ্ঠার দিন শুরু হল। নেকড়েগুলো এখানে

ওখানে ভেড়ার পালের ওপর হামলা চালিয়ে ভেড়া ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে, নিয়ে চলে যায়।

সন্ধ্যার অন্ধকার নামা থেকে শুরু করে ভোরের আলো দেখা দেওয়া অবধি পাহাড়ে পর্বতে ওঠে গুলির আওয়াজ, শোনা যায় রাখালদের চিৎকার-চেঁচামেচি, পাহারাদার কুকুরগুলোর ডাক, ঘোড়ার খুরের আওয়াজ আর ভেড়ার ভীত আর্তনাদ। গাঁয়ের লোকজন দীর্ঘদিনের জন্য শান্তি হারাল, রাখালদের চোখের ঘুম গেল, তারা চোখ লাল করে ঘোরাঘুরি করতে থাকে।

রোজ সকালে জঙ্গল ঝাড়াই করে নেকড়ে তাড়ানোর জন্য পাহাড়ে চলে যেত শিকারীরা। তাদের সঙ্গে যেত গ্রে হাউন্ডের দল।

শিকারীদের সঙ্গে বুড়ো নুরমাতও যেত। রোজ সন্ধ্যায় তেপকেদেই বৃথাই অপেক্ষা করে থাকত কখন তার স্বামী দামী শিকার নিয়ে ঘরে ফিরবে -- ঘোড়ার জিনের সঙ্গে লটকিয়ে নিয়ে আসবে ধাড়ি নেকড়ের চামড়া, যেমন আস্তানায় নিয়ে আসত আর সব শিকারী। বুড়ো প্রতিবারই ফিরে আসত খালি হাতে— অবশ্য পথে গুলি মেরে দৈবাৎ ঘায়েল করা পাহাড়ী টার্কি, বুনো পায়রা বা উপত্যকার সাধারণ কাঠবিড়ালির কথা বাদ দিলে।

তেপকেদেই একবারও স্বামীকে খোঁটা দিয়ে একটি কথাও বলল না।

আর বুড়ো নুরমাত কোন কথা না বলে শিকার তার হাতে তুলে দিয়ে তাঁবুর ভেতরে চলে যেত। পাহাড়ী গাঁয়ের বহু ভেড়ার পালই ইতিমধ্যে নেকড়ের কবলে বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, কিন্তু তোতুর ভেড়ার পাল আগের মতোই পুরো রয়ে গেছে, একটার গায়েও কোন হাত পড়ে নি, যেন অদৃশ্য কোন হাত বিপদ থেকে তাকে আগলে রাখছে।

এই রকম অদ্ভুত ব্যাপারে এরগেশও কম আশ্চর্য হয় নি। কিন্তু মেয়েটিকে এরগেশ যতই জিজ্ঞেস করে, উত্তরে সে কেবল কাঁধ ঝাঁকায় আর এক কথায় বলে:

'আমি বেকবেকেই গাই...'

রহস্যটা আপনা-আপনি দৈবাৎই ফাঁস হল শরতের এক বাদলা রাতে।

সন্ধ্যা থেকেই জলভরা কালো মেঘে গোটা আকাশ ছেয়ে গেছে, নীচের উপত্যকা ঢাকা পড়ে গেছে ঘন কুয়াসায়। মাঝরাতি নাগাদ পাহাড়ে কড়কড় শব্দে প্রথম বজ্রপাত হল, একের পর এক বিজলী চমকাতে লাগল। দেখতে দেখতে ঝমঝম করে শুরু হয়ে গেল প্রবল বর্ষণের তেরছা ঠান্ডা ছাঁট।

বাড়িতে যাওয়ার পথে এরগেশ বৃষ্টির মধ্যে পড়ল। ভিজে সপসপে হয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে সে যখন ফিরল তখন তার দিকে হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে এলো তেপকেদেই।

'কিছু ঘটল না কি?' জিন থেকে না নেমে পশুপ্রযুক্তিবিদ জিজ্ঞেস করল।

'তোতু ভেড়ার পাল নিয়ে এখনও ফেরে নি, আমার বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে,' বুড়ি উত্তর দিল। 'নুরমাত অনেকক্ষণ হল ওর কাছে গেছে, কিন্তু এখনও ওরা ফিরল না।'

'তোতুর গরম জামাকাপড় আমাকে দিন, আমি ওর কাছে নিয়ে যাব,' এরগেশ বলল।

'আমার কর্তা আবার চোখেও এখন কম দেখে, হয়ত পাহাড়ে পথ গোলমাল করে ফেলেছে—তোতুকে খুঁজে পাবে কোথায়! কত আগে ও চলে গেছে...'

'তেপকেদেই চাচী আমায় দেরি করিয়ে দেবেন না,' এরগেশ বুড়ির কথায় বাধা দিয়ে বলল।

তেপকেদেই তাঁবুর ভেতরে ছুটে গেল, এক মিনিট বাদেই ফিরে এলো একটা মোড়ক নিয়ে। এরগেশ তার পশমের ঢিলে আঙরাখার নীচে, বুকের কাছে মোড়কটাকে লুকিয়ে রাখল, তারপর ঘোড়ার গায়ে রেকাবের মৃদু আঘাত করে গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টিতে ধোঁয়া ধোঁয়া রাতের অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

তেপকেদেই বৃষ্টি মাথায় করে তাঁবুর দোরগোড়ায় কিছুক্ষণ

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গাঢ় অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইল, আর রাতের অন্ধকারের মধ্যে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ মিলিয়ে যেতে দরজার কম্বলের পর্দাটা নামিয়ে দিল।

পাহাড়ের পিছনে পায়ে-চলা-পথে এরগেশ অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করল, শেষে তার কানে এলো বুড়ো নুরমাতের সামান্য ভাঙা ভাঙা গলার আওয়াজ। এ আওয়াজ তার পরিচিত। সে কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে দৌড়বাজ ঘোড়াটাকে চালিয়ে দিল। কিছুক্ষণের মধ্যে ওদের দুজনের ঘোড়া মুখোমুখি হল।

'তোতু কোথায়?' রেকাবের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে এরগেশ জিজ্ঞেস করল।

'এক ঘণ্টারও বেশি হয়ে গেল আমি চেঁচাচ্ছি, কিন্তু ও কোন সাড়া দিচ্ছে না,' বুড়ো উদ্বিগ্ন হয়ে বলল। 'তাহলে কি ওর কোন বিপদ-আপদ হল? ওঃ, আমি আর বাঁচব না!'

'বিলাপ না করে খোঁজা দরকার!' এরগেশ বিরস কণ্ঠে বলল। 'যাওয়া যাক।'

বুড়ো অনুগতের মতো এরগেশের দৌড়বাজ ঘোড়ার পিছু পিছু নিজের ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। বৃষ্টি অবিরাম ঝরছে। ঝোপেঝাড়ে বাতাসের সন্‌সন্‌ আওয়াজ, ডালপালা একেবারে মাটিতে নুইয়ে পড়ছে। ঘোড়াগুলো কেবল তাদের ঘ্রাণশক্তি দিয়ে পথ আন্দাজ করে চলছিল — তারা সন্তর্পণে, প্রায় নিঃশব্দে পাহাড়ের ওপর খোঁচা খোঁচা পাথর ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে চলছিল। অন্ধকার এমনই গাঢ় যে এরগেশের অনুসরণকারী নুরমাত ওর দৌড়বাজ ঘোড়ার ভেজা পেছনটা দেখতে পাচ্ছিল না বললেই চলে।

আচমকা ওদের কয়েক পা দূরে শোনা গেল তোতুর গলার আওয়াজ, কুকুর আর ভেড়ার ডাক, পর পর দুটো গুলির আওয়াজ গুরুম গুরুম করে উঠল।

এরগেশ চাবুক কষে দৌড়বাজ ঘোড়াকে খেপিয়ে দিল, ঘোড়া একটা ঝাঁকুনি মেরে ঊর্ধ্বশ্বাসে তাকে বয়ে নিয়ে এলো টিলার ওপর।

অবশেষে বাতাস ঘন মেঘ ছিন্নভিন্ন করে দিতে বিবর্ণ চাঁদ টিলার ঢালের ওপর দিকে ম্যাটমেটে আলো ফেলল। এরগেশ দেখতে পেল ঢালের নীচের দিকে দলবাঁধা ভেড়ার পাল আর তার কাছে একটা মূর্তি। মূর্তির হাতে বন্দুক ধরা, বন্দুকের নল মাটির দিকে নামানো।

'নেকড়ে! নেকড়ের পাল!' ওদের দিকে ছুটে আসতে আসতে তোতু চেঁচিয়ে বলল।

এরগেশ সামনের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল, ভেড়ার পালের চারদিকে পাক খেয়ে ভেড়াগুলোকে পাহাড়ের আরও কাছে ঠেলে দিল। বুড়োও পিছিয়ে না থেকে তাকে অনুসরণ করল।

'দাঁড়াও এরগেশ, দাঁড়াও!' ও ডাক দিল। 'এখানে কে যেন পড়ে আছে।'

এরগেশ দৌড়বাজ ঘোড়ার মোড় ঘুরাল। বুড়ো ইতিমধ্যে ঘোড়া থেকে নেমে পড়েছে।

'ধাড়িটাকে ও এক ঘায়ে খতম করেছে দেখছি,' সে বলল। 'জন্তুটার শরীর এখনও গরম। ভাবাই যায় না!'

সে কান ধরে নেকড়ের মাথা উঠিয়ে সঙ্গে সঙ্গে হাতের আঙুলগুলো আলগা করে দিল। মাথাটা ধপ্ করে পাথরের ওপর পড়ে দাঁতে দাঁতে ঠকঠক আওয়াজ হল। নেকড়ের নিভু নিভু চোখে একটা সাদা ফুলকি তুলে চাঁদের আলো নিভে গেল। বুড়ো ছুরি বার করল, হাঁটু মুড়ে বসে পড়ে চুপচাপ চামড়া ছাড়াতে লেগে গেল।

এরগেশ তোতুর কাছে ফিরে এলো। মেয়েটি আগের জায়গায়ই দাঁড়িয়ে ছিল, তবে এখন আর তার হাতে বন্দুক নেই, আছে রাখালের লাঠি। তার গায়ের ভিজে জামাকাপড় শরীরের সঙ্গে লেপ্টে আছে, মাথার রুমাল একপাশে কাত হয়ে পড়েছে, চুল এলোমেলো। সে একটু একটু কাঁপছে, তার থুতনিতে বৃষ্টির ফোঁটা দেখা যাচ্ছে, কিন্তু মুখে গর্বের ভঙ্গিটা ঠিকই আছে।

'তোমার গুলিতে নেকড়ে ঘায়েল হয়েছে তোতু,' এরগেশ তাকে জানাল।

'তার মানে এই নিয়ে দুটো মরল আমার হাতে,' মেয়েটি বলল।

'প্রথমটার চামড়া গেল কোথায়?'

'হাসিমের কাছে। ও-ই আমাকে কিছু সময়ের জন্যে পুরনো বন্দুকটা ধার দেয়।'

'ভেড়াগুলো মনে হচ্ছে সব ঠিকই আছে, কেবল কয়েকটার লেজে কামড়ের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে,' নুরমাত এগিয়ে এসে বলল। 'নেকড়েগুলো কেবল একটা বুড়ো ভেড়া নিয়ে যেতে পেরেছে, বড় রকমের ক্ষতি কিছু হয় নি...'

এরগেশের হাত থেকে মোড়ক নিয়ে তোতু পাহাড়ের শিলার আড়ালে চলে গেল। চাঁদের আলোয় সে যখন আবার খোলা জায়গায় এসে দাঁড়াল তখন এরগেশ নিজের চোখকে বিশ্বাসই করতে পারল না: তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সেই কিশোর রাখাল, গায়ে গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা ঢিলে পোশাক, মাথায় কচি ভেড়ার চামড়ার টুপি—নীচু করে চোখের ওপর টেনে দেওয়া। পাহাড়ী গাঁয়ে আসার প্রথম দিনে একেই সে উপত্যকায় ভেড়ার পাল নিয়ে দেখেছিল। এরগেশ ভেবাচেকা খেয়ে গেল, অনেকক্ষণ তার কান বাক্যস্ফূর্তি হল না।

'সেদিন আমাকে বেশ ফাঁকিটা দিয়েছিলে বটে!' শেষকালে হেসে সে বলল। 'সাবাস, বসন্তের পাখি কার্লিগাচ! তবে আর আমাকে ফাঁকি দিতে পারবে না।'

'দেখা যাবে,' তোতুর দুই চোখে চোখের পাতার আড়ালে হাসি ঝিলিক দিয়ে উঠল।

এরগেশ ওর দিকে তাকাল, তার ইচ্ছে করছিল এখনই ওকে কোলে তুলে নিয়ে যে দিকে দুচোখ যায়, বয়ে নিয়ে যায়।

সকালে তোতুর সুরেলা গলার আওয়াজে তার ঘুম ভেঙে গেল।

'ওঠ দেখি বাপু, আচ্ছা ঘুম ত!' সে চেঁচিয়ে বলল। 'বেরিয়ে

এসো, এখন আমরা গ্নলি ছোঁড়ার পাল্লা দিয়ে দেখব, নয়ত তোমার বিশ্বাসই হচ্ছে না যে রাতে আমিই নেকড়ে ঘায়েল করেছি।'

ঘ্নম জড়ানো চোখ রগড়াতে রগড়াতে, সকালের প্রখর স্নর্যের আলোয় চোখ কুঁচকে এরগেশ তাঁব্ন থেকে বেরিয়ে এলো। তোতু ছোট বোরের বন্দ্নক হাতে ওর জন্য অপেক্ষা করছিল। পাশে দাঁড়িয়েছিল তেপকেদেই ও ন্নরমাত।

তোতু বড় শিলাখণ্ডের গায়ে নিশানা আঁকা প্লাইউডের বোর্ড খাড়া করে রাখল, কোন রকমে হাসি চাপতে চাপতে ফিরে তাকিয়ে বলল:

'কি গো গ্নলিবাজেরা, তোমাদের মধ্যে কে প্রথম গ্নলি করবে বল? বয়সে যে বড় সে, না ছোট?'

ন্নরমাত ভুর্ন কোঁচকাল। কিন্তু এরগেশ ব্নড়োর ম্নখে পরিবর্তনের চিহ্ন লক্ষ্য করল না। সে তাই সরল মনে প্রস্তাব করল:

'তর্নণীর পক্ষ নিতে হয়—তুমিই প্রথম ছোঁড়।'

ব্নড়োর গোমড়া চেহারা এরগেশের নজর এড়িয়ে গেলেও তোতুর কাছে ঠিকই ধরা পড়ে গেল। সে বাপের কাছে এগিয়ে এসে বন্দ্নকটা তার দিকে বাড়িয়ে দিল।

ব্নড়োর বলিরেখা আঁকা ম্নখ থেকে বিষণ্ণতার ছায়া সরে গেল, সে বিষণ্ণতা যেন ছিল দৈবাৎ স্নর্যের ওপর ভিড় করা মেঘের মতো। সে এক হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াল, বন্দ্নকের নল তুলে লক্ষ্য স্থির করল। উত্তেজনায় তার চোখের পাতা কেঁপে উঠল। শেষে সে তার কদাকার শ্নকনো আঙ্গ্নল দিয়ে বন্দ্নকের ঘোড়া টিপল, তারপর কপাল কুঁচকে কাজের লোকের মতো হাবভাব করে হেলেদ্নলে নিশানার দিকে চলল।

গ্নলিটা কোনক্রমে প্লাইউডের ওপরের কাটা অংশে বিঁধেছে। ব্নড়ো নিঃশব্দে ঠোঁট নাড়াল, বোধহয় উচ্চারণ করল তার অভ্যস্ত ব্নলি: 'দ্নর ছাই!' তারপর সে চুপচাপ একপাশে সরে গেল।

এরগেশ গ্নলি ছোঁড়ার পর প্লাইউডের ওপর একটা আঁচড়ও পড়ল

না। বিরত হয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে তোতুর জন্য জায়গা করে দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় তার রইল না।

মেয়েটি দ্রুত বন্দুকে গুলি ভরল এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, মনে হল প্রায় কোন রকম লক্ষ্য স্থির না করেই গুলি ছুঁড়ল। এরগেশ পড়িমরি করে নিশানার দিকে ছুটল। নিশানার মাঝখানে জ্বলজ্বল করছিল ছোট একটা ফুটো।

'সাবাস, বসন্তের পাখি! একেবারে বুকে এসে বিঁধেছে!' মাথার ওপর বোর্ডটা নাড়াতে নাড়াতে এরগেশ চেঁচিয়ে বলল।

'কেমন?' তোতু হাসল।

বুড়ো নুরমাত সন্দিগ্ধমনে ফুটোটা খুঁটিয়ে দেখল, আড়চোখে মেয়ের দিকে তাকাল, কোন কথা না বলে ঘাড় গোঁজ করে তাঁবুর ভেতরে চলে গেল। শিগ্‌গিরই সে দরজার সামনে বেরিয়ে এলো নিজের বন্দুক নিয়ে।

'নে, ধর!' সে বলল। 'নিয়মের কথা ধরলে আমার দেওয়া উচিত ছেলেকে। তুই মেয়ে হলেও পুরুষমানুষদের হারিয়ে দিয়েছিস।'

ওরা চারজনেই একে অন্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে চুপ করে রইল।

এরগেশ কোন কথা না বলে তোতুর জিনিসপত্র তাঁবুতে বয়ে নিয়ে এলো আর নিজে গিয়ে উঠল পাতার কুটিরে।

* * *

সেই স্মরণীয় বাদলা রাতের পর থেকে এরগেশ প্রায়ই চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়তে লাগল।

তোতু তার মাথা থেকে কিছুতেই যায় না। তাকে সে কখনও দেখতে লাগল রাখাল ছেলের বেশে, তার গায়ে বর্ষাতি, মাথায় কচি ভেড়ার চামড়ার টুপি; কখনও সে ঘোড়া ছুটিয়ে চলছে, কখনও টিলার চূড়ায় বেকবেকেই গাইছে, কখনও ঠাণ্ডা কনকনে বৃষ্টি মাথায় করে বিদ্যুতের

আলোয় দাঁড়িয়ে আছে ভেড়ার পালের কাছে... মেয়েটির মূর্তি তাকে সর্বত্র অনুসরণ করতে লাগল।

এদিকে যখন একান্তে ওর সঙ্গে দেখা হয়ে যায় তখন সে বিব্রত হয়ে পড়ে, লজ্জায় লাল হয়ে যায়, নিজেই নিজের দ্বিধার জন্য কষ্ট পায়। এরগেশের এসব কিছুই হয়ত হত না যদি না তার সঙ্গে সাম্প্রতিক দেখাসাক্ষাতের সময় তোতুর কোন পরিবর্তন ঘটত। কিন্তু মেয়েটি হঠাৎই মুখচোরা হয়ে পড়ল, নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে নিল, আর এতেই এরগেশ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল। তোতুর খোঁচার উত্তরে সব সময়ই সে কোন না কোন কটু কথা বলতে পারত, তার রসিকতার জবাবে রসিকতা, বিদ্রূপের জবাবে বিদ্রূপ করতে পারত। কিন্তু এই নীরবতার কী ব্যাখ্যা হতে পারে? কিংবা তার অপ্রত্যাশিত আচরণের? চুপ করে আছে যেন ঠোঁট সেলাই করা, তারপর হঠাৎই বলা নেই কওয়া নেই খিলখিল করে হেসে ওঠে, কখনও বা আরও বিদঘুটে কাণ্ড— জায়গা ছেড়ে ঝট করে উঠে পড়ে ছুটে যায় উঁচু উঁচু ঘাসের ওপর দিয়ে, ছাগলের চামড়ার জুতোর লাল হিল ঘাসের মধ্যে ঝলকাতে থাকে।

একদিন জ্যোৎস্না রাতে এরগেশের ঘুম আসছিল না, সে তার কুটির থেকে বেরিয়ে এলো উঠোনে। এমন সময় সে দেখতে পেল মেয়েটিকে। সাদা তাঁবুতে কাঁধ ঠেকিয়ে সে আনমনে দূরে কোথায় যেন তাকিয়ে ছিল, কাঁধের ওপর যে কাশ্মীরী শালটা ফেলা ছিল তার কোঁচানো গোছা সে হাতড়াচ্ছিল।

এরগেশ ধীরে ধীরে তাঁবুর দিকে এগিয়ে গেল। তার পায়ের খসখস শব্দে তোতু ফিরে তাকাল না, সে কেবল মাথাটা সামান্য বাঁকিয়ে শালের প্রান্ত বুকের ওপর তুলে দিল। এরগেশের বুকের স্পন্দন দ্রুত হয়ে উঠল, সে হাত তুলে তার কাঁধের ওপর ফেলা শক্ত করে পাকানো বিনুনি স্পর্শ করল। তোতু ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল, তার হাতের ওপর মৃদু চাপড় মারল।

'সোহাগ দেখানো হচ্ছে। এ আবার কোন ছিরি?'

এরগেশ তার দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইল। মুহূর্তের একটা আড়ষ্টতা ওদের দুজনকেই আচ্ছন্ন করল, কী করা যায়, একে অন্যকে কী বলবে ওরা বুঝে উঠতে পারল না। প্রথমে সামলে নিল তোতু। সে এক পা পিছিয়ে গেল, তারপর ধীরে ধীরে চোখ নামিয়ে তাঁবুর ভেতরে চলে গেল।

এরগেশ নিজের কুটিরে ফিরে গেল, জামাকাপড় না ছেড়েই বিছানার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, বালিশে মুখ গুঁজল। 'এ কী ব্যাপার? আমার হল কী? এই কিছুদিন আগেও আমি ভেবেছি যে অন্যের পরিবারের মেয়ে তোতুকে ভাগ্য আমার কাছে পাঠিয়েছে বোন করে, আর আজ? ভালো নয়... লজ্জার কথা... ঠিক নয়... লজ্জার কথা... আমার উচিত হবে না...'

সকাল অবধি সে চোখ বুজতে পারল না। সূর্যের প্রথম কিরণ দেখা দিতেই ঘুম ঘুম চেহারা আর ভাঙা মন নিয়ে সে দৌড়বাজের পিঠে জিন চাপাল, চলে গেল পাহাড়তলিতে, যৌথখামারের অফিসে।

কয়েকদিন বাদে ফসল তোলার কাজ শেষ হল। পশুপালকে পাহাড়ের উঁচু চারণভূমি থেকে খেদিয়ে নিয়ে আসা হল নীচের খালি মাঠে। শিগ্গিরই এরগেশও চলে গেল ফ্রুঞ্জেতে, কোর্সে যোগ দিতে।

* * *

তিনমাস কেটে গেল, এরগেশ ফিরে এলো যৌথখামারে।

প্রভুর অনুপস্থিতিতে দৌড়বাজ ঘোড়াটা অস্থির হয়ে পড়েছিল, এবারে সে গিঁট করে বাঁধা লেজটা নাড়াতে নাড়াতে তাকে বয়ে নিয়ে চলল পাহাড়ের দিকে। রাস্তা ছিল বরফের স্তূপে ঢাকা, ঘোড়াটাকেও তুষার চিতার মতোই বাতাসের ঝাঁটে স্তূপীকৃত তুষার রাশি ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে চলতে হচ্ছিল।

এরগেশ ভেড়ার চামড়ার লম্বা কোটের কিনারা হাঁটুর নীচে গুঁজে জিনের ওপর বসে ছিল, শেয়ালের চামড়ার টুপির কানা নামিয়ে

রেখেছিল কানের ওপর। তার পেছনে জিনের সঙ্গে বাঁধা ছিল ঝুড়ি, ঝুড়িতে ঠাসা ছিল নুরমাতের পরিবারের জন্য উপহার। সবচেয়ে নীচে ছিল তোতুর জন্য উপহার। এই উপহার এরগেশ নিজের রুচি অনুযায়ী অনেকক্ষণ ধরে দোকানে বাছাই করে কেনে।

পাহাড়ে তুষারাচ্ছন্ন গিরিখাতের সংযোগস্থলে শীতের আস্তানা গড়ে উঠেছে। পথে এরগেশের চোখে পড়ল একটা নিঃসঙ্গ খোঁয়াড়। বরফে ঢাকা নীচু মাটির কুঠরির চিমনি থেকে বেরিয়ে আসছে বাদামী-বাদামী রঙের ধোঁয়া। ঘুঁটে পোড়ার কটু গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল। বেড়ার ওপারে ভেড়াগুলো কচমচ করে খড় চিবুচ্ছিল।

মাটির নীচু ঘরের একরত্তি জানলার ফাঁক দিয়ে ঠাণ্ডার মধ্যে কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছিল ভাপ, লোকজনের কণ্ঠস্বর কানে ভেসে আসছিল। এরগেশ কান পেতে শুনল, হাসিমের খাদের কণ্ঠস্বর চিনতে পারল। "তার মানে তোতুর খোঁয়াড় কাছেপিঠেই কোথাও আছে—ওরা সব সময় একে অন্যের কাছাকাছি জায়গায় ভেড়া চরায়," এরগেশ মনে মনে ভাবল।

ও দৌড়বাজ ঘোড়াটাকে উপত্যকার ওপরের দিকে ছুটিয়ে দিল। মাঝে মাঝে ঘোড়ার বুক-সমান বরফ। উপত্যকাটিকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন দুধে ভর্তি জামবাটি।

অবশেষে দৌড়বাজ ঘোড়া দমকা ছুট মেরে টিলার ওপর গিয়ে উঠল, সেখানে থমকে দাঁড়াল, তার দুপাশের পাঁজরা হাঁপানোর সঙ্গে সঙ্গে ফুলে উঠল। টিলার ওপর প্রচণ্ড বাতাস বরফ ঝেঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, শরৎকাল থেকে মাটির ওপর ঘন হয়ে যে রুক্ষ ঘাস পড়ে ছিল তা ঘোড়ার খুরের চাপে চড়বড় করে উঠল।

"এই রকম টিলার ওপর ভেড়া চরানো যায়," এরগেশ মনে মনে ভাবল। "কিন্তু খোঁয়াড় থেকে ঘন বরফের ওপর দিয়ে ওদের কী করে খেদিয়ে আনা যায়?"

সূর্য দিগন্তে হেলে পড়েছে। গিরিখাতের ওপরে এসে পড়েছে দীর্ঘ নীল-নীল ছায়া। টিলার চূড়া থেকে এরগেশ দেখতে পেল

বরফের ওপর কালো কালো খোঁয়াড়, কিন্তু সেগুলোর মধ্যে তার পরিচিত সাদা তাঁবুটা খুঁজে বার করতে পারল না। এমন সময় তার নজরে পড়ল বরফের ওপর পায়ে-চলা-পথের চিহ্ন। এবড়োখেবড়ো গভীর একফালি জায়গা ধরে পথটা ওপরে উঠে গেছে, দেখে মনে হয় যেন তীক্ষ্ন ফলা দিয়ে বরফ ভেদ করে কাটা। উঁচুনীচু ঢালের ওপর শান্তভাবে চলে বেড়াচ্ছিল ভেড়ার পাল।

"আমার আইডিয়াটা দেখছি আরও কারও মাথায় ঢুকেছে, ভেড়ার পালকে পাহাড়তলিতে খাওয়াতে নিয়ে এসেছে," এরগেশ ভাবল। সে বরফ ঢাকা ফালি পথের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

ওর দৌড়বাজ ঘোড়াটার বুক অবধি সঙ্গে সঙ্গে বাদামী রঙের তুষার স্তূপের ভেতরে ডুবে গেল। এরগেশকে ঘোড়া থেকে নামতে হল। ভেড়ার চামড়ার ওভারকোটটা তুষারস্তূপের ওপর ফেলে দিয়ে তার দীর্ঘ প্রান্ত পেছন পেছন টানতে টানতে সে গুড়ি মেরে সামনে এগিয়ে চলল।

যে জায়গাটা ধরে সে গুড়ি মেরে চলছিল তার কয়েক মিটার নীচে এরগেশ দেখতে পেল কোদাল হাতে একজন মানুষের কালো মূর্তি। সে কখনও ঝুঁকে পড়ে কখনও বা সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে পথ সাফ করছিল। পাথরের বিরাট বিরাট চাঁই কোদাল থেকে গিয়ে পড়ছিল কাটা পথের পাশে উঁচু জায়গায়।

মানুষটি নিজের কাজে এতই ব্যস্ত ছিল যে এরগেশ কখন লাফিয়ে তার পেছনে এসে পড়েছে তা সে লক্ষ্যই করল না। সে ফিরেও তাকাল না। এরগেশ ঘুরে সামনের দিকে এলো, তোতুর মুখোমুখি পড়ে গেল। তোতুর পায়ে বিরাট বিরাট ফেল্ট বুট, পরনে ভেতরে ফার দেওয়া ভেড়ার লোমের চওড়া প্যাণ্ট—উঠে গেছে একেবারে বগল অবধি--সেখানে কাঁচা চামড়ার বেল্ট দিয়ে বাঁধা, মাথায় শেয়ালের চামড়ার টুপি, হাতে দস্তানা। সব নিয়ে তাকে দেখাচ্ছিল একটা থপথপে ভালুকের মতো। এরগেশ মজা পেয়ে হাসি চেপে রাখতে পারল না, হো-হো করে হেসে উঠল।

তোতু কিন্তু সেই একই রকম মনোযোগের ভাব নিয়ে বরফ পরিষ্কার করে পাশে ছুঁড়ে ফেলতে লাগল, এরগেশ যে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সেদিকে নজরও দিল না। তবে এরগেশ দেখতে পেল যে নাকের খাঁজের সামনে তার ভুরুজোড়া এসে মিলেছে আর তার ঠোঁটের কোনায় দেখা দিয়েছে মৃদু হাসি।

'তোতু, আমার দিকে তাকিয়ে দেখ একবার, আমি ফিরে এসেছি...'

মেয়েটি কোদালটা বরফের ভেতর বিঁধিয়ে খাড়া করে রাখল, মাথার টুপি খুলে ঝুলিয়ে রাখল কোদালের হাতলে, দস্তানাজোড়াও একপাশে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তার লাল টকটকে মুখ থেকে ভাপ বেরোচ্ছিল। বিস্ফারিত দুই চোখে খুশি গোপন রইল না, চোখজোড়া দুষ্টুমির ভঙ্গিতে জ্বলজ্বল করছিল।

এরগেশ তোতুর কাছে এগিয়ে এসে তার দুহাত ধরল।

'ফিরে এসেছ...' তোতু ফিসফিস করে বলল।

তার কণ্ঠস্বর এরগেশের কানে পাখি-ধরা খঞ্জনির রিনিঝিনি সুর হয়ে বাজল।

জুনাই মার্ভালিয়ানভ

রুটি

দিন তিনেক আগে জানিবেক তার সবজি বাগানের পুরনো উইলো গাছের দুটো সিধে ডাল কাটে। কষ্ট হচ্ছিল--এই প্রীতিকর গাছটায় সে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল, ইঁদুরের কানের মতো খুদে খুদে তার পাতাগুলো সব সময় দুলত। কষ্ট হচ্ছিল, কিন্তু কাটতে হল...

ছালবাকল ছাড়ানো ডাল দুটো তাড়াতাড়ি শুকিয়ে উঠল। গতকাল সন্ধ্যায় সে নতুন করে শানানো কোদালে বাঁট লাগায়...

হ্যাঁ, কোদাল দুটো বেড়ে হল! রাতে হাতলটা সামান্য স্যাঁতসেঁতে হয়ে পড়েছিল। জানিবেক হাতলটা জুত করে বাগিয়ে ধরে ঝট্ করে ওপরে ওঠাল। মাটিতে মাজাঘষা ঝকঝকে ফলক অবলীলাক্রমে ঝাপ্সা রুপোলি অর্ধবৃত্ত রচনা করে নরমভাবে মাটিতে বিঁধে গেল। চমৎকার!

জানিবেক এবড়োখেবড়ো কাঁচা ইঁটে তৈরী বাড়ির জীর্ণ চালের ওপর একটা একটা করে দুটো কোদালই ছুঁড়ে দিল।

তারপর ধীরে ধীরে পা ফেলে আস্তাবল থেকে রোদে পোড়া পুরনো মই বয়ে নিয়ে এলো, মইটাকে এবড়োখেবড়ো ফোকলা দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে রাখল। সিঁড়িগুলো মড়মড় শব্দে আর্তনাদ করতে করতে ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হল। সে অবশ্য অমনিই এক ঝটকায়, এক লাফে চেটাল চালের ওপর গিয়ে উঠতে পারত, কিন্তু বাধো বাধো ঠেকে—সে ত আর বাচ্চা ছেলে নয়...

চালের ওপর উঠতে বোজবু পাহাড় থেকে ভোরের বাতাসের স্নেহস্পর্শ তার গায়ে এসে লাগল। রোদে পোড়া আদুল বুকে ও হাতে (ছাইরঙা ছিটকাপড়ের সার্টের আস্তিন সে গুটিয়ে রেখেছিল, আর গলার বোতাম সে কখনই আঁটত না) প্রীতিকর শিরশিরে স্পর্শ অনুভব করতে জানিবেক তৃপ্তির সঙ্গে বুক ভরে নিশ্বাস নিল, দুহাত ছড়িয়ে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল—তাকে দেখে মনে হল যেন ওড়ার জন্য উন্মুখ একটা সারস...

পূব আকাশ লাল টকটকে হয়ে উঠেছে, যেন ওপারে দাউদাউ করছে নিশাকালের বিপুল অগ্নিকাণ্ড। আর নীচে মাটি তখনও পড়ে ছিল বেগনী রঙের আবছায়ায়, কোথাও লুকিয়ে ছিল জমাট গাঢ় অন্ধকার।

...এই হল তার গাঁ, যেখানে আজ থেকে ছত্রিশ বছর আগে সে জন্মায়, যেখানে কাটে তার শৈশব, যেখানে সে হয়ে দাঁড়ায় পরিবারের কর্তা।

গাঁটা যেন নখদর্পণে। যত খুশি দেখা যায়। কেবল গাঁই নয়। এই ত দেখা যাচ্ছে উপকণ্ঠের ঘরবাড়ি থেকে শুরু করে বোজবুর পাহাড়তলি পর্যন্ত বিছানো সবুজের বিশাল সমারোহ—গমের শিষ ধরেছে। তার ওপর দিয়ে এখন ঢেউ গড়িয়ে যাচ্ছে যেন সমুদ্র। কেবল শব্দ নেই এই যা। কিন্তু তা হলে কী হবে, চাতক পাখিদের কাকলি কী পরিষ্কারই না শোনা যায়! আকাশের বুকে ওদের কে যেন ছুঁড়ে দিয়েছে। আর শোনা যায় বাড়ির পাশ দিয়ে যে জলসেচের নালা চলে গেছে সেখানে জলের সুরেলা কলকল শব্দ। এ আওয়াজ সাদামাঠা, অথচ এ যেন জীবনের এমন এক গান যা কখনও একঘেয়ে লাগে না...

আঃ, কী সুন্দর! স্থির, শান্ত...

জানিবেক কোদালটা তুলল, কিন্তু তার খরখরে হাতলের ওপর বুক ঠেকিয়ে আবার নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বড় বড় কালো চোখ মেলে সে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল নীচের দিকে, রাস্তার দিকে। গাঁয়ের সকলে এ রাস্তাটার নাম দিয়েছে 'তরুণ এভিনিউ'। জলসেচের খাল বরাবর যেন টানটান দড়ি ধরে প্রান্তে প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে নতুন নতুন ছোট ছোট ঘরবাড়ি--সাদা, পরিচ্ছন্ন, নিখুঁত, স্লেটে অথবা টিনে ছাওয়া, বেশির ভাগই উজ্জ্বল লাল রঙের টালিতে ছাওয়া... 'তরুণ এভিনিউ'... এক বছর আগে যখন কর্তৃপক্ষ ঠিক করলেন যে যৌথখামারীদের জন্য বাড়ি বানানো হবে, তখন সভাপতিমশাইয়ের পর প্রথম জায়গা ছেড়ে লাফিয়ে উঠেছিল কমসমোল সংস্থার সম্পাদক করিম। মাননীয় লোকেরা কী বলবেন না বলবেন তার অপেক্ষা না করে সে প্রথম এগিয়ে আসে...

সে গলা ফাটিয়ে বলল, 'কমরেডরা, সাতারভ্‌কে আপনারা সকলে ভালোভাবেই জানেন যৌথখামারের সেরা রাখালদের একজন। অঞ্চল-সোভিয়েত প্রতিনিধি। তাই তালিকায় প্রথম তোলা উচিত তাঁর নাম। প্রথম বাড়িটা তাঁরই হওয়া উচিত।'

গাঁয়ের সর্দার বুড়োরা কথা বলারও অবকাশ পেল না, সঙ্গে সঙ্গে তালিকা তৈরী হয়ে গেল আর ভোটে সকলে তার সমর্থন করল—সর্দার বুড়োরা নিজেরাই প্রথম ভোট দিল। অবশ্য সেখানে বেশির ভাগই ছিল অল্পবয়সীরা। আর সোজা কথায় বলতে গেলে, তালিকায় নাম ছিল একমাত্র অল্পবয়সীদের—যাদের বিয়ে হয়েছে দুবছর আগে, যারা সবে প্রথম সন্তানের মুখ দেখেছে...

এইভাবে তারা এক রাস্তার ওপরে বসত পাতে। এখন সকলে রাস্তাটাকে ঈর্ষার চোখে দেখে। জানিবেকও পুরনো বাড়ির চাল থেকে তার দিকে তাকায়--প্রতিটি বাড়ির লাগোয়া জমিতে ফলের বাগান, ফুল। যুদ্ধের আগে পর্যন্ত এই জায়গাটা যে কেমন ছিল তা ওর বেশ মনে আছে--একটা নিরেট পাথুরে জমি। আর গোটা গাঁ

বলতে ছিল ছাইরঙা মাটি, ধুলো ও চেটাল চালা। না কোন ডালপালা, না ফুল।

জানিবেক বর্ধিষ্ণু গাঁয়ের ওপর চোখ বুলায়। চাল থেকে সে চমৎকার দেখতে পাচ্ছে আঙিনাগুলো। গাঁ জেগে উঠছে। কেউ কেউ বাগানে চলাফেরা করছে, আপেলগাছে কীটনাশক ছিটোচ্ছে, সবজি বাগানে জল দিচ্ছে, সর্বত্রই ছেলেপুলের দল। ওরা গাজর, পেঁয়াজ আর ফুলগাছের সারিগুলোর মাঝখানে ছুটোছুটি করছে। দেখা যাচ্ছে এরাও গাছে জল দিচ্ছে, নিড়ানি দিচ্ছে, আবার এমনও হতে পারে চুপিচুপি গাজরের সরু সরু গোলাপী ঝুঁটি ধরে টান মারছে... শিগ্‌গিরই বড়রা খেতে চলে যাবে, বাচ্চারা দল বেঁধে ছুটবে স্কুলের দিকে...

জানিবেক হাসল। ঐ ত খেতে রওনা দিয়েছে প্রথম মজুর... সে কারাগুলকে অভিনন্দন জানিয়ে হাত নাড়ল, কারাগুল তা দেখতে পেল না, গলিতে মোড় নিল। ঘাস কাটতে গেল...

কারাগুলের বাড়িটা 'তরুণ এভিনিউয়ের' প্রথম বাড়ি, এক নজরেই চোখে পড়ে। জলসেচের যে বিরাট খালটায় শীতে ও গ্রীষ্মে সবজেরঙের টলটলে জল বয়ে যায় তারই ধারে বাড়িটা।

বাড়িটার জন্য আগাগোড়া চেহারাই নষ্ট হয়ে গেছে।

কারাগুল তার বাড়ি তৈরি করে যুদ্ধেরও আগে, যখন সে কাজ করত জেলাসদরে। বাড়ির চাল ভেঙ্গে পড়েছে, প্রায় এক মিটার পুরু তার দেয়াল, কাঁচা ইঁটের ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়েছে ভেতরের খড়কুটো। দেখলে এখন হাসি পায়। কিন্তু হাসির কী আছে? পুরনো বাড়ি যেমন হয়ে থাকে... ব্যাপারটা অবশ্য এই নয় যে বাড়িটা জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে, ব্যাপার এই যে কোন এককালে ওটা শ্রদ্ধার উদ্রেক করত, এমন কি লোকের মনে ঈর্ষা মেশানো আনন্দ জাগিয়ে তুলত। জানিবেকের এখনও মনে আছে, কারাগুলের বাড়ির গৃহপ্রবেশ উৎসব থেকে ফেরার সময় ওর মা অতিভোজনে টৈটম্বুর বাপের উদ্দেশে ঝাঁঝিয়ে ওঠেন:

'লোকে আজকাল কেমন বাস করছে ত? জীবন ত আর

কেউ আমাদের চিরকালের জন্যে দেয় নি। হয়ত কালই মারা যাব। অথচ মানুষের মতো জীবন আমরা শুরুই করতে পারলাম না! অন্তত বছর দুয়েকও যদি অমন বাড়িতে বাস করতে পারতাম, সেখানে যদি মারাও যাই ত দুঃখ্যু নেই! ভাব একবার--চার-চারটে ঘর, বিরাট বিরাট, আলো বাতাস খেলছে! বাইরে আর ভেতরে আগাগোড়া সাদা, বরফের মতো। উপোস করে থাকতে হলেও অমন বাড়িতে থাকতে রাজী। আর আমরা, আমরা বাস করি গুহায়—ভেবে দেখ, না আছে জানলা, না ভালো চুল্লি। দরজা বন্ধ করলে মনে হয় যেন কবরের ভেতরে আছি। অন্ধকার। যখন গোরে যাব তখনই ত অন্ধকারে পড়ে থাকতে পারব। শুনছ তুমি?'

সাপার-আকে কেবল বিড়বিড় করে বলল:

'আমাদের খামার বড়লোক হোক, তখন নিজেদের জন্যে প্রাসাদ বানাব, রূপকথার মতো। সবেরই সময় আছে, বিবি, তাড়াহুড়ো করো না।'

গোটা গাঁ জুড়ে তখন কারাগুলের বাড়ি নিয়ে কথা বলে, ছেলেবুড়ো কেউ বাদ নেই—সবাই কোন না কোন অছিলায় কারাগুলের বাড়িতে আসে, সবাই তার বাড়ির তারিফ করে। আর ফেরার পথে একসঙ্গে--এখানেও এককাট্টা হয়ে স্বামীদের খোঁচা দিতে থাকে, কেবল ঐ রকম একটা বাড়ি যাতে বানানো যায় তার জন্য দরকার হলে নিজেদের শেষ ছাগলটি, একমাত্র গোরুটিও যদি বেচে দিতে হয় তাও সই। বাচ্চারা দুধ না হয় না-ই পেল, খোলামেলা আরামের বাড়িতে থাকতে পারবে ত!

স্বামীরাও কৃপার দৃষ্টিতে বুঝিয়ে বলে:

'আচ্ছা ঠিক আছে, গোরু ছাগল না হয় বিক্রিই করলাম। কত পাওয়া যাবে গুনে দেখেছ কি? ছাদের টালির জন্যে কুলোলেও ভালো বলতে হয়। আর কাঠ, ইট, রং—এ সব কী দিয়ে কিনবে শুনি? খোদাতাল্লার কাছে ধার চাইবে না কি? কী বুদ্ধি আমার! কার সঙ্গে পাল্লা দিতে চাও বল দেখি? কারাগুলের সঙ্গে? একবার কি ভেবে

দেখেছ--লোকটা কে? কারাগুল এমন একজন লোক যার হাতের মুঠোয় আছে গোটা জেলার ভাগ্য। আর তোমাদের সাধ হল কিনা তার সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার! সাধে কি আর বলে বুদ্ধি খাটো, নজর বড়!'

এমন জবাব পেয়ে স্ত্রীরা কেবল দীর্ঘশ্বাস ফেলে:

'এর পরেও কি এইভাবে মাটির মেঝেতে চুল্লির ধারে বসে থাকতে হবে? পা পুড়ে যায়, ত নাক বরফে জমে যায়, নাক গরম হল ত পিঠে ঠান্ডা লাগে...'

এরপর প্রায় পঁচিশ বছর কেটে গেছে। লোকে এখন কারাগুলের বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে যেতে কেবল হাসে... যে সব মহিলার এককালে ঈর্ষায় রাতে ঘুম হত না তারাও এখন ফোকলা দাঁতে হিহি করে হাসে:

'বেচারি কারাগুল, এত বছর জেলাসদরের একজন হর্তাকর্তা ছিল মেঝে যে রং করতে হয়, ভিত ছাড়া যে দেয়াল ভিজে স্যাঁতসেঁতে হয়ে যাবে এই বোধও কি ওর হল না? আর বৌটা? মেঝে ধুতেও শিখল না গা? ঘরে নোংরা জমে জমে পাহাড় হয়ে গেছে—বুলডোজার দিয়েও সাফ করা যাবে না। বেচারি!'

কারাগুল এখন আর কর্তাব্যক্তি নয়। সে বাস করে যৌথখামারে, পশুখাদ্য মজুত বিভাগের কর্মিবাহিনীর প্রধান। এখন সে ব্যস্তসমস্ত হয়ে চলেছে ঘেসো জমিতে, যেখানে কর্মিদল ঘাস কাটছে। কারাগুল মানুষটা মন্দ নয়, ফুর্তিবাজ। কে বলবে যে কোন এককালে জেলাসদরে দায়িত্বপূর্ণ পদে ছিল, পোর্টফোলিও হাতে নিয়ে চলত আর প্রথম সম্ভাষণ জানাত কেবল বড় কর্তাকে। বন্ধুবান্ধব এখন তার অনেক, বিশেষত অল্পবয়সীদের মধ্যে, যদিও তারাও ঠাট্টা করে:

'কারাগুল চাচা, চটপট বাড়িটা নিজেই ভেঙ্গেই ফেলুন, নয়ত হঠাৎ একদিন ধ্বসস্তূপের নীচে পড়ে যাবেন। ছেচল্লিশ সালের ভূমিকম্পের কথা মনে আছে ত? আল্লা না করুন, অমন যেন আর না হয়... বলেন ত আমরা সাহায্য করি। আমাদের রাস্তাটাও সঙ্গে সঙ্গে নতুন চেহারা নেবে। কী বলেন, রাজী হয়ে যান, দেরি করবেন না।'

কারাগ্লল হাসিঠাট্টা গায়ে মাখে না। সাদা গোঁফ মোচড়াতে মোচড়াতে হেসে উত্তর দেয়:

'হাস, যত পার হাস, এমন এক সময় আসবে যখন তোমাদের নিয়েও লোকে হাসাহাসি করবে। বাড়ি আমি ভাঙ্গতে যাচ্ছি না বাপ্। আমার গর্ব এই যে গাঁয়ে প্রথম তৈরী হয় এমন বাড়ি, যার ছাদ উ'চু, জানলা বিরাট বিরাট। আর তোমরা ত সব মোটে আমার পরে এসেছ, আমার পেছন পেছন, তাই না? প্রথম ত আমিই!'

'ঠিক কথা, কারাগ্লল চাচা, ঠিক কথা। কেবল কথাটা হল এই যে অমন বাড়ি দিয়ে আমাদের কাজ কি? এটা কোন তুলনার যুগ্যি বলেই আমরা মনে করি না। দেখতেও খারাপ লাগে।'

'যা বলেছ। তোমরা কী ভাব আমি দেখতে পাই না যে আজকাল খামারে গোরু ভেড়ার ঘরও ভালো তৈরী হয়? সবই দেখতে পাই হে, বুঝি সবই। কিন্তু ভাঙ্গতে চাই না। কেন—জান? ফৌজ থেকে আসিলবেক ফিরে আসুক, তখনই বানাব নতুন বাড়ি—তোমাদের খুপরীর চেয়ে ভালো করে। সেখানে থাকবে ভাপ দিয়ে ঘর গরমের ব্যবস্থা আর গোসলখানা। আর রান্নাঘরের দেয়ালে লাগাব সাদা টালি। বুঝলে হে ছোকরারা! সুন্দরের কথা যদি বল তা হলে ভুলে যেও না- সব জিনিসই তা নিজের কালে সুন্দর। আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে আমার বাড়ির চেয়ে সুন্দর বাড়ি গাঁয়ের সারা তল্লাটে কোথাও ছিল না। সময়ে তা পুরনো হয়ে গেছে। পনেরো-বিশ বছর বাদে তোমাদের বাড়িঘরের অবস্থা কী হয় দেখব। ভাবছ লোকে তারিফ করবে? তারিফ করবে না হে, হাসবে। উঠতে থাকবে কয়েক তলা দালান, সেখানে থাকবে ইলেক্‌ট্রিক হিটিং ব্যবস্থা, ঠান্ডা জল আর গরম জল, ইলেকট্রিক পাখা আব রেফ্রিজারেটর। তোমাদের মুরগীর বাসা নিয়ে লোকে হাসাহাসি করবে হে। হাসবে তোমাদেরই ছেলেমেয়েরা।'

জেলাসদরের এককালের দায়িত্বপূর্ণ কর্মী, এককালের পোর্টফোলিওধারী মোড়ল কারাগ্লল এই কথা বলত।

জানিবেক কোদালের ওপর ভর দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে অনুসরণ করতে লাগল কালো ঘোড়ার পিঠে আরোহীকে, যতক্ষণ না সে গ্রামের শেষ প্রান্তের পপ্‌লার গাছগুলোর আড়ালে চলে গেল। ঠিক কথা, বুড়ো কারাগুল ঠিক কথা বলেছে। জীবন পাল্‌টাতে থাকে।

এই নিয়ে নয় বছর হল জানিবেক তামাক চাষের কর্মিবাহিনীর প্রধান। কর্মিবাহিনীর প্রধানের চেয়ে বেশি আর কাকে বাড়ি বাড়ি ঘুরতে হয়? কে আর তার চেয়ে বেশি জানে যৌথখামারীদের জীবন? সে জানে, বেশ ভালোভাবেই জানে পল্লীর প্রতিটি জায়গা আর লোকে কীভাবে জীবন যাপন করে তা-ও। তার এখন দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে এই যে পরিবারের অনেক অশান্তি, ঝগড়াঝাঁটি ঘটে থাকে অভাব-অনটন থেকে, দারিদ্র্য থেকে। আর ওপরওয়ালা ও যৌথখামারীদের মধ্যে খিটিমিটিও প্রায়ই বাধে ঐ একই কারণে। এই ত এখন যৌথখামারীরা বেশি করে পেতে শুরু করেছে শস্য, শ্রমদিনের জন্য টাকা, এখন জানিবেকের পক্ষে ওদের দিয়ে কাজ করান সহজ ও আনন্দের হয়ে দাঁড়িয়েছে: এখন আর বাড়ি বাড়ি ঘুরতে হয় না, রগ ফুলিয়ে চেঁচাতে হয় না 'কাজে চল রে, নইলে সভাপতিমশাইয়ের কাছে নিয়ে যাব! উনি তোকে মজা দেখাবেন!' যারা একটু সাহসী গোছের তারা জবাব দিতে ছাড়ত না: 'ভাগ তুই! চেঁচাচ্ছিস কেন? বাচ্চাদের ভয় দেখাতে এলি না কি? তুই কি ভাবিস রোজ রোজ তোর ঐ ঘেউ ঘেউ শুনতে ভালো লাগে? আমাদের দিনমজুরীর টাকা আর ফসল দে, নিশ্চিন্তে বাড়িতে বসে থাকতে পারিস। কাজে যাওয়া যে দরকার তা আমরা নিজেরাই জানি। কখন যাওয়া দরকার তা-ও জানি, কচি খোকা নই।'

জানিবেক মনে মনে এই গলাবাজদের সায় দিলেও নিজের মনোভাব গোপন করে ভয় দেখাত: 'চোপ রও, দলের কর্তা আর সভাপতিমশাইয়ের নামে যা তা বলার মজা টের পাবি 'খন! ঠিকমতো কাজ না করলে কে তোকে টাকা আর ফসল দেয় না শুনি? খবরদার বলছি! এ রকম কথা বলার ফল পেতে হবে!'

কয়েক বছর কেটে গেল, এখন আর জানিবেক সে রকম কথাবার্তা শুনতে পায় না। গাঁয়ের লোকেরা নিজেরাই কাজে যায়, কোন রকম তাড়া দিতে হয় না। কিন্তু কাজের পরিমাণ সঠিক হিসাব না করে দেখ না একবার! আগে সে দিকে লোকে মনোযোগই দিত না, ওরা জানত যে লেখ আর না লেখ, গোন আর না-ই গোন, পাবে অল্পই।

...পেছনে কিসের যেন একটা আওয়াজ হল। জানিবেক স্মৃতিচারণ থেকে বর্তমানে ফিরে এলো, মাথা ঘোরাল। দেয়ালের ওপর উঠে আসছে ভাইপো জেনিশের আটকোনা টুপি, কপালের সামনের কালো কুচকুচে চুলের গোছা আর গোল গোল চোখ। ভাইপোর সঙ্গে ওর বাড়ি ভাঙ্গার কথা ঠিক হয়ে গেছে। পুরনো মইটা তার শরীরের ভারে মৃদু ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ তুলল। অবশেষে এক ঝটকায় শেষ ধাপটা পেরিয়ে সে লাফিয়ে মাটির চালের ওপর এসে নামল।

সারিমসাক ফ্রন্ট থেকে ফিরে আসে নি। বুদাপেস্টের কাছাকাছি কোথাও মারা যায়। আর জেনিশের জন্ম হয় সে ফ্রন্টে চলে যাওয়ার চার মাস পরে। বাপকে সে জানে কেবল মা আর আত্মীয়স্বজনের মুখে শোনা গল্প থেকে। কিন্তু তার হুবহু ছবি যদি দেখার ইচ্ছে থাকে তা হলে আয়নার সামনে দাঁড়ালেই চলবে। অবিকল বাপের চেহারা: সেই একই ঘন চুল - মাথায় চিরুনি চলে না, সেই নাক, সেই গোল গোল চোখ। তফাতের মধ্যে কেবল দেহের গঠনটা। সারিমসাকের অমন পেশী ছিল না- পাতলা চামড়া ভেদ করে যেন ঢালা লোহার গুলি বেরিয়ে আসছে। ফৌজে মেদ জমানোর উপায় নেই।

জেনিশ শরৎকালে গাঁয়ে ফিরে আসে। আত্মীয়স্বজন মনে মনে বিবেচনা করল: 'ফিরল ত কী হল? এসেছে, তারপর দেখবে চলে যাবে — যেমন সব অল্পবয়সী ছেলেছোকরাই করে। শহর ওদের টানে, আমাদের জীবন পছন্দ হয় না।'

জেনিশ কিন্তু সকলকে প্রতারণা করল। কয়েক দিন বাদে সভাপতিমশাইয়ের কাছে গেল, ইলেক্‌ট্রিশিয়ান হয়ে গাঁয়ে থেকে গেল — ফৌজে থাকতে এ কাজটা সে শিখেছিল।

এই হল তার ভাইপো জেনিশ. সারিমসাকের ছেলে!

জেনিশ গাঁয়ের দিকে তাকিয়ে দেখল। লোকজন জেগে উঠেছে. গ্রাম আলোয় উদ্ভাসিত. তবে সে আলোয় এখনও তাপ নেই। সে সামনের পাহাড়গুলোর ওপর নজর বুলাল, কয়েকবার বুক ভরে নিশ্বাস নিল, তারপর কোদাল তুলে নিয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে জানিবেকের দিকে তাকাল।

জানিবেক নিজের কোদালের হাতল ধরে টানতে টানতে চালের কিনারায় এগিয়ে গেল। সে কোদাল তুলল, কিন্তু জলে বাতাসে ক্ষয়ে যাওয়া মাটির ওপর ঘা মারতে পারল না, কোদাল নামিয়ে রাখল... যে বাড়ি এক দিন মা-বাপ তাদের নিজেদের হাতে বানিয়েছিলেন, যেখানে জন্মেছিল ভাইয়েরা, যেখানে সে নিজে জন্মেছে, বড় হয়েছে সে বাড়ি ভাঙ্গা কি অত সহজ? মনে পড়ে গেল মা'র অভিশাপ। বহু বছর আগে কে যেন পুরনো বাড়ি ভেঙে ফেলে তার জায়গায় নতুন বাড়ি বানানোর কথা তুলেছিল. তখন তিনি বলেন:

'পৈতৃক ভিটে ভাঙা! পিতৃপুরুষের অভিশাপ লাগবে না? সর্বশক্তিমান আল্লা শাস্তি দেবেন! মড়া মানুষের স্মৃতি অপবিত্র করতে নেই!..'

বেচারি মা! মা ভগবানে বিশ্বাস করতেন, মৃতের অভিশাপে বিশ্বাস করতেন। কিন্তু প্রতি বছরই যৌথখামারে গৃহপ্রবেশ উৎসব হচ্ছে, কারও ওপর আজ অবধি পরমশক্তির কোপ এসে পড়ে নি, মৃতদের অভিশাপ লাগে নি। না. ভগবানে যদি আদৌ বিশ্বাস করতে হয় তা হলে বলব সৃষ্টি করা ভগবানেরই ইচ্ছানুযায়ী কাজ। কিন্তু ভগবান নেই. তা ছাড়া মাও অভিশাপ দেবেন না, ক্ষমা করবেন, যেমন তিনি তাদের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে গেছেন, যতকাল তিনি বেঁচে ছিলেন। তারা ছেলেমেয়েরা যাতে আরও ভালোভাবে থাকতে পারে তার জন্যই না তিনি সারা জীবন কাজ করে গেছেন? এই বাড়িটা বানাতেও ত সাহায্য করেছেন—মাঠে বহুক্ষণ কঠোর পরিশ্রম করে মাটি ছেনেছেন, ইট বানিয়েছেন, সন্ধ্যার অন্ধকার পর্যন্ত হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটেছেন।

আর সবই এই জন্য যাতে ছেলেমেয়েরা গরমের আমেজ পায়, শুকনো খটখটে জায়গায় থাকতে পারে। আর সে যে এই বাড়িটা ভাঙ্গছে তা-ও ছেলেমেয়েদের জন্য, ভবিষ্যতের জন্য। বাড়িতে কেবল দুটো ছোট ছোট ঘর। একটাতে সে তার গোটা পরিবার নিয়ে ঠাসাঠাসি করে বাস করে, আর অন্যটাতে থাকে সারিমসাকের বিধবা। এখন এসেছে জেনিশ। কাল হয়ত ও ওর বৌকেই নিয়ে আসবে—ওর বয়সও ত হল বাইশ। আমারও তিনটি বড় হচ্ছে।

ক্ষমা কর মা, বাবা ক্ষমা কর, জীবন ত থেমে থাকে না...

আঘাতে বাড়িটা কেঁপে উঠল, ভারী, শুকনো মাটির বিরাট ঢেলা ধপ করে মাটিতে পড়ল...

খুড়োর পর জরাজীর্ণ ছাদের ওপর ভয়ঙ্কর ঘা মারল জেনিশ, বহু বছরের অসহনীয় ভার থেকে তাকে মুক্ত করতে লাগল। আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে ছাদটা কেঁপে উঠল, ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ তুলল। বাড়ির ওপর উড়ল মিহি, শুকনো ধুলো।

দুপুর নাগাদ তারা কেবল একটি ঘরের মাটি, শুকনো ডালপালা আর কাঁচা ইট পরিষ্কার করে উঠতে পারল। জামার হাতায় ঘাম মুছে জানিবেক বাঁকা কড়িকাঠের ওপর পা ঝুলিয়ে বসে একটা সিগারেট ধরাল।

ভাইপো লাফিয়ে নীচে নেমে গেল, খালের দিকে চলল। জানিবেক ধীরেসুস্থে সিগারেট টানতে টানতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল, জেনিশ ময়লা কালো গেঞ্জিটা গা থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিল, ধুলো রগড়ে রগড়ে ধুতে লাগল, মুখ কুলকুচি করল। সুন্দর ছেলে, মানতেই হবে। কাজও জানে—এলোপাথাড়ি হাত চালায় না, কোদাল চালায় অব্যর্থ, হিসাব করে। চৌকস। ট্রান্সফর্মার চটপট মেরামত করে দিল, ফার্মের ইলেকট্রিক লাইন বদল করল—তার আগে সব সময় ফিউজ হত।

সিগারেটটা জ্বলতে জ্বলতে শেষ প্রান্তে এসে ঠেকেছে। জ্বলন্ত টুকরোটার ওপর থুতু ফেলে সে ছুঁড়ে মেরে ওটাকে নীচে পাঠিয়ে

দিল, উড়ে নীচে পড়তে দেখল। টুকরোটা গিয়ে পড়ল মাটির মিহি স্তরে ঢাকা একটা গোলাকার জিনিসের ওপর। জানিবেক অলস মনে ভাবল: 'এটা আবার কী? খড় আর মাটি দিয়ে এমন টুকরো হতে পারে না কি? রীতিমতো গোল, যেন ছেনি দিয়ে কাটা। না কি কাঠের বাটি, যেটা থেকে মা আমাদের ছেলেবেলায় খাওয়াতেন? দেখে মনে হয় না...' জানিবেকের মুখ ফেকাশে হয়ে গেল... 'রুটি!' সে চিৎকার করে বলতে গেল, কিন্তু কিছুতেই পারল না।

সে কড়িকাঠ থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল আবর্জনা স্তূপের ওপর, রুটিটাকে দুহাতে তুলে নিয়ে বুকে চেপে ধরল। হ্যাঁ, রুটিই বটে! সেই রুটি, যেটাকে মা চার বছর যত্ন করে রেখে দিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর ষোল বছর পূর্ণ হতে চলেছে। রুটিটাকে সযত্নে রেখে দিয়েছে আসিলকান। স্বামীর স্মৃতি, যে স্বামীর সঙ্গে তার থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল সামান্য কয়েকটি বছর — মোটে চার বছর।

রুটিটা সব সময় ঝুলত সবচেয়ে ভালো জায়গায়, একটা সাদা পুঁটলির ভেতরে। ওটা জঞ্জালের মধ্যে গড়াগড়ি যাচ্ছে কেন? আসিলকান কি তাহলে ওটাকে জায়গা থেকে তুলে নিতে ভুলে গেল? গতকালই ত আসিলকান এখান থেকে জিনিসপত্র সরাল! রুটিটাকে রেখে দিল কেন? এটা যে সেই আপনজনদের স্মৃতি, যারা যুদ্ধ থেকে আর ফিরে আসে নি! সে নিজেই এখানে ফেলে দিয়েছে কিনা কে জানে? ভাবতে পারে, নতুন বাড়িতে ঝুললেই বা ও দিয়ে লাভটা কী? তুলে রাখ আর না-ই রাখ, অক্ষত দেহে যাদের ফিরিয়ে আনার কথা তার ছিল তারা ত আর ফিরবে না...

যে রুটিটাকে সে এখন বুকে চেপে ধরে আছে তার কিনারায় তিনটে জায়গায় দাগ আছে, কামড়ে খাওয়ার দাগ। দুটো চিহ্ন জানিবেকের বড় ভাইদের, আর তৃতীয়টি তার নিজের, তৃতীয়টি তার দাঁতের চিহ্ন। বড় ছেলে — স্বল্পভাষী, ছিমছাম গড়নের সারিমসাক, তার চোখ দুটো ছিল গোল গোল, কপালের সামনের দিকে পড়ে থাকত কালো কুচকুচে চুলের গোছা। তাকে বিদায় দেওয়ার সময় মা নিজে

হাতে এই রুটি সেঁকেছিলেন। সারিমসাক যখন দৃপ্ত ভঙ্গিতে ঘোড়ায় চেপে বসল তখন মা তাকে রুটিটা হাতে দিয়ে খানিকটা কামড়ে খেতে বলেন:

'খোদা তোকে অক্ষত শরীরে, গোটা ফিরিয়ে আনুন, আজকের মতো তুই যেন আবার তোর নিজের বাড়িতে মা'র হাতের তৈরী খাবার খেতে পারিস...'

মেজো আর ছোট ছেলেকে বিদায় জানানোর সময় মা এই একই শুভেচ্ছা উচ্চারণ করেছিলেন, চোখের জল ফেলতে ফেলতে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন এই একই রুটি যেটা তাঁর কাছে এখন পবিত্র...

না, মা'র ইচ্ছে পূর্ণ হয় নি—সারিমসাক মারা যায় দূর দেশে—হাঙ্গেরির মাটিতে। হাসিখুশিতে ভরপুর, চটপটে কাদির মারা যায় আরও আগে, লেনিনগ্রাদের কাছাকাছি কোথাও। সে কোন বংশধর রেখে যায় নি, বিয়ে করারই অবকাশ পায় নি। মারা যাওয়ার সময় সে কি মনে করতে পেরেছিল যে বাড়িতে মা তার জন্য অপেক্ষা করছেন পবিত্র রুটি নিয়ে?

আর জানিবেক বার্লিন থেকে ফিরে এসেছিল অক্ষত দেহে, কিন্তু মা ততদিন বেঁচে ছিলেন না—বিজয়ের কয়েক দিন আগে তাঁর মৃত্যু হয়। মাতৃহৃদয় আর সহ্য করতে পারে নি। তার শয্যার শিয়রে সাদা রুমালের ভেতরে ঝুলত শুকিয়ে যাওয়া রুটি।

হাত পা ধুয়ে জিরিয়ে নেওয়ার পর জেনিশ খুলে নেওয়া দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারল ওপর অবধি জঞ্জালে ভর্তি ঘরের ভেতরে। খুড়ো দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে আছে, এক হাতে বুকে চেপে ধরে আছে পাথরের মতো জমাট শক্ত রুটি... অন্য হাত ঝোলানো, তাতে মুঠো করে আঁকড়ে ধরে রেখেছে পুরনো রুমাল। ধুলোবালিতে মাখা তার মুখের ওপর রেখা এঁকে দিয়েছে চোখের জল।

...দুমাস বাদে রুটিটাকে ঝুলতে দেখা গেল বড় ঘরের দেয়ালে টাঙানো গালিচার ওপর, একটা সাদা রেশমী রুমালের পুঁটলিতে। গণ্যমান্য অতিথিরা এলে এরই নীচে তাঁদের বসতে দেওয়া হয়...
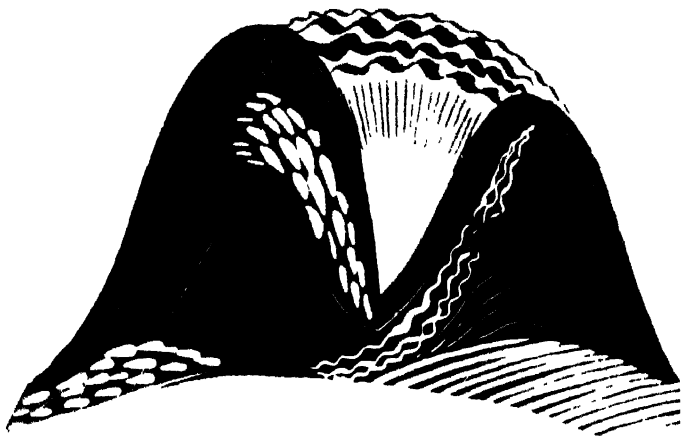
মুসা মুরাতালিয়েভ

কাছের পাহাড়

তোমোতোই ভোরবেলা শহর থেকে বেরিয়ে গেল। মোটরগাড়ি ভালোমতো গেলেও বারো ঘণ্টার কম সময়ে নিজের গাঁয়ে পেঁছুন যায় না। গতকাল কাজ থেকে এসেই সে তার 'মস্কভিচ্' গাড়ির তলায় শুয়ে পড়ে গাড়িটাকে খানিকটা মেরামত করে। তোমোতোই একা যাচ্ছে না। তার পাশে আছে স্ত্রী, পেছনের সীটে—ছেলে বেকেই।

তোমোতোই উদ্বিগ্ন, কিছুটা লজ্জিতও বটে। ছেলের বয়স এখন আট বছর, অথচ কর্মব্যস্ত বাপ এই প্রথম তার উত্তরাধিকারীকে বুড়োবুড়ির কাছে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছে।

স্ত্রী কতবারই না তাকে আকারে-ইঙ্গিতে বলেছে:

'বেকেইকে দাদুর বাড়ি দেখালে হত...'

যাক গে, যা হওয়ার হয়েছে। এখন ত ওরা যাচ্ছে।

উ'চু উ'চু পপ্‌লার গাছে রোদ-আড়াল-করা বড় রাস্তা থেকে তোমোতোই গাড়ি ঘোরাল ঘাসে ঢাকা পাড়াগে'য়ে রাস্তায়। এখানে ছিল তোমোতোইয়ের জন্মভূমি। এই মাটি সে ছোটবেলায় এদিক ওদিক চষে বেড়িয়েছে। কেবল রাস্তা নয়, যে কোন পায়ে-চলা-পথ ছিল তার নখদর্পণে।

কাঁচা রাস্তা ধরে গাঁয়ে যেতে সময় কম লাগে, তবে তোমোতোই কেবল এই কারণেই সে পথে গাড়ি ঘোরায় নি। পাড়াগে'য়ে রাস্তা অনেক আপন। বড় রাস্তা ত শহুরে ছাড়া আর কিছুই নয়। তার ইচ্ছে হচ্ছিল শহর থেকে বিশ্রাম নেয়।

পথটা বিস্তীর্ণ হয়ে যেতেই তাদের সামনে এসে হাজির হল পাহাড়ের শ্রেণী। একেবারেই কাছে ধামসানো লেপের মতো পড়ে আছে পাহাড়গুলির ঢাল। ঢালগুলো ছাইরঙা শৈলময় পাহাড়ের গায়ে ঠেস দিয়ে আছে, আর উ'চু উ'চু পাহাড়ের শ্রেণী গিয়ে মিশেছে নীল আকাশের গায়ে, তাদের উপরে ঝকঝক করছে হিমবাহ।

বেকেই এত কাছ থেকে পাহাড় আর কখনও দেখে নি, তাই সে নিজেকে সামলাতে না পেরে চে'চিয়ে বলল:

'বাবা দেখ!'

'পাহাড়...'

পাহাড় ত বটেই। কিন্তু বেকেই এটা শুনতে চায় নি।

'কিন্তু ওগুলো অমন কেন?'

'পাহাড় যেমন হয়ে থাকে তেমনি,' তোমোতোই জবাব দিল।

ঢালের ওপর দিয়ে ওরা গিরিখাতের ভেতরে গিয়ে পড়ল। পাহাড় আরও উ'চু ও বিশাল হয়ে দেখা দিল। বেকেইয়ের ইচ্ছে হচ্ছিল পায়ে হে'টে প্রাণপণে ছুটে যায় এই গম্ভীর দানবগুলোর দিকে, কিন্তু বাপের তাড়া ছিল, আর তাকে গাড়ি থামাতে বলার মতো ভরসাও বেকেইয়ের হল না।

গাঁয়ে প্রবেশ করল। গাড়ির গতিবেগ ঝট করে কমে গেল, গাড়ি এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল একটা ছোটখাটো নীচু বাড়ির সামনে।

গেটের সামনে -- দাদু আর দাদী। পরিষ্কার উঠান। সামোভার সোঁ সোঁ আওয়াজ করছে...

বাড়ির ভেতরটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, স্নিগ্ধ। দাদু কম্বলের আসনের ওপর বসলেন, বেকেইকে কাছে ডাকলেন। বেকেই ভয়ে ভয়ে এগিয়ে গেল। ঘরে অনেক লোকজন, সকলেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে তাকে, তোমোতোইয়ের ছেলেকে। দাদু খর দৃষ্টিতে চোখ কোঁচকাল।

'হ্যাঁ, তুই একেবারেই শহুরে,' নাতির মাথার চাঁদিতে চুমো খেয়ে তিনি বললেন। 'তা সুখে থাক ভাই। আল্লাহ্ তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন। যাও বাচ্চাদের সঙ্গে গিয়ে ছোটাছুটি কর গে যাও।'

বেকেইয়ের শোনার ইচ্ছে ছিল লোকে কী কথাবার্তা বলে, কিন্তু দাদী তাকে অন্য ঘরে নিয়ে গেলেন। তিনি ওকে আদর করেন, চুমো খান আর বলেন:

'বাছা রে আমার, আমাদের এখানে তোর ভালো লাগছে? তুই আমাদের সঙ্গে থাকবি? না কি আবার চলে যাবি?'

'মা থাকবে?'

'আমাদের দরকার তোকে!'

'মা'কে ছাড়া আমি থাকতে পারব না।'

নাতির উত্তর দাদীর ভালো লাগে, তিনি ওকে নিয়ে মজা করতে থাকেন।

'আমাদের মনে দুঃখু দিস নি রে বেটা!' তিনি বললেন। 'থেকে যা। আমরা একসঙ্গে ভেড়ার বাচ্চা মাঠে চরাব। ফল পারতে যাব।'

'ঘোড়ার দুধ খাওয়া যাবে?'

'হ্যাঁ, তা-ও হবে।'

বেকেই বিবেচনা করতে থাকে, কিন্তু দাদীর ডাক পড়ে। তাঁর এখন অনেক কাজ — বাড়িতে অতিথি।

বেকেই রাস্তায় বেরিয়ে আসে। মা কমবয়সী মহিলাদের মাঝখানে। ওরা কথাবার্তা বলছে, ওদের খুশি খুশি দেখাচ্ছে। কিন্তু মেয়েলি কথাবার্তায় বেকেইয়ের কোন কৌতূহল নেই।

'মস্ক্‌ভিচ' গাড়িটার সামনে এক দঙ্গল বাচ্চা এসে জুটেছে। বেকেইকে দেখতে পেয়ে গাড়ি ছেড়ে দিয়ে ঘিরে ধরল 'শহুরে' ছেলেটাকে। বেকেই গেটে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল, তার ভঙ্গিতে গর্ব ফুটে বেরোচ্ছে। বাপের গাড়ি, মানে তারও—বেকেইয়েরও গাড়ি। একটা ছেলের মাথার সামনের কড়া চুলের গোছা খাড়া খাড়া হয়ে আছে। সে কোন রকম ভক্তিশ্রদ্ধার তোয়াক্কা না করে হঠাৎই জিজ্ঞেস করে বসল:

'তুই কার ছেলে রে?'

'আমি তোমোতোইয়ের ছেলে।'

'তোর নাম কী?'

'বেকেই।'

'মিছে কথা বলিস না। বেকেই হলাম আমি।'

ছেলেরা সবাই হো হো করে হেসে উঠল। বেকেই ভুরু কোঁচকাল, কিন্তু মারামারির মধ্যে গেল না, সে নিজেকে সামলে নিল।

'মিছে কথা বলিস না। বেকেই হলাম আমি।'

'আমি এখন পাহাড়ে যাব!' ও বলল।

'যা! পাহাড় অবধি পোঁছুতে পারলে ত!'

বেকেই চলল। আর কী-ই বা করার ছিল ওর? ও ত পাহাড়েই যেতে চেয়েছিল।

ছেলেদের টনক নড়ল: অতিথিকে অপমান করা হয়েছে। ওরা ওর পেছন পেছন ছুটল, ওর নাগাল ধরল।

'আমাদের গাড়িতে চাপিয়ে ঘোরা!'

'আরে ও চালাতে পারে না।'

'পারে। শহরের ছেলেরা পারে। ঘোরা না!'

'আমার কাছে চাবি নেই,' বেকেই গম্ভীরভাবে বলল। 'আমার সঙ্গে পাহাড়ে চল।'

'কেন?'

কেন তা বেকেই জানত না। সে চুপচাপ চলল। ছেলেরাও পাশে পাশে হাঁটতে হাঁটতে চলল।

'আরে পাহাড় অনেক দূরে, গাড়িতে যেতে হয়!' কে যেন বলল।

'দূরে কেন? ঐ ত,' বেকেই জোর দিয়ে হাত উঁচিয়ে বলল--যেন কাছের পাহাড় সে এখনই ছুঁতে পারে।

ছেলেরা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। এদিকে বেকেই পায়ে-চলা-পথ ধরে চলল তার কাছের পাহাড়ের দিকে। গাঁ পিছে পড়ে রইল। অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। দুধারে উড়তে লাগল রাত-জাগা পাখিরা। বিশাল বিশাল, কালো কালো। বেকেই ক্লান্ত হয়ে পড়ল, অথচ পাহাড় এখনও এগিয়ে এলো না। সে একটু দাঁড়াল, ভাবল, তারপর হঠাৎ চূড়ার দিকে তাকিয়ে ছুটতে শুরু করল। অনেকক্ষণ ছুটল, ছুটতে ছুটতে কপালের দুপাশের রগ টনটন করতে লাগল। পাহাড় কাছেই, কিন্তু হাত দিয়ে তাকে ছুঁতে গেলে আর কত ছোটা দরকার?

বেকেই চিৎকার-চেঁচামেচি শুনতে পেল। তাকে তখন লোকে খুঁজছে।

'রাতের বেলায় কি কেউ পাহাড়ে যায়?' দাদী কাতর স্বরে বললেন।

'কিন্তু পাহাড় ত কাছেই।' বেকেই উত্তেজিত হয়ে বলল। 'তাকিয়ে দেখ, কাছে! কিন্তু ওখানে যেতে এতক্ষণ লাগে কেন?'

'কেননা এই পাহাড়গুলো অনেক উঁচু। তুই ওখানে যাবি 'খন!'

বেকেই চোখ কুঁচকে সবচেয়ে উঁচু গোলাপী চূড়াটার দিকে তাকাল। তার ওপরে আরও উঁচুতে উঠেছে সবার প্রথম, সবচেয়ে জ্বলজ্বলে তারাটি।

আমান সাসপায়েভ

কটা কুকুর

এই কটা কুকুরটা কোন দিন খেঁকিয়ে উঠেছে, কিংবা কোন বাড়ির গিন্নি তাকে পাঁজরে ঢিল ছুঁড়ে মারতে অন্তত যন্ত্রণায় কিঁউ কিঁউ করে উঠেছে এমন আমি কোন দিন শুনি নি। এই ব্যাপারটা আমাকে একটু ভাবিয়েই তোলে।

সামান্য একটা কুকুর হয়ে এই প্রাণীটি কীভাবে এতটা সংযম, এতটা সহ্যশক্তি ও সহিষ্ণুতা দেখাতে পারে তার ব্যাখ্যা দেওয়া কঠিন। এক কথায়, জীবন সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী এই জীবটির আচরণ ব্যাখ্যা করতে গেলে মনে হয় যে সে নেহাৎই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। দৈনন্দিন জীবনে যে সব দুঃখকষ্ট তাকে অনবরত সহ্য করতে হয় তা বোধ হয় ওর মন ভেঙ্গে দিয়েছে, তাকে করে ফেলেছে নির্বিবাদী আর আশেপাশের সব কিছুর প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন।

যাঁরা মনে করেন যে এ ধরনের নম্রতা ওর চরিত্রের জন্মগত ত্রুটি,

তাঁদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আমি একমত নই। কটা কুকুরটাকে নিরীক্ষণ করে দেখলে, তাকে ভয়ে ভয়ে চারদিকে দৃষ্টিপাত করতে দেখে বুঝতে বাকি থাকে না যে এই হতভাগ্য জীবটি দারুণ ভীতসন্ত্রস্ত। বেচারা কেবল যে মানুষ আর জীবজন্তুকেই ভয় করে তা নয়, সবুজ ঘাসের দিকেও সতর্কতার সঙ্গে তাকায়।

শেকলে বাঁধা কুকুরগুলো যে কোন কুকুরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য মুখিয়ে থাকে। তারাও রাতে দৈবাৎ কটার দেখা পেলে এমন ভাব করে যেন তাকে লক্ষ্যই করে নি। অথচ সচরাচর যে কোন কুকুর, তা সে যেমনই হোক না কেন, রাস্তার ছাড়া-কুকুর দূর থেকে দেখতে পেয়ে নির্ঘাত ভয়ঙ্কর তর্জন-গর্জন করতে করতে ধেয়ে যাবে—যেন অচেনাটাকে ধরাধাম থেকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য প্রস্তুত। সেটার কাছে ছুটে গিয়ে প্রথম প্রথম ছলাকলা করবে, তারপর লেজ খাড়া করবে এবং আগন্তুকটার শরীর শুঁকতে থাকবে। এই অভ্যাসগুলোর কথা কারই বা না জানা আছে? কিন্তু কটা কুকুরটা দৈবাৎ কোন কুকুরছানার মুখোমুখি পড়ে গেলেও উদাসীন থেকে যায়। তার কাজের মধ্যে কাজ ছিল সাবধানে পা টিপে টিপে খাবারের গন্ধ খোঁজা কিংবা চিরকাল ভিজে থাকা লাল টকটকে নাকের ডগা দিয়ে আবর্জনার গর্ত ঘাঁটাঘাঁটি করা।

এই কুকুরটার আচরণ ছিল অস্বাভাবিক। কোন একটা বিশেষ লক্ষ্যের দিকে সে চলেছে এমন কেউ দেখে নি। কোথাও যেতে যেতে সে অকস্মাৎই একপাশে মোড় নিয়ে বসবে। সে যেখানেই অনবরত দুদণ্ডের জন্য যাওয়া-আসা করুক না কেন কিংবা অনেকক্ষণের জন্য পড়ে থাকুক না কেন, মনে ধরার মতো কোন জায়গা তার ছিল না... কখনও তাকে দেখা যেত পরিত্যক্ত উঠোনে, কখনও রাস্তায়, কখনও বা দেউড়িতে। এমন কি গ্রীষ্মকালে, কাঠফাটা দুপুরেও সে কখনও জিভ বার করে কোন গাছের ছায়ায় শুয়ে থাকত না।

দুনিয়ায় কটা কুকুরটার অস্তিত্ব আদৌ আছে কি? এ নিয়ে আমাদের পাড়ার পুরুষ অধিবাসীদের কারও কোন মাথাব্যথা নেই।

তবে তল্লাটের মহিলারা সকলেই এই কুকুরটাকে জানত, ওকে ঘেন্না করত, তারা ওর নাম দিয়েছিল 'কটা চোর'।

মহিলারাই ওকে মারতে মারতে উঠোন থেকে তাড়িয়ে দিত।

এই হতভাগ্য জীবটাকে কীভাবে রাস্তায় খেদিয়ে দেওয়া হত তা আমার প্রায়ই চোখে পড়ত, কিন্তু সে তৎক্ষণাৎ প্রহারের কথা ভুলে গিয়ে নিজের দুর্বল চরিত্রবশত, যেন কিছুই হয় নি এইভাবে দিব্যি আগের মতো মাথা নীচু করে ঘুরে বেড়াত।

ওকে যারা খেদিয়ে দিয়েছে তাদের দিকে ও একবারও যদি ফিরে তাকাত। 'দেখে লাভ কী? এর কি কোন প্রয়োজন আছে? এতে লাভ কী?'--এ সব ক্ষেত্রে কটা কুকুরটার মনোভাব যেন অনেকটা এই রকম। সম্ভবত তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এই যে ওর পেছন পেছন কেউ ছুটবে না, কেন না তাকে মারধোর ও গালাগালি করার পর তার পিছু ধাওয়া করেছে এমন ঘটনা ঘটে নি।

'ভাগ এখান থেকে!' এই কর্কশ চিৎকার ঝোলা কানে যেতে চিৎকারটা তারই উদ্দেশ্যে করা হয়েছে বুঝতে পেয়ে সে মাথা নীচু করে সরে পড়ে।

কখনও কখনও সে যখন এমন কোন উঠোনে এসে পড়ে, যেখানে গৃহকর্ত্রী এই সময় কাপড় কাচছে, কটা তখন ঠাহর করে দেখার চেষ্টা করে মহিলা ময়দা মাখছে কি না। মহিলা যদি কাঠ কাটে তা হলে সে তার গতিবিধি লক্ষ্য করে, যেন অপেক্ষা করতে থাকে কখন সে চেঁচিয়ে ওকে বলবে: 'দূর হ!' একমাত্র কথা হচ্ছে কুকুরটা যে একঠায় এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে তা থেকেই তার ঔদাসীন্যের পরিচয় মেলে।

এমন কি যদি সে কিছু চুরি করার চেষ্টা না-ও করে, একমাত্র তার উপস্থিতিই সন্দেহ ও বিরক্তি উদ্রেকের পক্ষে যথেষ্ট।

দেখা যাচ্ছে এই কটা কুকুরটা একেবারেই অসহায় প্রাণী, না কুকুরসমাজের , না লোকসমাজের বিন্দুমাত্র উপকার করার ক্ষমতা তার নেই। সে যদি তার স্বজাতীয়দের অনুকরণ করত, তাদের সমাজকে

এড়িয়ে না চলত তাহলে বলা যেত সে তার সমগোত্রীয়দের সঙ্গে মেলামেশা করে এবং কুকুরসমাজের সাধারণ কর্তব্য পালন করছে।

আর ওর থেকে মানুষের উপকার যে কত কম তা কি আর বলতে? শোনা যায়, কটা কুকুরটা যখন একেবারেই বাচ্চা ছিল তখন কে যেন তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসে। তারপর কুকুরছানা বড় হতে তার মধ্যে পাহারাদার কুকুরের উপযোগী ক্রোধ সঞ্চারের উদ্দেশ্যে তাকে শেকলে বেঁধে রাখা হল। কিন্তু শত চেষ্টা সত্ত্বেও কটা কুকুরকে দিয়ে সে আশা পূর্ণ হল না।

প্রভু তাকে খেতে দিলে সে খেত, ভুলে গেলে কটা কুকুর তার নিজের কথা মনে করিয়ে দিত না, সকাল থেকে সন্ধে অবধি চুপচাপ নিজের খোঁড়লে পড়ে থাকতে পারত। ভুলেও একবার যদি তারস্বরে ডাক ছাড়ত, গর্জন তুলে প্রভুর আনন্দ বর্ধন করত! প্রভু ওকে নিয়ে কত ঝামেলা, কত কষ্টই না করল, কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা!

প্রভু ওর বাঁধন খুলে দিয়ে বাড়ি থেকে খেদিয়ে দিল।

ওকে নিয়ে প্রভুর পরিবারের লোকদের মধ্যে তর্কবিতর্ক উঠল। কেউ কেউ বলল যে কটা প্রাণীটা বোবা, তার প্রমাণ হিশেবে তারা যে যুক্তি দেখাল তা সকলের কাছে পরিচিত—অর্থাৎ ওর নীরবতা। যারা এর বিপরীত মত পোষণ করত তারা তাদের স্মৃতি থেকে বলল যে এই কুকুরটা যখন বাচ্চা ছিল তখন সে মা'র জন্য মনমরা হয়ে করুণ স্বরে কিঁউ কিঁউ করত। তাদের এও মনে পড়ে যে বহুকাল আগে কবে যেন সে ডাকারও চেষ্টা করেছিল। তাই মোটামুটিভাবে সকলে শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে এলো যে কুকুরটার গলা আছে।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে এই ঘরছাড়া প্রাণীটাকে যে দেখতে পেত সে-ই তার প্রতি সমবেদনাবশত মনে মনে চিন্তা করত যত তাড়াতাড়ি তার মরণ হয় ততই ভালো: অমন জীবনের চেয়ে বেঁচে না থাকা ভালো! সুতরাং জীবটি যে একেবারেই অকেজো এটা সকলের কাছে স্পষ্ট। যে কোন গাছপালা নিজেদের বংশধারা বজায় রাখার জন্য বীজ দেয়, বাধাবিপত্তি জয় করে সূর্যকিরণের দিকে নিজেকে

বাড়িয়ে দেয়; প্রতিটি গাছের কাণ্ড চেষ্টা করে পাশের গাছের মাথা ছাড়িয়ে যেতে। এ নিয়ে যত ভাবি ততই নিজের প্রতি এতটা অবহেলার জন্য কুকুরটাকে কিছুতেই যেন ক্ষমা করতে পারি না!

গাঁয়ের এক প্রান্তে বুড়োবুড়িদের বাসের জন্য নির্দিষ্ট এক ভবনের পাশে বাস করত এক থুড়থুড়ে বুড়ি। সে গল্প করে যে একবার নাকি জাগ্রত অবস্থায় সত্যিকারের ডাইনী দেখতে পায়। তার গল্প শুনে লোকের হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যায়। জ্বালানির জন্য বুড়ো বাগানে শুকনো ডালপালা কেটে রেখে দিয়েছিল, বুড়ি এক দিন সেগুলো যোগাড় করে আনার উদ্দেশ্যে উঠোনে বেরিয়ে আসতে বেড়ার ধসে পড়া জায়গার ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলোয় দেখতে পেল সাদা পাগড়ি মাথায় এক ডাইনীকে। ডাইনীটা তাকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল, তারপর ধীরেসুস্থে বেড়ার আড়ালে মাথা লুকিয়ে ফেলল। বুড়ির আর তখন শুকনো ডালপালার কথা ভাবার মতো মনের অবস্থা নেই, তার মনে হল নেহাৎ বরাতজোরে বিকট মূর্তিটার খপ্পর থেকে সে বেঁচে গেছে, ভয়ে ফেকাসে হয়ে, প্রায় দাঁতকপাটি লাগা অবস্থায় সে বাড়িতে ছুটে গেল। বুড়ো বিড়বিড় করে প্রার্থনা আওড়াতে আওড়াতে দরজার বাইরে বেরিয়ে আসে। বেরিয়ে এসে দেখে যে বেড়ার ধসে পড়া অংশ দিয়ে যেন সন্দেহজনক কিছুই ঘটে নি এমন ভাব করে তাদের উঠোনের দিকে তাকিয়ে আছে সকলের পরিচিত কটা কুকুর।

'খোদাতাল্লার রহমতে আমার বিবি গর্ভবতী নয়, নইলে নির্ঘাত গর্ভপাত হত,' স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বুড়ো বলল। তার সারা জীবনের সাধ ছিল একটা বাচ্চার মুখ দেখা।

নিজের এই ঠাট্টায় মনে মনে সন্তুষ্ট হয়ে সে স্ত্রীর কাছে ফিরে এলো। বুড়ি যখন শুনতে পেল যে সে তার চোখের সামনে যেটাকে দেখেছিল সেটা মোটেই ডাইনী নয়, ঘরছাড়া কটা রঙের প্রাণীটা, তখন তার মনের মধ্যে যত রাগ আর বিক্ষোভ জমা হয়ে ছিল তার সমস্তটা গিয়ে পড়ল ঐ কটা কুকুরটার ওপর।

ঠিক এই সময় কোন একজনের মুরগীর ঘর থেকে ডিম উধাও হয়ে যেতে লাগল আর বেড়ার গায়ে ঝোলানো ছানার পোঁটলাগুলো ছিন্নভিন্ন অবস্থায় ঘাসের মধ্যে পড়ে থাকতে দেখা গেল। এই অতি সাধারণ তুচ্ছ সংবাদ বিদ্যুৎগতিতে পাড়ায় ছড়িয়ে পড়ল।

যে মহিলার ছানার পোঁটলা নষ্ট হয়েছে, 'সাদা পাগড়ি মাথায় ডাইনীকে' দেখার পর বুড়ি গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করল। বুড়ি জোর দিয়ে বলল যে এটা কটা কুকুর ছাড়া আর কারও কাজ নয়—সে-ই বস্তা টেনে নামিয়ে ছানা খেয়ে ফেলেছে, তারপর নতুন কোন কিছুর মতলবে অন্য কোথাও রওনা দিয়েছে। এখানে বলে রাখা দরকার যে ঝোপের আড়ালে ছানা দিয়ে ভোজ সারছিল সম্পূর্ণ অন্য একটা কুকুর, আর কটা কুকুর তখন নালার ধারে ঘুরে ঘুরে আবর্জনাস্তূপ ঘেঁটে ঘেঁটে নিজের খাবারের ভাগ খুঁজে বার করছিল।

যে মহিলার ছানা নষ্ট হয়েছে সে যখন চুরি করা ছানার সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ ঝোপের কাছে এসে পড়ায় তার নীচে নিজের পোঁটলাব ছেঁড়া কাপড় দেখতে পেল ঠিক সেই মুহূর্তে খাবারের গন্ধ পেয়ে কটাও সে দিকেই আসছিল। মহিলাকে আর বেশিক্ষণ ভাবনাচিন্তা করতে হল না—সে সঙ্গে সঙ্গে ভবঘুরেটাকে শাপশাপান্ত করতে লাগল আর সজোরে ওর দিকে পাথর ছুঁড়ে মারল। মহিলা তাকে মিছিমিছিই আঘাত করল। কটা কুকুরটা অপমানকারিণীর দিকে ফিরে তাকানোরও প্রয়োজন বোধ করল না। সে সচরাচর যেমন করে থাকে, তেমনি ভুক্তাবশেষের সন্ধানে আরও দূরে এগিয়ে গেল।

এই ঘটনার পর বেজায় চোর বলে কটা কুকুরের দুর্নাম রটে গেল। স্থানীয় লোকজনের কাছে ঘরছাড়া প্রাণীটা জঘন্যতম জীবের চেয়েও ঘৃণ্য হয়ে দাঁড়াল।

ব্যাপারটা যে রকম মারাত্মক মোড় নিল তাতে শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে গড়াতে পারে তা কটা কুকুর ভাবতেও পারে নি। সে আগের মতোই আশেপাশের কারও দিকে মন না দিয়ে ধীরেসুস্থে ঘোরাফেরা করতে লাগল। যে সব চোখের নজর কুকুরটার ওপর পড়েছে তা থেকে

চোখের অধিকারীদের মতলব আঁচ করার মতো ক্ষমতা আর কুকুরের কোথায় ?

আমাদের রাস্তায় এমন সব কুকুরও ঘুরে বেড়ায় যারা কেবল মুরগীর ডিম নয়, মুরগীও চুরি করে। প্রভুরা যা খেতে দেয় এই কুকুরগুলো তাতে সন্তুষ্ট নয়। চুপে চুপে হাতানো সমস্ত জিনিস এই পেটুকদের বেশি পছন্দ। চুরি করে যা জুটল তা গেলার পর এ ধরনের কুকুর নিজের ধূর্ততায় মনে মনে খুশি হয়ে গম্ভীর ও ভারিক্কি চালে রাস্তায় চলাফেরা করে।

এই কুকুরগুলোকে আশ্চর্য ক্ষমতাবলে কোন কিছুর গন্ধ টের পেয়ে কখনও এখানে কখনও বা ওখানে ছুটতে দেখে মাথায় বিষণ্ণ চিন্তা ভর করে। আবার তার উল্‌টোটাও হতে পারে, যখন দীর্ঘ ভাবনাচিন্তার পর আপনা আপনি এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে কুকুর তার স্বভাবচরিত্রের জন্যই 'কুকুর' নামে পরিচিত তখন মন হালকা হয়ে যায়।

সুতরাং যে সমস্ত পাহারাদার কুকুর অন্যের মুরগীর ঘরে কিংবা চালাঘরে সত্যি সত্যিই ছোঁক ছোঁক করে বেড়াত তাদের চাতুরীর জন্য সম্পূর্ণ নির্দোষ কটা ভবঘুরেটার ডাক নাম হয়ে গেল 'চোর'। অথচ সকলেরই এটা বেশ ভালোমতো জানা ছিল যে চুরির ব্যাপারে দোষ কটার নয়। তাই পাওয়া কুকুরগুলোর মালিকদের সঙ্গে সম্পর্ক যাতে খারাপ না হয় সেই উদ্দেশ্যে বাড়ির গিন্নিরাও মাংসের শেষ হাড়গোড় আর খাবারের অবশিষ্টাংশ দিয়ে ঐ কুকুরগুলোকে আপ্যায়ন করত।

যে মহিলার ছানা লোপাট হয়ে গিয়েছিল, সে-ই একদিন আবিষ্কার করল যে তার মুরগীর ঘরে কোন এক কুকুর ঢুকেছিল—দুটো ডিম ভাঙা আর খাওয়া। বাড়ির কর্তা তাদের নিজেদের কুকুরকে ঠোঁট চাটতে চাটতে মুরগীর ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে। নতুন চুরি সম্পর্কে স্বামীর কাছে অভিযোগ জানাতে গিয়ে গিন্নি সন্দেহ প্রকাশ করল যে এবারেও কটাটারই দোষ। স্বামী তার কথায় আপত্তি তুলল, যা যা স্বচক্ষে দেখেছে তা বলল।

ঘটনাক্রমে যে সব লোক পাশ দিয়ে যাচ্ছিল তারা কথাবার্তায় হস্তক্ষেপ করল এবং বাড়ির গিন্নির মত সমর্থন করল একমাত্র এই কারণে যে চুরির ব্যাপারে সে কটাকে সন্দেহ করে। আর বাড়ির কুকুরকে শিক্ষা দিয়েছে ত কর্তা নিজে, সে কিছু চুরি করেছে এমন কি কেউ কখনও দেখেছে?

সুতরাং চুরির ব্যাপারে কটা দোষী সাব্যস্ত হল... পাহারাদার কুকুরদের বদনাম দেওয়ায় কারই বা গরজ থাকতে পারে? বাড়ির পোষা কুকুরকে দোষ দেওয়ার চেয়ে ভবঘুরের ওপর দোষ চাপানো অনেক সহজ!

শেষকালে বাড়ির কর্তা বন্দুকে গুলি ভরল, যে 'কটা চোরটা' এতটা বিরক্তির কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে তাকে খতম করার উদ্দেশ্যে তার সন্ধানে রওনা দিল। এদিকে কটা কুকুর কোন কিছু সন্দেহ না করে অলসভাবে আবর্জনাস্তূপের ওপর ঘোরাঘুরি করতে থাকে, তার যে নাক খাবারের গন্ধ ছাড়া আর কিছুই টের পায় না, তাই দিয়ে আবর্জনায় গর্ত খোঁড়াখুঁড়ি করতে থাকে। গুলিভরা বন্দুক হাতে মানুষটি মুখপোড়া কুকুরটাকে যেখানে পাওয়া যেতে পারে বলে ভেবেছিল ঠিক সেখানেই পেয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আলগোছে বসে পড়ে তাকে তাক করল। কটা কুকুরটা মাথা ঘুরিয়ে বন্দুকের ওপর চোখ রাখল, একবার ভাবলও না, "এই লোকটা কেন আমাকে এত মন দিয়ে দেখছে?" ঠিক সেই মুহূর্তে গুলির আওয়াজ হল। কটা কুকুরটা ডাক ছেড়ে মাটিকে পড়ে গেল।

এখন আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে এই ডাকটাকে সে সবচেয়ে দামী ও গুরুত্বপূর্ণ জিনিসের মতো নিজের শেষ মুহূর্তের জন্য সযত্নে রক্ষা করে আসছিল। এক সময় যখন কটা কুকুরের পাঁজরা লক্ষ্য করে পাথর ছোঁড়া হত তখন যদি সে গলা ছেড়ে আওয়াজ দিত তা হলে হয়ত সে নিজের অজানতেই কঠিন মুহূর্তেও খেঁকিয়ে উঠতে পারত। এইভাবে কখনও চেঁচিয়ে, কখনও খেঁকিয়ে সে বেঁচে থাকতে পারত। তা হলে হয়ত বা এমন শোচনীয় মৃত্যু সে এড়াতে পারত।

সত্যি কথা বলতে গেলে কি কেঁউ কেঁউ ডাকটাও যে প্রতিরক্ষার একটা উপায় তা বুঝতে না পেরে এই হতভাগা কুকুরটা বেঘোরে মারা গেল। গুলির আওয়াজ হতে ঘটনাস্থলে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলো সেই পাহারাদার কুকুরটা যে ডিম চুরি করে খেয়ে প্রভুর চোখের সামনে ঠোঁট চাটতে চাটতে মুরগীর ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল। কটা কুকুরটাকে মরণযন্ত্রণায় দাঁত খিঁচোতে দেখে সে জোরে ডেকে উঠল।

কটার খতম হওয়ার সংবাদে বাড়ির গিন্নিরা সন্তুষ্ট হল, এমন কি বেশ খুশিই হল বলা চলে। কিন্তু পর দিনই আবার দেখা গেল ছানার পোঁটলা আর কয়েকটা ডিম খোয়া গেছে। এটা কটা কুকুরের প্রতিহিংসাপরায়ণ প্রেতাত্মার চাতুরী হলেও হতে পারে—জানি না...

রোজা রিস্কেল্‌দিনোভা

আংটি
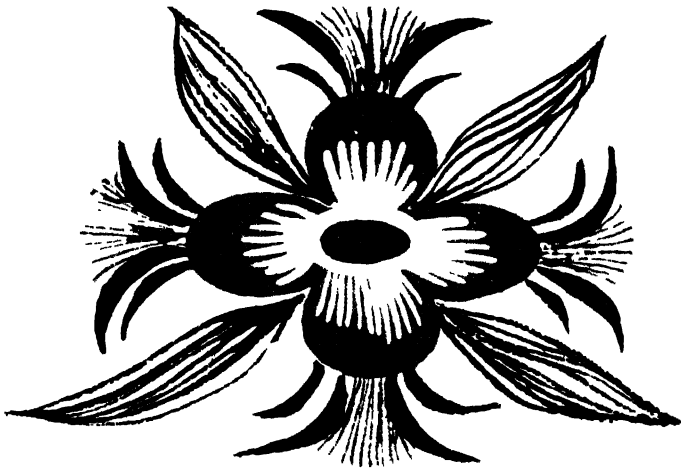
জামাল যে ট্রেনে কণ্ডাক্টারের কাজ করত সেটা নিয়মিত মস্কো-ফ্রুঞ্জে রুট ধরে ফিরছিল।

জামাল রাতে ডিউটিতে ছিল, দিনের বেলায় ঘুমিয়ে ছিল; সন্ধে নাগাদ আড়িমুড়ি ভেঙ্গে হাই তুলল। চুলে তখনও চিরুনি পড়ে নি। আলুথালু চুল নিয়েই সে করিডরে বেরিয়ে এলো। করিডর খালি, তবে কোলাহলে পূর্ণ—বহু কুপে থেকে টুকরো টুকরো কথাবার্তা, খুশির চিৎকার আর দমকা হাসি ভেসে আসছিল।

যাত্রীদের অসাধারণ চাঞ্চল্যে জামাল অবাক হয়ে গেল। তার ঘুম ঘুম ভাব তখনও কাটে নি। সে একটা কোলাপ্‌সিবল সীটে বসে পড়ে বিন্দু বিন্দু বাষ্পে ঘামা কাচের ভেতর দিয়ে মেঘে ঢাকা ছাইরঙা আকাশের দিকে তাকাল।

সন্ধ্যা নেমে এসেছে। পাশ দিয়ে ছুটে চলেছে একঘেয়ে ন্যাড়া মাঠ, কালো কালো, একঘেয়ে খুঁটি।

এমন সময় ভেসে উঠল উলঙ্গ গাছপালার দেহরেখা, জানলার উজ্জ্বল আয়তক্ষেত্র-- যে গাঁয়ের সীমানা ভেদ করে ট্রেন ছুটে চলেছে, তার ছোট ছোট বাড়িগুলোয় ইতিমধ্যে জ্বলে উঠেছে আলো।

জামাল তখনও বুঝে উঠতে পারে নি, কোন জায়গার ওপর দিয়ে তারা চলেছে, এমন সময় তার পেছন থেকে শোনা গেল বদলি মহিলার কণ্ঠস্বর:

'পরের স্টেশন...'

জামাল তার পার্টনারের দিকে ফিরে তাকাল।

আন্না পেত্রোভ্না--মোটাসোটা, লম্বা, কটা ধরনের চুল জামালের চেয়ে অন্তত বছর দশকের বড়: পঁয়তাল্লিশে পড়েছে। জামালের মনে হল আজ যেন আন্না পেত্রোভ্না বিশেষ ক্লান্ত-- মুখটা সামান্য ফোলা ফোলা, ঠোঁটের দুই কোণ কেমন যেন নেমে গেছে, দৃষ্টিতে ঔজ্জ্বল্য নেই।

আন্না পেত্রোভ্নার হাতে ধরা আছে ঝাঁটা আর নিশান।

'শুয়ে পড়ুন, আপনার জিরোন দরকার,' জামাল রুশীতে বলল, 'এখন আমার পালা।'

'ঠিক আছে,' আন্না পেত্রোভ্না সাড়া দিয়ে বলল।

দুই মহিলাই কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ জানলা দিয়ে চেয়ে রইল। পরে জামাল মাথা ঝাঁকিয়ে কুপের হৈ হট্টগোলের দিকে ইঙ্গিত করল।

'ওখানে কী হচ্ছে?'

'ওঃ, সে ত হবেই।' আন্না পেত্রোভ্না হাসল। 'পুরুষেরা মহিলাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছে... আজ যে আটই মার্চ।'

'আচ্ছা, আচ্ছা! আটই মার্চই ত বটে। কত তাড়াতাড়িই না সময় চলে যায়। ফ্রুঞ্জে থেকে যখন আমরা বেরিয়েছিলাম তখন ছিল পয়লা তারিখ।'

আন্না পেত্রোভ্না হাই তুলল। তার চোখের পলকে জলের ফোঁটা দেখা গেল।

'আচ্ছা, চললাম, জিরোই গে,' সে আবার কথা বলল। 'আমি হয়রান হয়ে পড়েছি, একটু শুতে ইচ্ছে করছে।'

আন্না পেত্রোভ্না জামালের হাতে নিশান আর ঝাঁটা তুলে দিয়ে কন্ডাক্টারদের কুপেতে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

জামাল অনেকক্ষণ একেবারে একা একা করিডরে বসে রইল, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে কামরা ধরে এগিয়ে চলল। যে সব কুপেতে বড় বেশি গোলমাল হচ্ছিল মাথা দোলাতে দোলাতে সে রকম কয়েকটি কুপে পার হয়ে সে কোন ভাবনাচিন্তা না করে একটার দরজা খুলে ফেলল। কুপেতে ঠাসাঠাসি করে আছে অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা—রুশী আর কির্গিজ। সকলেই পানোৎসবে মেতে আছে। তামাকের ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়েছে, জানলার পাশে টেবিলে স্তূপাকার হয়ে পড়ে আছে মদের বোতল আর খাবারের ভুক্তাবশেষ।

জামাল রক্তিম ছোপ ধরা চঞ্চল মুখগুলোর দিকে তাকাল, অজানতে নিজেও হাসল, অনেকক্ষণ ধরে যাত্রীদের লক্ষ্য করতে লাগল।

তার আগমন কেউই লক্ষ্য করল না।

'সালাম আলেকুম,' সে বলল, 'শুভেচ্ছা জানবেন!'

'ধন্যবাদ!' উত্তরে শোনা গেল।

সাড়া দিল একটি মেয়ে—রুশী। সে বসে ছিল ওপরের বার্থে, কুপের আর সকলের কথাবার্তা উৎসাহভরে শুনতে শুনতে সে জোরে জোরে হাসছিল। তারই মাঝখানে একবার হাঁপ ছেড়ে সে জামালের দিকে এক ঝলক তাকাল, পরক্ষণেই মুখ ফিরিয়ে নিল—তরুণী যাত্রীটির হাসি আবার সকলের হৈ হট্টগোলের মধ্যে গিয়ে মিশল।

জামাল একটু দাঁড়িয়ে থাকল, পাল্টা শুভেচ্ছার অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু তার উপস্থিতি আগের মতোই কারও নজরে এলো না। অস্বস্তি বোধ করতে সে পিছু হটে করিডরে বেরিয়ে এলো।

আর কাউকেই উৎসবের অভিনন্দন জানানোর ইচ্ছে তার রইল না, অন্যের কুপের দরজা খোলার ইচ্ছেও তার চলে গেল।

তা সত্ত্বেও একটা কুপে তার মনোযোগ আকর্ষণ না করে পারল না। দরজার ওপাশ থেকে না হাসির শব্দ, না কথাবার্তা—কিছুই কানে আসছিল না। সে ধীরে ধীরে হাতলের দিকে হাত বাড়াল।

কুপেতে ছিল দুজন যাত্রী। এক কোণে গুটিসুটি মেরে বসে ছিল এক থুরথুরে বুড়ি। কোঁচকানো তার চেহারা। বুড়ির কোলে পাঁচ-ছয় বছরের একটি মেয়ে—মনে হয় নাতনী। বাচ্চাটা ঘুমোচ্ছিল আর দিদিমা অন্ধকারের মধ্যে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল পর্দাখোলা জানলার দিকে।

জামালের আগমন এখানেও অলক্ষিত রয়ে গেল।

'সেলাম আলেকুম!' সে চাপা গলায় বলল। তার শান্ত স্বরে উচ্চারিত কথাগুলো কারও কানে গেল না। জামালও অভিনন্দন পুনরাবৃত্তি করতে না ঠিক করল। সে বেরিয়ে যাওয়ার সময় নিঃশব্দে দরজা ঠেলে দিল।

পরের দুটো কুপেতে হৈ হট্টগোল চলছিল, গোটা করিডর জুড়ে শোনা যাচ্ছিল পুরুষ আর মহিলাদের কণ্ঠস্বর, দমকা হাসি।

তার পরের কুপেটায় নিঃশব্দতা--জামাল আবার অবাক হয়ে গেল। সে ঠিক করল ওখানে উঁকি মেরে দেখবে। প্রথমেই তার চোখে পড়ল টেবিলের ওপর বিশৃঙ্খলা। সেখানে ছড়িয়ে ছিল টফির কাগজ, ডিমের খোসা, চকচক করছিল চকোলেটের দলা পাকানো মোড়ক, টলমল করছিল শেষ না করা কফির গেলাস। এ সব বিশৃঙ্খলার মাঝখানে দরজার দিকে মুখ করে বসানো ছিল খেলনা ভালুক। জামালের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল যাত্রীদের ওপর—নীচের বার্থে জগৎসংসারের সবকিছু বিস্মৃত হয়ে একমনে চুম্বনরত তরুণ-তরুণী। জামালের আবির্ভাবে তারা কোন মনোযোগ দিল না।

মুচকি হেসে জামাল চুপিসারে বেরিয়ে এলো, করিডর ধরে আরও এগিয়ে চলল।

একটা খোলা কুপের ভেতর থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসছিল তামাকের গাঢ় ধোঁয়া। জামাল উঁকি না মেরে থাকতে পারল না।

সেখানে বোর্ডের ওপর ঝুঁকে পড়ে দুজন পুরুষ দাবা খেলছিল।

"অন্তত এরা ত আমাকে আটই মার্চের অভিনন্দন জানাবে," জামাল মনে মনে ভাবল। সে চেঁচিয়ে বলল:

'ফুঃ, ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় কী অবস্থাটা করেছেন!'

দাবাড়েদের মধ্যে একজন মাথা তুলল।

'হ্যাঁ, মনে হচ্ছে আমরা বড় বেশি ধোঁয়া করে ফেলেছি,' ধীরে ধীরে কথাগুলো বলেই সে আবার বোর্ডের ওপর ঝুঁকে পড়ল, অনুরোধ করে বলল, 'যদি কিছু মনে না করেন, দরজাটা আরেকটু বেশি করে খুলে দিন।'

যাত্রীর অনুরোধ পালন করার পর জামাল এগিয়ে গেল। টয়লেটে উঁকি মেরে দেখল—পরিষ্কার।

এমন সময় কামরার মাঝখানের ভারী কাচের দরজার ওপর কে যেন দুমদাম ঘা মারল। অন্ধকারে কাচের ওপারে দেখা গেল একটা আবছা মূর্তি—যেন ফুটে উঠেছে ফিল্মের গায়ে।

জামাল বুঝতে পারল কামরার মাঝখানের দরজা আন্না পেত্রোভ্না চাবি দিয়ে বন্ধ করে রেখেছে—সম্ভবত যাত্রীদের সামনে-পেছনে যাতায়াতের ঠেলায় সে বিরক্ত হয়ে গেছে। জামাল পকেট থেকে নিজের চাবিটা বার করল।

যে যাত্রীটি নাছোড়বান্দা হয়ে দরজায় ঘা মারছিল দেখা গেল সে হল সেকেলে ফ্যাশনের পিঁশ্নে চশমাধারী ছোটখাটো রোগাটে লোক, তার মুখটা দারুণ ফেকাসে, রুগ্ণ। তার গায়ে ছিল সাদা সার্ট, কোট ছাড়া। কিন্তু বেশি বয়সের বলিরেখা আঁকা ঘাড়ের ওপর পাট করা কলার সেকেলে ফ্যাশনের চওড়া টাই দিয়ে নিখুঁতভাবে আটকানো।

যাত্রীটির মুখ থেকে ভুর ভুর করে মদের গন্ধ বেরোচ্ছিল।

'কোথায় চললেন আপনি?' জামাল একটু রুক্ষ স্বরে জিজ্ঞেস করল।

বুড়ো পিঁশ্‌নের কাচের ভেতর দিয়ে সস্নেহে জামালের দিকে তাকাল, উত্তরের বদলে চেঁচিয়ে বলে উঠল:

'সেলাম আলেকুম! উৎসবের শুভেচ্ছা জানাই,' সঙ্গে সঙ্গে সংযত অথচ অমায়িক হাসি হাসল।

জামাল প্রথমে আকস্মিকতায় হতচকিত হয়ে গেল, কিন্তু কোন কথা খুঁজে না পেয়ে কেবল চুপচাপ হাসল।

জামালের অপ্রতিভ অবস্থার সুযোগ নিয়ে বুড়ো চটপট তার হাতে একটা গোলাকার ছোট জিনিস গুঁজে দিল। জামাল হাতড়ে বুঝতে পারল আংটি।

'আপনাকে... আমি উপহার দিলাম।'

জামাল অবাক হয়ে কাঁধ ঝাঁকাল, হাতটাকে আলোর কাছে নিয়ে ধরল। তার হাতের তালুতে সামান্য ঝকমক করছিল একটা সস্তাদরের আংটি পেঁচার চোখের মতো তার ওপর ছোট লাল পাথর বসানো।

কী করা যায় বুঝে উঠতে না পেরে জামাল বিব্রত হয়ে বুড়োর দিকে তাকাল।

'গতকাল স্টেশনে কিনেছিলাম,' যাত্রীটি একটু বিভ্রান্ত হয়ে কৈফিয়তের সুরে বলল। 'কিনেছিলাম এগারোটা। দশটা আমাদের কামরার মেয়েদের উপহার দিয়েছি। থেকে গেল এই একটা। ঠিক করলাম আপনাদের কামরায় প্রথম যেই মহিলাকে দেখতে পাব তাকেই এটা দেব। আপনাকে আপনার সুখকামনায়।'

'ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ,' হতবুদ্ধি হয়ে বলল জামাল। সে তার অনামিকায় আংটিটা পরল।

'না, না, ধন্যবাদের কিছু নেই, আপনি খুশি হলেই হল,' বলে বুড়ো হাসল। 'চলি।'

'আচ্ছা,' জামাল বলল। 'ধন্যবাদ।'

যাত্রীটি তার নিজের কামরায় ফিরে গেল। জামাল মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার গতিপথের দিকে চেয়ে রইল--যেন লোকটি কোন যাদুকর।

ফ্রুঞ্জেতে জামাল এসে পেঁছিুল নয়টায়।

শহরে মুষলধারে বৃষ্টি ঝরছে—বসন্তকালের প্রবল বর্ষণ। সাক্ষাৎকারীদের মাথার ওপর ছাতা ধরা ছিল।

কামরা খালি হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর আন্না পেত্রোভ্না ও জামাল চটপট কামরা গোছাতে লেগে গেল। তারা বিছানা উঠাল, মেঝে ধুয়েমুছে পরিষ্কার করল, ধুলো ঝাড়ল, আবর্জনা সাফ করে ফেলে দিল।

আন্না পেত্রোভ্না প্রথম চলে গেল। পুরনো স্যুটকেসে জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখতে রাখতে জামালের খানিকটা দেরি হয়ে গেল।

জামাল জনশূন্য প্ল্যাটফর্মে নামল। এমন সময় স্টেশন থেকে শহরে যাওয়ার লোহার ফটকের সামনে দেখতে পেল তার দশ বছরের ছেলেকে।

"বৃষ্টিও ওকে আমার সঙ্গে দেখা করতে আটকাল না," স্নেহভরে সে মনে ভাবল: সঙ্গে সঙ্গে তার বুকটা ধক করে উঠল: ছেলের মাথায় টুপি নেই। কপালের ওপব এসে পড়েছে বাড়তি চুল, সেখান থেকে মুখ বয়ে গড়িয়ে পড়ছে বৃষ্টির ফোঁটা। সে কাঁপছিল, নাক টানছিল, দাঁতে দাঁত ঠকঠক করছিল।

মা তাড়াতাড়ি ছেলের দিকে এগিয়ে গেল। ছেলের মুখে হাসি নেই, সে চুপচাপ মা'র দিকে তাকাল। জামালও চুপ। স্যুটকেসটা মাটিতে রেখে বর্ষাতির পকেট থেকে সে রুমাল বার করল, ছেলের মুখ আর চুল মুছতে লাগল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর ছেলের পলকহীন মধুর চোখের দিকে তাকিয়ে সে জিজ্ঞেস করল:

'টুপি পরিস নি কেন?'

'বাড়ি থেকে যখন বেরোই তখন বৃষ্টি ছিল না,' সে উত্তর দিল।

'তা হলেও পরা উচিত ছিল। এখনও ত ঠাণ্ডা আছে।'

জামাল স্যুটকেস তুলে নিল, ছেলের হাত ধরল। ওরা দুজনে সিঁড়ি বয়ে নীচে নামল। মা ও ছেলে ধীরে ধীরে স্কোয়ার পার হল, ট্যাক্সি স্ট্যান্ড পেরিয়ে বুলভারে গিয়ে পড়ল, তারপর তাদের সরু নোংরা রাস্তাটায় মোড় নিল।

'স্কুলে পড়াশুনা কেমন চলছে রে?'

ছেলে উত্তর দিল না।

'এই সপ্তাহে ক'টা গোল্লা পেয়েছিস?'

'দুটো।'

'গত সপ্তাহে ছিল মাত্র একটা। খাওয়া দাওয়া কী করছিস বল। বাপের কাছে পয়সা আছে ত?'

'তা জানব কী করে?'

'সে কি বাড়িতে?'

'আমি যখন বেরোই তখন ছিল না।'

'কোথায় যেতে পারে? আজ ত ওর ছুটির দিন।'

'কোথায় তা আমি জানি না।'

আরও অনেকক্ষণ প্যাচপেচে কাদার ভেতর দিয়ে হাঁটার পর মা ও ছেলে শেষকালে তাদের দুকামরাওয়ালা একতলা বাড়িতে এসে পেঁছুল। সেখানে বিশৃঙ্খলার একশেষ— নোংরা বাসনপত্র, অবিন্যস্ত শয্যা, আবর্জনাময় মেঝে। দূর যাত্রা থেকে ফিরে আসার পর ক্লান্ত জামাল সচবাচর এই দৃশ্যই দেখতে পেত।

'ওঃ, পুরুষমানুষগুলোকে নিয়ে আর পারা গেল না!' দীর্ঘশ্বাস ফেলে জামাল বলল।

বিশ্রামের কথা স্বপ্নেও ভাবা যায় না। পর্যটনের খসখসে বর্ষাতিটা গা থেকে খুলে সে ঘরের কাজে লেগে গেল। বিছানা গোছাল, মেঝে ধুল, তারপর চুল্লি গরম করল... জল গরম্ করে বাসনপত্র ধুয়ে রান্না শুরু করে দিল।

বাড়ির কর্তা মুরাত বাড়ি ফিরল দেরিতে। মুরাত দীর্ঘদেহী, তার কাঁধ চওড়া, গড়নটা বেঢপ। সে সশব্দে দরজা খুলল, ভিজে বর্ষাতিটা

গা থেকে খুলে পেরেকে ঝুলিয়ে রাখল, রান্নাঘরে চলল—হাতমুখ ধুতে।

জামাল টেবিলের ওপর ঢাকনা বিছাল, বাসনপত্র সাজাল, সুপ নিয়ে এলো।

ছেলে মনোযোগ দিয়ে মা'র গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগল।

মুরাত তোয়ালেতে হাত মুছে ধীরেসুস্থে ঘরে প্রবেশ করল। সে ছেলে বা বৌ কারও দিকেই না তাকিয়ে টেবিলের পাশে নিজের আসন নিল।

জামাল লক্ষ্য করল যে স্বামী পান করে এসেছে।

'আচ্ছা, তুমি এসেছ?' অবশেষে মুরাত কথা বলল—ভাবটা এমন যেন এইমাত্র বৌকে দেখতে পেল। সে বড় বাটিটা নিজের কাছে টেনে নিয়ে সুপ খেতে শুরু করল।

'আমাকে ছাড়া তোমরা কেমন ছিলে?' স্বামীর উদ্ভট প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে জামাল পাল্‌টা প্রশ্ন করল। 'একা একা তোমাদের বড় একটা সহজে কেটেছে বলে ত মনে হয় না।'

'সহজে নয় কেন?' স্বামী খেতে খেতেই চ্যালেঞ্জের সুরে জিজ্ঞেস করল।

এমন সময় জামাল লক্ষ্য করল যে মুরাত একদৃষ্টিতে তার হাতের দিকে তাকিয়ে আছে।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল বুড়োর দেওয়া উপহারের কথা।

আংটিটা আঙ্গুল থেকে খুলে মুরাতের দিকে বাড়িয়ে ধরে সে বলল:

'এই যে, একজন যাত্রী উপহার দিল। আজ আটই মার্চ কিনা—মেয়েদের উৎসব।'

মুরাত কেন যেন অনেকক্ষণ ধরে আংটিটাকে এদিক ওদিক করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খুঁটিয়ে দেখল, তারপর ধীরে ধীরে মাথা তুলল, জামালের দিক ক্রুদ্ধ, মর্মভেদী দৃষ্টি নিক্ষেপ করল।

'তুমি নিলে কী বলে?' ক্ষিপ্তভাব গোপন না করে স্বামী জিজ্ঞেস করল।

'কী বলে মানে? হয়েছে কী?'

'ইতর!'

মুরাত ঝটকা মেরে হাত ওপরে তুলে আংটিটা জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

জামাল সবে চামচটা মুখের কাছে ধরেছিল, সেটা অতর্কিতে মাঝপথে থেমে গেল, বাটির পাশ দিয়ে সোজা টেবিল ক্লথের ওপর গিয়ে পড়ল।

জামালের হঠাৎ মনে হল যেন তার দম বন্ধ হয়ে আসছে, গলা খুসখুস করছে। তার ঠোঁট থরথর করে কাঁপতে লাগল।

স্বামীর সবে-পাক-ধরা চুলে ভর্তি মাথাটা টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়েছে, সে দিকে তাকিয়ে জামাল ভর্ৎসনার সুরে ফিসফিস করে বলল, 'মুরাত!'

জামাল আস্তে করে চেয়ার সরিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল, শোয়ার ঘরে চলে গেল। সেখানে পর্দা টেনে না সরিয়েই সে কয়েক মিনিট জানলার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বৃষ্টির শব্দ কান পেতে শুনল। হঠাৎ করতলে মুখ ঢেকে জামাল মৃদু ফুঁপিয়ে উঠল—একবার, দুবার, আরও।

আচমকা পেছনে শুনতে পেল স্বামীর সতর্ক পদধ্বনি।

মুরাত পেছন দিক থেকে স্ত্রীর কাছে এগিয়ে এসে জামালের রোগা কাঁধের ওপর নিজের ভারী হাত দুটো রাখল। জামালের কাঁধে কাঁপুনি ধরল।

'ক্ষমা কর,' সে মৃদু স্বরে অনুরাগভরে বলল। 'শান্ত হও। আমাকে ক্ষমা কর। ব্যাপারটা বিচ্ছিরি হয়ে গেল।'

জামাল কান্না থামাল।

দুজনেই চুপ।

'জামাল,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফের কথা শুরু করল মুরাত। 'মনে আছে, কোন এক সময় আমাদের বিয়ের বার্ষিকীতে আমি তোমাকে

একটা আংটি উপহার দিয়েছিলাম... দেখতে ছিল অনেকটা এটারই মতো। আজ তোমার মনে দুঃখ দিলাম। কিন্তু কথাটা আংটি নিয়ে নয়। আগে আমরা সব সময় মনে করে তোমার জন্মদিনে উৎসব করতাম... আমার জন্মদিনেও। আমরা একে অন্যের জন্যে উপহার তৈরি করে রাখতাম, চেষ্টা করতাম আগে থাকতে যেন রহস্য ফাঁস না হয়ে যায়। এ সবই কেন যেন আমরা ভুলে গেলাম। এমন কি তোমার, মহিলাদের উৎসবও আমি আগে সব সময় মনে রাখতাম। আর এখন... এই দিনটা আমাকে চঞ্চল করে না, কিছুই মনে করিয়ে দেয় না, কোন কথাই বলে না। আজ কত বছর হল আমি তোমাকে কোন উপহারই দিই না। আজও তোমাকে শুভেচ্ছা জানাল কিনা কোন এক অচেনা, হঠাৎ-দেখা লোক, আর আমি...'

জামাল ফিরে তাকাল। তার দৃষ্টিতে মেশানো ছিল ভালোবাসা ও অবিশ্বাস। সে স্বামীর দিকে তাকাল।

'আমি তোমাকে দুঃখ দিতে চাই নি,' মুরাত আবার বলল।

সে তাড়াতাড়ি করে সযত্নে তার রুক্ষ হাত দিয়ে জামালের মুখ থেকে চোখের জল মুছতে লাগল।

'আমার নিজেরই নিজের ওপর রাগ ধরে যায়,' সে দ্রুত বলে চলল। 'আমি কী করছি? ব্যবহার করছি টিকটিকির মতো—নিজেই নিজের লেজ কামড়াচ্ছি।'

'সব আগের মতো হবে মুরাত,' স্বামীর কাঁধে মাথা রেখে জামাল বলল। 'যা কিছু খারাপ সে সব চলে যাবে। এ ত তুচ্ছ ব্যাপার—তেমন একটা বড় কথা নয় মুরাত। তবে এই সার্টটা তোমার পালটানো দরকার। ময়লা হয়ে গেছে। কাল আমি কাচব। আর এখন—শুয়ে পড় গিয়ে। আমার এখন বাসন ধুতে হবে।'

জামাল আস্তে করে সরে গেল, স্বামীর আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হয়ে ফিরে এলো ঘরে, যেখানে টেবিলের ধারে তখনও ছেলে বসেছিল। তার সামনের খাবার যেমনকার তেমন পড়ে আছে। সে আঙুল দিয়ে টেবিলের কোনা খুঁটছিল।

জামাল চুপচাপ এসে ছেলের পাশে বসল। ছেলে সোজা হয়ে উঠল, ভালো করে মা'র চোখে চোখ রাখল। ছেলের দৃষ্টিতে মা প্রশ্ন আঁচ করল।

জামাল অনেকক্ষণ ধরে ছেলের টলটলে, দরদভরা চোখজোড়া মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগল, তারপর হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল যে স্টেশনে দেখা হওয়ার সময় তাকে চুমোও খায় নি।

সে ছেলের মাথাটা নিজের কাছে টেনে নিল, তার কপালে ঠোঁট ঠেকাল।

লেখকবৃন্দের পরিচয়

চিঙ্গিজ আইৎমাতভ: জন্ম—১৯২৮ সনে। গদ্যশিল্পী, নাট্যকার, চিত্র নাট্যকার, সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার ও লেনিন পুরস্কার বিজয়ী। পিতৃভূমির মহাযুদ্ধের সময় গ্রাম-সোভিয়েতের সম্পাদকের কাজ করেন, আয়কর-এজেন্ট এবং ট্র্যাক্টর কর্মিবাহিনীর হিসাব-রক্ষকের কাজ করেন...

কৃষিবিদ্যা ইনস্টিটিউটের পাঠ শেষ করার পর 'প্রাভ্দা' পত্রিকার বিশেষ সংবাদদাতা হিশেবে এবং নেহাৎই একজন লেখক ও সমাজ-কর্মীরূপে চিঙ্গিজ আইৎমাতভ বহুকাল তাঁর জন্ম-গাঁয়ে বাস করেন, কির্গিজিয়ার এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত ভ্রমণ করেন, বিভিন্ন ধরনের পেশার লোকজনের সঙ্গে এই সময় তাঁর দেখাসাক্ষাৎ হয়—আর এ সবই সাহিত্যে নিজের জাতির হৃদয় অভিব্যক্তির ব্যাপারে তাঁকে সহায়তা করে।

চিঙ্গিজ আইৎমাতভের বহু রচনা ভারতীয় ভাষাসমূহে অনূদিত হয়েছে। লেখক একাধিকবার ভারত ভ্রমণ করেছেন, ভারতের জনগণ, লেখক সম্প্রদায় এবং সমাজকর্মী ও রাষ্ট্রীয় কর্মীদের সংস্পর্শে এসেছেন।

শাব্‌দানবাই আবদিরামানভ : জন্ম—১৯৩০ সনে। এককালে শিক্ষকতা করতেন, স্কুলে ও শিক্ষক-শিক্ষণ ইনস্টিটিউটে মাতৃভাষা ও সাহিত্য পড়ান।

কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের পর গদ্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন। 'দিলখোলা লোকজন' নাম দিয়ে বেশ কিছু কাহিনীর সংগ্রহগ্রন্থ প্রকাশ করেন, আধুনিক যৌথখামারী গ্রাম সম্পর্কে উপন্যাস লেখেন। মানুষের বিভিন্ন রকমের ভাগ্য, বিভিন্ন চরিত্র, কর্তব্যের সমস্যা, উদারতা নিয়ত লেখকের মনোযোগ আকর্ষণ করে।

শাইমবেক আপিলভ : জন্ম—১৯৩৬ সনে। কির্গিজিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্ব বিভাগে পড়াশুনা করে, সারা ইউনিয়ন চলচ্চিত্রবিদ্যা ইনস্টিটিউটের নাট্যচিত্র বিভাগ শেষ করেন। 'কির্গিজফিল্ম' চলচ্চিত্র স্টুডিওর সংবাদচিত্র বিভাগে সম্পাদক ছিলেন, পরে হন দলিল ও সংবাদ চলচ্চিত্র বিভাগের পরিচালক। তিনি লোকশিল্পের ওপর কয়েকটি ফিল্ম তোলেন। তাঁর তোলা 'কিইয়াল' ছবিটি ফ্লোরেন্সে অনুষ্ঠিত নৃকুলবিজ্ঞান ও সমাজ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে সম্মানসূচক ডিপ্লোমা অর্জন করে।

এই সংগ্রহগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'প্রতীক্ষা' ছোটগল্পটি ছাড়া শাইমবেক আপিলভ বেশকিছু গল্প এবং 'বুড়ো বেইশেন' নামে চলচ্চিত্র কাহিনীও লেখেন।

কাসিম কাইমভ : জন্ম—১৯২৬ সনে। অনুবাদকরূপে সাহিত্যকর্ম শুরু করার পর বিদ্রূপাত্মক কাহিনীর লেখক হিশেবে খ্যাতি অর্জন করেন, কয়েকটি কাহিনীর রচয়িতা, যশস্বী গায়ক ও কোমুজবাদক

আতাই ওগোবায়েভ সম্পর্কে ঐতিহাসিক উপন্যাস 'আতাই' করেন। কাসিম কাইমভের শেষতম রচনাসংগ্রহ—'সর্পকুণ্ডলী' ও 'শীতের ছন্দ'।

এই সংগ্রহগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'বিশ বছর পরে' গল্পটিতে আছে প্রসন্ন হাস্যরস আর তীব্র শ্লেষের সংমিশ্রণ।

নোমান কারিমভ: জন্ম—১৯৪০ সনে। মস্কোয় গোর্কি সাহিত্য ইনস্টিটিউট শেষ করেন। নোমান কারিমভের প্রথম গল্পগুলি প্রকাশিত হয় 'কির্গিজস্তানের সাহিত্য' পত্রিকায়। সেগুলি নবীন লেখকের প্রতিভার নবত্বের এবং উদীয়মান লেখকের পক্ষে বেশ উঁচুদরের সংস্কৃতিবোধের পরিচয় বহন করে।

মানুষের অন্তর্জগতের প্রতি আগ্রহ কির্গিজ গদ্য শিল্পের মনস্তাত্ত্বিক ধারার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতাসাধন করে। নায়কের চরিত্র বিকাশের যুক্তি অনুসরণে যে দার্শনিক সাধারণীকরণ ঘটে, তারই অনুষঙ্গী হিশেবে নোমান কারিমভের রচনায় চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক উদ্ঘাটন লক্ষণীয়।

মুর্জা গাপারভ: জন্ম—১৯৩৬ সনে। গদ্য লেখক ও চলচ্চিত্র নাট্যকার। মুর্জা গাপারভকে চিত্রশিল্পী-মনোবিজ্ঞানী বলা চলে। খুঁটিনাটি বিষয়কে সূক্ষ্মভাবে, মণিকারের মতো মাজাঘষা করে তিনি মানুষের অনুভূতি, ঘটনা সম্পর্কে তার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে থাকেন। তাঁর রচনায় আনন্দ ও বেদনার, জীবন ও মৃত্যুর, প্রেম ও দুঃখভোগের রূপ সুসমঞ্জস ও ফরসা। মুর্জা গাপারভের বিষাদময় গল্পগুলির মধ্যে পর্যন্ত যে আশাবাদের জয় পরিলক্ষিত হয় তা অহেতুক নয়। লেখকের অন্যতম সাম্প্রতিক গল্পসংগ্রহ—'বুনো হাঁস' (১৯৪০)।

বেকসুলতান জাকিয়েভ: জন্ম—১৯৩৬ সনে। ১৯৫৯ সনে তাঁর লেখা প্রথম নাটক 'বাপের ভাগ্য' তাঁকে বিখ্যাত করে তোলে, তিনি

সাহিত্য প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হন। তাঁর অপর একটি নাটক—যার বিষয়বস্তু হল কির্গিজিয়ার মহান কবি তক্তগ্লল—সেটিও সাহিত্যপুরস্কার অর্জন করে। চারটি ছোটগল্প নিয়ে লেখা নাটক 'সোনার পেয়ালা' কির্গিজ নাট্যসাহিত্যে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। বেকসুলতান জাকিয়েভ--কয়েকটি চিত্রনাট্যের রচয়িতা। গদ্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি মোটে গোটা কয়েক ছোটগল্প লিখেছেন। কিন্তু লেখকের অন্যান্য রচনার সঙ্গে এই ছোটগল্পগুলিই তাঁকে এখনকার কির্গিজিয়ার শ্রেষ্ঠ গদ্যশিল্পীদের পর্যায়ে উন্নীত করেছে।

কেনেশ জুসুপভ: জন্ম—১৯৩৭ সনে। 'কাঠুরিয়া' গ্রন্থ এবং আরও কয়েকটি গল্প-সঙ্কলন ও কাহিনী-সঙ্কলনের রচয়িতা, প্রজাতন্ত্রের লেনিনীয় কমসমোল পুরস্কারবিজয়ী। কেনেশ জুসুপভ তাঁর জাতিকে ভালোমতো জানেন, তিনি সূক্ষ্ম বোধ ও কলানৈপুণ্যের সাহায্যে কির্গিজিয়ার জীবনযাত্রার বৈশিষ্ট্য, কির্গিজদের জাতীয় চরিত্র, দৈনন্দিন জীবন ও মনস্তত্ত্বের খুঁটিনাটি ফুটিয়ে তোলেন।

সংগ্রহগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত গল্পটিতে লেখকের মূল সৃজনী ধারণার কাব্যিক প্রকাশ ঘটেছে।

কুবাৎবেক জুসুবালিয়েভ: জন্ম—১৯৪০ সনে। কির্গিজিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্ব বিভাগ এবং মস্কোয় চিত্রনাট্যের উচ্চ পাঠক্রম শেষ করেন। কুবাৎবেক জুসুবালিয়েভের প্রথম গল্প প্রকাশিত হয় ১৯৪০ সনের গোড়ার দিকে। প্রথম গল্পেই দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে মানুষের জটিল মনোজগৎ হৃদয়ঙ্গমের প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। 'সূর্যের অসমাপ্ত আত্মপ্রতিকৃতি' কাহিনীতে লেখক মানুষের হৃদয়াবেগের ঐশ্বর্যমণ্ডিত জগৎ উন্মুক্ত করেন, কুশলী কথাশিল্পীরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। চলচ্চিত্রের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে লিপ্ত। কুবাৎবেক জুসুবালিয়েভের চিত্রনাট্য অবলম্বনে তোলা বহু মিটার দৈর্ঘ্যের দলিলচিত্র 'দিউইশেনের সেতু' চলচ্চিত্রটি ১৯৪০ সনে ক্রাকভে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র-উৎসবে 'স্বর্ণ ড্র্যাগন' পুরস্কার অর্জন করে।

মার বাইজিয়েভ: জন্ম—১৯৩৫ সনে, শিক্ষক-পরিবারে। কির্গিজিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্ব বিভাগ শেষ করেন। সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করেন সমালোচক ও অনুবাদক রূপে (১৯৫৬)। প্রথম সংকলনগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯৬১ সনে। এর পর থেকে তাঁর বহু ছোটগল্প সংকলন প্রকাশিত হয়। তাঁর ছোটগল্পগুলির বৈশিষ্ট্য হল আধুনিক নৈতিক সমস্যা প্রকাশের তীব্রতা, বিরোধ ও চরিত্রসমূহের জটিলতা। সময় সময় সোভিয়েত আমলের কির্গিজ নাট্যসাহিত্য সম্পর্কে প্রবন্ধ লেখেন। তাঁর রচিত 'দ্বন্দ্বযুদ্ধ' নামে জনপ্রিয় নাটকটি সোভিয়েত ইউনিয়ন, জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, পোল্যান্ড ও অস্ট্রিয়ায় পরিবেশিত হয়।

শুকুরবেক বেইশেনালিয়েভ: জন্ম—১৯২৮ সনে। গদ্যশিল্পী ও নাট্যকার। যুব সংবাদপত্র ও শিশুপত্রিকা সম্পাদনা করতেন, কির্গিজিয়ার লেনিনীয় কমসমোলের কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক ছিলেন। কির্গিজিয়ার বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের আবির্ভাব সম্পর্কে লিখিত তিন খণ্ডের উপন্যাস 'সুখের পথ' এবং 'উত্তরাধিকারীদের কণ্ঠস্বর' উপন্যাস ছাড়াও তিনি বহু উপাখ্যান ও ছোটগল্পের লেখক। শুকুরবেক বেইশেনালিয়েভের বহু রচনা শিশুদের সম্পর্কে লেখা। তাঁর একটি উপাখ্যানের নাম—'প্রতিভার ওজন'। রচনাটিতে লেখক আধুনিক ভারতের জীবনযাত্রার বিবরণ দিয়েছেন। লেখকের সাম্প্রতিক গ্রন্থসমূহের মধ্যে আছে 'যশের বোঝা' ও 'সারবাইয়ের ছেলে' উপন্যাস।

জুনাই মাভলিয়ানভ: জন্ম—১৯২৩ সনে। কবি ও গদ্যশিল্পী। বহু বছর বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, প্রধান শিক্ষক ছিলেন। পিতৃভূমির মহাযুদ্ধে যোগ দেন। লেখকের মূল জীবিকা ও সামরিক জীবনের অভিজ্ঞতা নির্ধারণ করে তাঁর রচনার প্রধান বিষয়বস্তু: যুদ্ধে মানুষের জীবন এবং বিদ্যালয়ের জীবনযাত্রা। জুনাই মাভলিয়ানভ তাঁর বহু গল্পে ও উপাখ্যানে প্রকাশ করেছেন মানুষের জীবনে যুদ্ধের শোকাবহ

পরিণাম, তিনি জাতিসমূহের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার দৃঢ় সমর্থক। লেখকের 'নির্মল আকাশ' উপন্যাসের বিষয় হল তাঁর নিজের শান্তিময় জীবিকা, নবীন প্রজন্মের শিক্ষাদীক্ষার সমস্যা। লেখকের সাম্প্রতিক রচনা— 'উচ্চতা' ও 'নতুন প্রভাত' (১৯৬১) নামে দুটি উপন্যাস।

মুসা মুরাতালিয়েভ: জন্ম—১৯৪২ সনে। মস্কোয় গোর্কি সাহিত্য ইনস্টিটিউট শেষ করেন। ১৯৬১ সনে সাহিত্য ও শিল্প বিষয়ক পত্রিকা 'আলা-তোও'-য় প্রকাশিত হয় তাঁর ছোটগল্প 'পাপান'। রচনাটিতে তিনি প্রেমের উজ্জ্বল ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রূপ প্রকাশ করেছেন। ১৯৬১ সনে প্রকাশিত হয় তাঁর গল্প ও উপাখ্যানের প্রথম সংকলন। তারপর থেকে লেখকের স্বল্পায়তন গদ্য রচনার মোট চারটি সংকলন প্রকাশিত হয়। মুসা মুরাতালিয়েভ তাঁর রচনায় কির্গিজ মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতার ঐতিহ্য অনুসরণ করে থাকেন। তাঁর গদ্য রচনার বিশেষত্ব- আবেগপ্রবণতা ও লিরিকধর্ম।

আমান সাসপায়েভ: জন্ম—১৯২৯ সনে। গদ্যশিল্পী। উপাখ্যান ও গল্পের লেখক। আমান সাসপায়েভের গদ্যরচনার বৈশিষ্ট্য হল জীবনের সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা, জনগণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ও ভাবনাচিন্তার ঘনিষ্ঠ পরিচয়। তাঁর রচনার চরিত্রসমূহ—সাধারণ গ্রাম্য মানুষ, তারা পরিশ্রমী, সরল ও অকপট, তাদের ভাবনাচিন্তা প্রায়শই যুগযুগান্তরের রীতিনীতি ও লৌকিক নীতিধর্মের পরিসরে আলোকিত। আমান সাসপায়েভের গদ্যরচনার বাস্তবধর্মিতা লৌকিক শিল্প-ভাবনার সঙ্গে জড়িত। চরিত্রের একমুখীনতা শুভ ও অশুভের মধ্যে সুস্পষ্ট বিভাগ, লৌকিক প্রাজ্ঞতাধর্মী দার্শনিকতা এবং উল্লেখযোগ্য পরিমাণে নীতিশিক্ষা-- তাঁর স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। আমান সাসপায়েভের শেষতম ছোটগল্প সংকলন— 'নতুন বাড়িতে সকাল' (১৯৬১)।

রোজা রিস্কেল্‌দিনোভা: টেলিভিশন-কর্মী। নারী জীবন সংক্রান্ত বহু কাহিনীর লেখিকা। রোজা রিস্কেল্‌দিনোভার চরিত্রগুলি বুদ্ধিমতী, বিনয়ী মেহনতী নারীরা, স্নেহপ্রবণ, ভালোবাসার পাত্রী ও জননী, তারা তাদের মোহিনী শক্তি দিয়ে দৈনন্দিন জীবনে স্নিগ্ধতা ও সৌন্দর্য সঞ্চার করে।